সাংবাদিকতা
সাংবাদিক
ও
সংবাদপত্র

সুধাংশু শেখর রায়

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার

সাংবাদিকতা
সাংবাদিক
ও
সংবাদপত্র

সুধাংশু শেখর রায়

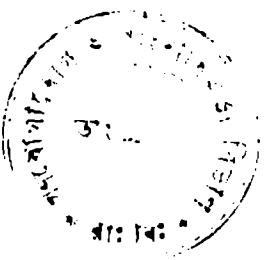

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার

B84443

সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুন ২০০৩

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

সুধাংশু শেখর রায়

গ্রন্থস্বত্ব
ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
এ এইচ এম মিজানুর রহমান

গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ জাকির হোসেন

মুদ্রণ
ম্যাস্-লাইন প্রিন্টার্স
১/১৫ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা ১২০৭

মূল্য : ৳ ১৭৫ টাকা

ISBN: 984-882-030-7

The second edition of **Sangbadikata Sangbadik O Sangbadpatra** (Journalism, Journalist and the Press) by **Sudhangshu Sekhar Roy**: Published by **Mass-line Media Centre (MMC).** The first edition of this book was published by Dhaleswary Prakashani on 21 February 1994 and second edition on June 2003, Price: Tk. 175.

ডানিডার আর্থিক সহায়তায় ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত
Published by Mass-line Media Centre MMC with the financial assistance of DANIDA

উৎসর্গ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

আত্মজা

রাইন

ও

আমার বিদ্যোৎসাহী পিতা

শ্রী হীরালাল রায়

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় সেই শিক্ষকত্রয়ী

প্রয়াত অধ্যাপক ক আ ই ম নুরউদ্দিন
যিনি আমায় সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের ওপর
হাতেখড়ি দিয়েছিলেন —

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
যিনি আমার দুঃসময়ে নিরন্তর
সাহস জুগিয়েছেন —

ও

ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী
যিনি যোগাযোগকে ভেঙেচুরে
হাতেকলমে বুঝতে শিখিয়েছিলেন —

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	: সাংবাদিকতা	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব	২৭
তৃতীয় অধ্যায়	: সংবাদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বিভাগ	৩৫
চতুর্থ অধ্যায়	: সংবাদের উপাদান ও সংবাদমূল্য	৪৫
পঞ্চম অধ্যায়	: সংবাদশীর্ষ	৫৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	: সংবাদের শিরোনাম	৭৯
সপ্তম অধ্যায়	: সংবাদ রসায়ন ও সংবাদ গণিত	৯৩
অষ্টম অধ্যায়	: সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদক	৯৮
নবম অধ্যায়	: সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা	১১২
দশম অধ্যায়	: সংবাদপত্রের ছবি	১২৯
একাদশ অধ্যায়	: সংবাদপত্রের স্বাধীনতা	১৪১
দ্বাদশ অধ্যায়	: সংবাদপত্রের ওপর চাপ	১৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	: সাংবাদিকতার ধরন	১৭৭
চতুর্দশ অধ্যায়	: সাংবাদিকতার পরিভাষা	১৯০

ভূমিকা

সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সুধাংশু শেখর রায়ের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রায় একই বিষয়ের ওপর লেখা তাঁর 'শিল্প ও যোগাযোগ' শিরোনামের প্রথম গ্রন্থটি বের হয় তেরানব্বইয়ের একুশ উপলক্ষে। লেখক সাংবাদিকতার একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। জীবনের মহৎ এক ব্রত হিসাবে এই পেশাটিকে বেছে নিয়েছেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম বিভাগের আশির দশকের এই কৃতবিদ্য উজ্জ্বল তরুণ শুধু তাত্ত্বিকতার বলয়েই প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, দৈনিক সংবাদপত্রে কর্মরত থেকে সঞ্চয় করেছেন সরেজমিন সাংবাদিকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা। এর ফলে একজন তাত্ত্বিক গবেষকের অন্বেষার সাথে তার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে — যাকে রক্তে মাংসে আমরা সাংবাদিক বলি সেরকম একজন সৎ ও ব্যতিক্রমী সামাজিক-ব্যক্তিত্বের বিবেকী চৈতন্যবোধ।

বর্ণিত গ্রন্থটিতে আমরা সাংবাদিকতা, তার লক্ষ্য এবং ব্রতচারণা সম্পর্কে সুধাংশু শেখর রায়ের এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিটির পরিচয় পাই। সাংবাদিক বলতে তিনি সমাজ ও জনগণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ একজন সচেতন ব্যক্তি মানুষকে বুঝিয়েছেন। যিনি রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝখানে এক শক্তিশালী যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন। যিনি একনিষ্ঠভাবে পালন করেন সমাজের বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা।

চৌদ্দটি অধ্যায়ে সমন্বিত এই গ্রন্থের শুরুতে লেখক সাংবাদিকতার ইতিহাস এবং তার এ-মবিকাশের ধারার ওপর একটি বিশদ বিবরণ সংযোজন করেছেন। সাধারণ পাঠকদের পাশাপাশি সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর এ অধ্যায়টিতে পাওয়া যাবে। পরেকার অধ্যায়গুলোতে অধ্যয়নের একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হিসাবে লেখক সাংবাদিকতার তত্ত্ব, বিষয়বস্তু ও শিল্পগত দিকগুলো অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন।

বইটির ভাষা সাবলীল এবং সুখপাঠ্য। বাংলায় লেখা সাংবাদিকতা বিষয়ক এই মূল্যবান গ্রন্থটি জার্নালিজম বিভাগের ছাত্রদের অধ্যয়নগত চাহিদা বিরাটভাবে পূরণ করবে বলে আমি মনে করি। এবারকার একুশের গ্রন্থ মেলায় বইটি উপহার দিয়ে সাংবাদিক সুধাংশু শেখর বাংলা ভাষার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সোপানে বাংলায় লেখা পাঠ্য ও রেফারেন্স বইয়ের অভাব মোচনে নিঃসন্দেহে একটি বড় রকমের অবদান রাখলেন। লেখককে জানাই অভিনন্দন।

ঢাকা
এগারো ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪

সানাউল্লাহ্ নূরী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বঞ্চিত মানুষের অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা সমাজ উন্নয়নে সাংবাদিকদের ভূমিকা যে কতোটা শক্তিশালী, সামাজিক পালাবদলের ইতিহাস তার সাক্ষী। সাংবাদিকদের এই ভূমিকাকে আরো জোরালো, গতিশীল ও সময়োপযোগী করার জন্যে মাঠ পর্যায়ে সহায়ক সংগঠন হিসেবে কাজ করছে ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার। কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সামাজিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যেই সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নের বিষয়টি জরুরি।

এ কারণেই সংস্থা পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহে সামাজিক দায়িত্বপালনে সাংবাদিকদের উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়া হয় সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের প্রতি। সাংবাদিকতার নীতিমালা থেকে শুরু করে রিপোর্টিং, সম্পাদনা, সম্পাদকীয় ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রশিক্ষণসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং এসবের প্রকৃত সুফল নিশ্চিত করার জন্যে সাংবাদিকতার পেশাগত বিষয়ভিত্তিক পাঠ্য উপকরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে বারবার। প্রশিক্ষণসহ সংস্থার সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীগণও এমন চাহিদা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন পর্যায়ে।

এই চাহিদার কথা বিবেচনা করেই সংস্থা সাংবাদিকতা, অধিকার এবং সামাজিক ইস্যুভিত্তিক পাঠ্য উপকরণ প্রস্তুত, প্রকাশ এবং ব্যবহার করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সুধাংশু শেখর রায় প্রণীত সাংবাদিকতা সংবাদ ও সংবাদপত্র বইটি দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে প্রকাশ করা হচ্ছে। সাংবাদিকতার নীতিমালা, এ সংক্রান্ত আইন, রিপোর্টিং, সম্পাদনা, সম্পাদকীয়, পৃষ্ঠাসজ্জা, প্রকাশনা, ভাষারীতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নানা বিষয়ের ধারণা ও কৌশল এখানে অত্যন্ত সহজ, সাবলীলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এটি সাংবাদিকতা বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা অন্যতম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

আশাকরি, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীসহ সকল পর্যায়ের সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীর জন্যেই বইটি সত্যিকার অর্থে সহায়ক হবে।

বইটি প্রকাশ করতে দিয়ে সংস্থার কর্মকাণ্ডকে ঋদ্ধ করার জন্যে সুধাংশু শেখর রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এর প্রকাশনা ও মুদ্রণের সাথে জড়িত সংস্থার কর্মীদের প্রতিও অভিনন্দন।

কামরুল হাসান মঞ্জু
নির্বাহী পরিচালক
ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের কথা

মূলত ছাত্র এবং সাংবাদিকতার নবীন শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেই সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র বইখানি লিখেছিলাম। ধারণা ছিল, বইটি থেকে তাঁরা একাডেমিকভাবে এবং পেশাগত জীবনে উপকৃত হবেন। অনুমান করি বইটি থেকে তাঁরা উপকৃতই হয়েছেন— অন্তত বইটির চাহিদা থেকে আমার তাই মনে হয়েছে। বিশেষত আমার ছাত্ররা বইটি যেভাবে নিয়েছে তাতে আমি রীতিমতো অনুপ্রাণিত হয়েছি।

সাধারণত একাডেমিক বই খুব দ্রুত একটা বিকোয় না। তারপরে আবার বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ও পিআইবি ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার সরাসরি সুযোগ নেই। যদিও দুয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত পরিসরে সাংবাদিকতা শিক্ষা চালু হয়েছে। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় বইটির চাহিদা যে খুবই ভালো তা বুঝতে পেরেছি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছুটা দেরি হলেও বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। পাঠকের বিশেষত আমার ছাত্রদের ও সাংবাদিকদের বইটি পাবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে দ্বিতীয় সংস্করণে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের বেশ কিছু অধ্যায় বিশেষত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা ও সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদক অধ্যায়ে কিছু বাড়তি তথ্য সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যেসব ভুলভ্রান্তি ছিল তা যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করেছি। তার পরেও যদি দুয়েকটি ত্রুটি থাকে তবে সমস্ত দায় আমার। তবে গত নয় বছর ধরে শিক্ষকতার সুবাদে বইটির অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ধরতে পেরেছি এবং তা শোধরাবার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খানের কাছে ঋণী।

বইটির দ্বিতীয় দফা আলোর মুখ দর্শনের জন্য আমি ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)-এর প্রধান নির্বাহী জনাব কামরুল হাসান মঞ্জুর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমি এমএমসি'র সহযোগী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মীর মাসরুর জামান, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনাব রিয়াজ উদ্দিন খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা শরীফুল আলম, প্রকাশনা বিভাগের কার্যক্রম সহযোগী ম. আনিক, ব্যবস্থাপক (প্রেস) মিজানুর রহমানের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। দ্বিতীয় সংস্করণের অক্ষর যোজনার বিরক্তিকর কাজ করেছেন যিনি সেই মোহাম্মদ জাকির হোসেনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া এমএমসি'র সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা

৫ মে, ২০০৩

সুধাংশু শেখর রায়
সিনিয়র লেকচারার
কমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগ
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম সংস্করণে লেখকের কথা

যোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ওপর বাংলা ভাষায় বই লেখা এখন আমার কাছে 'মিশন'। সেই মিশনের দ্বিতীয় প্রয়াস সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র বইখানি। এর আগে তিরানব্বই'র ফেব্রুয়ারিতে নন্দনতাত্ত্বিক যোগাযোগের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়েছিল আমার লেখা 'শিল্প ও যোগাযোগ' বইখানি। বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার ওপর একাডেমিক বই খুব একটা নেই। দুয়েকটা যা বের হয়েছে তা সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রী বা এ পেশার নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত নয়। অবশ্য এ বিষয়ে ইংরেজিতে প্রচুর বই আছে। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে— তাহলে আবার বাংলা বই কেন? বাংলা ভাষায় বই রচিত হলে বাংলা ভাষারই চর্চা হলো, বাংলা ভাষারই উন্নতি হলো। তারপরও বলি বাংলায় লেখা হলে সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বই পড়া ছেড়ে দেবেন এমন নয়। বরং বাংলা ভাষায় রচিত বইগুলো শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বইগুলোর পাঠোদ্ধারে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে বলি, আমার এ বইখানি যদি সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রী, নবীন শিক্ষার্থী এমনকি যেকোন সংবাদসেবী বা সংবাদপ্রেমীর এতটুকু কাজে লাগে তাহলে মনে করবো আমার মিশন সার্থক।

বইটি রচনায় আমার কয়েকজন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রচ্ছন্ন ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৮৩-৮৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যয়নকালে অধ্যাপক ক আ ই মা নুরউদ্দিন, ড. সাখাওয়াত আলী খান, খোন্দকার আলী আশরাফ, জনাব শাহেদ কামাল, ড. সিতারা পারভীন, মিসেস আখতার সুলতানা ও ড. সুব্রত শংকর ধরের কাছ থেকে শোনা মূল্যবান বক্তব্য মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছিল। এই রচনায় তাঁদের সে বক্তব্য দারুণভাবে কাজে লেগেছে।

বইটিতে দু'চারটি উদাহরণ আমার পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে তুলে আনা। তারপরও তা নিয়ে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। যদি তা হয়, তবে তার জন্য আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সবার শুভেচ্ছা কামনা করি।

সুধাংশু শেখর রায়

সাংবাদিকতার সূচনা ও বিকাশ

প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের মতে, মানুষ নামের প্রাণীটির বয়স প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর। কিন্তু তার ইতিহাস লেখা হয়েছে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর আগে থেকে। অর্থাৎ লিপির উদ্ভব হয়েছে যখন, তখন থেকেই ইতিহাসের যুগ। তার মানে, তার আগের যুগটা হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগ। যখন লিপিও ছিল না, তাই লেখাও হয়নি কিছু। মানুষকে নিয়ে এই কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের প্রথম দু'হাজার বছর ব্রোঞ্জ যুগ। অর্থাৎ সে যুগের মানুষ ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ব্যবহার করতো। পরের তিন হাজার বছর মানুষ ব্যবহার করেছে লৌহনির্মিত হাতিয়ার। তার মানে সেটা হলো লৌহ যুগ। আর এই পাঁচ হাজার বছর আগের বাকিটা অংশ মানুষ ব্যবহার করেছে প্রস্তরের হাতিয়ার। সে জন্য তাকে বলা হয়েছে প্রস্তর যুগ।

লিপির উদ্ভব না হলেও ইতিহাসের যুগের আগেও মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে যোগাযোগের প্রকৃতি অনুযায়ী সে যুগে সত্যিকারের সাংবাদিকতা বলে কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষের জন্মের শুরু থেকেই সে যোগাযোগ কর্মটি চালিয়ে আসছে কিন্তু সাংবাদিকতার জন্য যে ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া বা ধরন প্রয়োজন তার আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে। অনেকের মতে, সাংবাদিকতার একেবারে আদিরূপটি প্রবর্তিত হয়েছিল জুলিয়াস সিজারের আমলে, অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ সালে। সে সময় রোমে এক ধরনের লোক কাজ করতো সংবাদ লেখক বা News-writer হিসাবে। তাঁরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রাত্যহিক দিনলিপি সংগ্রহ করতো। সে সময়ের মেয়াদান্তিক ও সময়োপযোগী ঘটনাবলীর ওপর ধারাবাহিক লেখার আদিম নাম হচ্ছে Acta-diurna। সংবাদ লেখকদের প্রাত্যহিক কার্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে লেখা Acta-diurna-কে রোমের প্রকাশ্য স্থানে সেঁটে রাখার জন্য জুলিয়াস সিজার নির্দেশ দিতেন। এটা আজকের যুগের প্রাচীরপত্রের মতো। এটাকে প্রথম খবরের কাগজ ধরা হলে তাকে আজকের আধুনিক যুগের খবরের কাগজের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যায়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টজনেরা সকল যুগেই তাদের স্বার্থ হাসিল বা মতাদর্শের প্রচার প্রচারণা চালাতে চেয়েছে। খবরের কাগজ হিসাবে জুলিয়াস সিজারের Acta-diurna ব্যবহার সে কথারই সার্থকতা প্রমাণ করে। Acta-diurna-কে সাংবাদিকতার আদিরূপ বলা হলেও সেই প্রাচীরপত্রের লেখাগুলো মুদ্রিত ছিল না, ছিল হাতে-লেখা। অন্য অর্থে হাতে-লেখা দেয়াল পত্রিকা।

এ তো ছিল সাংবাদিকতার লেখ্যরূপ। প্রায় সমসাময়িককালে মৌখিক রূপে সাংবাদিকতার ছিটোফোঁটা যে হয়নি তা নয়। তবে সেটা আজকের ইলেকট্রনিক অর্থাৎ রেডিও-টিভি সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য এক বিন্দুও বহন করেনি। এগারো থেকে শুরু করে চৌদ্দ শতাব্দীতে মধ্য পূর্ব এশিয়ায় এক ধরনের পেশাজীবী লোকের উদ্ভব হয়েছিল, যাঁদের বলা হতো Town criers। যেসব জাহাজ সমুদ্র বা নদী বন্দরে ভিড়তো সেইসব জাহাজ থেকে প্রাপ্ত খবরাখবর ওই সকল নগর ঘোষক চিৎকার করে লোকজনদের জানাতো বলে তাঁদের নাম হয়েছিল Town criers। তবে এই প্রক্রিয়ায় বাড়িঘরের ভেতরের লোকেরা শুনতে পেতো না বলে তাঁরা মাঝে মাঝে ঘণ্টিও বাজাতো। রোমের ইতিহাসে অবশ্য আরো জানা জায় যে তিন রাস্তার মোড়ে বিভিন্ন দালানকোঠা থেকে দেশের পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হতো। তিন রাস্তার ওই মোড়কে বলা হতো Trivia। এই জানান-প্রক্রিয়ায় জনগণের কথা বিশেষ একটা থাকতো না, থাকতো সম্রাটের কথা। আজকের প্রেক্ষাপটে সংবাদ মাধ্যমগুলো যদি হয় গণমাধ্যম তাহলে তিন রাস্তার মোড়ের ওই জ্ঞাপন-প্রক্রিয়া কোনমতেই সাংবাদিকতা নয়। যেমন করে নয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪ থেকে ১৮৫ সাল পর্যন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশে মৌর্য বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ওভারসিয়ার'বা 'প্রতিবেদক' (Prativedaka)-দের কাজ। মৌর্যদের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের আমলে এক ধরনের লোক কাজ করতো। তাদেরই নাম ছিল 'ওভারসিয়ার'। তাদের কাজ ছিল গুপ্তচরবৃত্তি করা। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এরা গোপন তথ্য সংগ্রহ করতো। রাজার বিরুদ্ধাচারণ করা হচ্ছে কিনা তা জানাই ছিল এদের কাজ।

মৌর্যদের শেষ রাজা অশোকের সময়েও এই ওভারসিয়াররা ছিল। তখন তাদের একটি পরিমার্জিত নাম দেয়া হলো। তারা হলেন প্রতিবেদক। প্রতিবেদকরা খবর সংগ্রহ ও প্রচার করা ছাড়াও অশোকের 'ধর্ম' (ভালো গুণাবলীর খবর) প্রচার করতেন। আজকে সংবাদপত্র শিল্পে যারা প্রতিবেদক বা রিপোর্টার হিসাবে সংবাদ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করছেন তাদের ওই নামটি সম্ভবত অশোকের আমলের প্রতিবেদকের থেকেই এসেছে। তো যাই হোক, ওভারসিয়ারদের তুলনায় প্রতিবেদকদের কাজের ধরন যথেষ্ট ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ায় একে সাংবাদিকতার মানদণ্ডে কিছুটা পরিমাপ করা যায়। কিন্তু গণমাধ্যমের কথা উঠলে তাও প্রকৃত সাংবাদিকতায় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

ব্রোঞ্জ যুগের নগর সভ্যতায় ক্রমপ্রসারমান ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থেই মেসোপটেমিয়া ও মিসরে লিখন পদ্ধতি ও বর্ণমালার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সেই লিখন পদ্ধতির চরম বিকাশটা ঘটে ১৪৫০ সালে এবং তার আগে পর্যন্ত মুদ্রণ সাংবাদিকতারও সত্যিকারের সূচনা হয়নি। সে সময় জার্মানির জোহান্নেস জেনসফিচ গুটেনবার্গ টাইপ আবিষ্কার

করেন। তাঁর আবিষ্কৃত টাইপের সাহায্যেই তিনি ১৪৫৬ সালে একটি বই মুদ্রণ করেন। যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'গুটেনবার্গ বাইবেল'। আর তখন থেকেই ইউরোপে মুদ্রণ ইতিহাসের শুরু। এদিকে এ উপমহাদেশে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্রটি ইউরোপ থেকে আসে ১৫২৬-২৭ সালের দিকে। পর্তুগিজ পাদ্রীরা আবিসিনিয়া যাবার পথে ঘটনাক্রমে তাদের মুদ্রণ যন্ত্রটি গোয়ায় ফেলে যেতে বাধ্য হন। গুটেনবার্গ বাইবেল বের করলেও মুদ্রণ সাংবাদিকতার সূচনা তারও অনেক পরে শুরু হয়। পনেরো শতকে লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়ে গেলেও ষোড়শ শতকেও ভেনিস শহর থেকে Acta-diurna-এর মতো একই ধরনের হাতে-লেখা প্রাচীরপত্র প্রকাশিত হতো। তার নাম ছিল Notiziescritte or written notices বা লিখিত নোটিশ। তবে এই প্রাচীরপত্র পড়তে গেলেও ইতালির মুদ্রার এক 'গেজেটা' করে দিতে হতো। সেই থেকে খবরের কাগজের নামের সঙ্গে 'গেজেট' কথাটা যুক্ত হয়ে গেছে। বিষয়টার একটা ইতিবাচক দিক কিন্তু ছিল। কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সংবাদপত্র সত্য কথা বলে। মানুষকে জানানোর ক্ষেত্রে এটি দ্বিমুখী যোগাযোগ সাধন করে থাকে। আর এই বিশ্বাস থেকেই মানুষ পয়সা দিয়ে সংবাদপত্র কেনে। পয়সার বিনিময়ে মানুষ কখনোই মিথ্যা কামনা করে না।

যাই হোক, মধ্যযুগে ভারতবর্ষেও হাতে-লেখা সংবাদপত্রের কথা আমরা জানতে পেরেছি। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে কাফী খান নামে একজন পণ্ডিত তার 'মুন্তা-খাবুল-লুবাব' (Munta-Khabul-Lubab) গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছিলেন ... 'The death news of Rajaram, of the house of Shivaji, was brought to the imperial camp by the newspaper' অর্থাৎ 'শিবাজীর বাড়ির জনৈক রাজারামের মৃত্যুর খবর সম্রাটের শিবিরে পৌঁছেছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমেই।' একটি হাতে-লেখা সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই খরবটি পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে এই পত্রিকাটি (অন্তত এ অঞ্চলের) সবচেয়ে প্রাচীন হাতে-লেখা সংবাদপত্র।

মার্গারিটা বার্নসের 'দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস' গ্রন্থ সূত্রেই জানা যায়, আওরঙ্গজেবের সময়ে সাধারণ সৈন্যদের মাঝে সংবাদপত্র বিলি করা হতো (The common soldiers in Aurangzeb times were supplied with newspapers)। এই প্রক্রিয়াটি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল, তার প্রমাণ হলো ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম স্লিমান (Sir William Sleeman) তার 'Journey through the Kingdom of Oude' গ্রন্থে বলেছেন, The king of Oude employed Six hundred and sixty newswriters or Waqiah Nawis and that they were paid, on an average, between four and five rupees each per month. সম্রাট শাহজাহানের শেষ সময়ে এবং আওরঙ্গজেবের শাসনামলের প্রথমদিকে কাজ করেছেন এমন একজন ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া

বার্নিয়ার (Francois Bernier) ১৬৭১ সালে লেখা তাঁর Travels in the Mogul Empire-গ্রন্থে বলেছেন, ... It is true that the Great Mogul sends a Waqiah Nawis to the various provincess, that is, person whose business is to communicate every event that takes place.

এখানে উল্লেখ্য, সম্রাট আকবরের সময়কার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন আল্লামা আবুল ফজল। তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম ছিল আইন-ই-আকবরী (Ain-i-Akbari)। আকবরের আইনকানুন সংক্রান্ত এই প্রামাণ্য দলিলের ১৬৯ নম্বর ধারায় সে সময়কার তিন ধরনের বা শ্রেণীর লেখকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ওয়াকিয়া নবিশরাও রয়েছে। তাঁরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত থেকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করতেন। তবে উল্লিখিত এই তিন শ্রেণীর লেখকদের সম্পর্কে আবুল ফজল বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে ভেনিসীয় (Venetian) পরিব্রাজক নিকোলা ম্যানুচি (Niccola Mannucei) তাঁর Storia do Mogor (Story of Mughal) গ্রন্থে ওই তিন শ্রেণীর লেখকদের একটা পরিচিতি দিয়েছিলেন। ম্যানুচি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন এবং ভারত পরিভ্রমণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ওই তিন শ্রেণীর লেখকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ...It is a fixed rule of the Mughals that the Waqiah nawis and the Khufia Nawis or the public or secret news writers of the empire, must once a week enter what is passing in a waqiah that is to say, a sort of gazzette, containing the events of most importance. These newsletters are commonly read in the kings presence by women of the mahal at about 9 o'clock in evening, so that by this means the Emperor knows what is going on in his kingdom ....

ওপরের এই বিবৃতি থেকে আমরা দু'ধরনের লেখকের কথা জানতে পরি। এদের এক দলের নাম ওয়াকিয়া নবিশ এবং অপর গ্রুপটির নাম খুফিয়া নবিশ। Waqiah মানে হচ্ছে News আর Nawis হচ্ছে Writer। পুরো অর্থে সংবাদ লেখক। অপরদিকে Khufia হচ্ছে secret বা confidential। তার মানে খুফিয়া নবিশ হচ্ছে গোপন লিপিলেখক। এঁরা আসলে ছিল সম্রাটের গুপ্তচর বা ভালো অর্থে গোয়েন্দা। এই গোপন লিপিলেখকেরা গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে তা সম্রাটকে অবহিত করতেন। আর ম্যানুচির ভাষ্যানুযায়ী ওয়াকিয়া নবিশরা সম্রাটকে অবহিত করতেন তখন, যখন সম্রাট রাত নয়টা নাগাদ নারীমহলে অবস্থান করতেন।

এই দুই শ্রেণীর লেখক ছাড়াও মুঘল আমলে আরেক শ্রেণীর লেখক ছিলেন যাঁদের নাম ছিল সাভানি নিগার (Sawanih Niger)। এখানে সাভানি মানে হচ্ছে চিঠি (Anecdote,

epistle), আর নিগার মানে হচ্ছে Writer বা লেখক। পুরো অর্থে জীবনী লেখক। প্রকৃত অর্থে সাভানি নিগাররা ছিল জীবনীকার। তাঁরা ছিল ফরমায়েশী লেখক। সম্রাট, যুবরাজ এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য যশস্বী ও নামি ব্যক্তিত্বের জীবনী লেখার জন্য তাঁদের অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ করা হতো।

সুলতান আমলে গোপন সংবাদ সংগ্রাহকদের ডাকা হতো 'বারিদ' বলে। অপরদিকে সরকারি প্রতিবেদকদের বলা হতো আখবর-নবিশ। মুঘল আমলেও এই আখবর-নবিশরা ছিলেন। আরও এক শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল হরকরা। এই হরকরারা ছিলেন সম্রাটের খাস প্রতিবেদক। তাঁদের অবস্থান ছিল প্রদেশভিত্তিক এবং আখবর-নবিশরা ছিলেন হরকরাদের নিয়োজিত সংবাদদাতা।

আগের কথার সূত্র ধরেই একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটা হলো মধ্যযুগে ভারতবর্ষে হাতে-লেখা সংবাদপত্র ছিল। সেগুলোর সঙ্গে পেশাদার সংবাদদাতারা যুক্ত ছিলেন। ১৮২৮ সালে কর্নেল জেমস টড মুঘল দরবারে কয়েকশ' হাতে-লেখা সংবাদপত্র আবিষ্কার করে তা লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠান। এসব কাগজ লম্বায় ৮ ইঞ্চি এবং চওড়ায় সাড়ে ৪ ইঞ্চি ছিল।

নবিশ ও নিগার সংক্রান্ত সাংবাদিকতার এই প্রতিষ্ঠানটি টিকে ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত। তারপরে এর মাঝে একটা ছেদ পড়ে। তবে উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাভাষী অঞ্চলে সাংবাদিকতা বৃত্তির উন্মোচনে মুঘল সম্রাটদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। মাঝখানের একটা দীর্ঘ বিরতির পর ১৭৮০ সালে এ অঞ্চলে মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রথম যাত্রা শুরু। যিনি এই দুরূহ কর্মটি সমাধা করেছিলেন তাঁর নাম জেমস অগাস্টাস হিকি। কলকাতা থেকে প্রবাসী ওই ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রটি 'হিকির গেজেট' নামে পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্রিকাটির নাম ছিল 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার'। তবে হিকি সাহেবের সম্পাদিত বলে তা জনসাধারণের কাছে 'হিকির গেজেট' নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। ১৭৮০ সালে অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতে মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশনা শুরু হলেও এর ৭৮ বছর আগে ইংল্যান্ডে প্রথমবারের মতো দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশনার শুরু হয়। ১৭০২ সালের ১১ মার্চ প্রকাশিত বৃটেনের প্রথম দৈনিক পত্রিকাটির নাম হল 'ডেইলি কুর‍্যান্ট'। এর প্রকাশক ছিলেন এডওয়ার্ড ম্যালেট। এ হলো প্রকৃত সংবাদপত্র প্রকাশনার শুরু। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম হলো 'বোস্টন নিউজ-লেটার'। এটি প্রকাশ করেছিলেন একজন পোস্টমাস্টার। এখানে উল্লেখ্য, একটা দীর্ঘ সময় ধরে একজন পোস্টমাস্টার ও একজন সম্পাদকের বৃত্তিকে অবিচ্ছেদ্য বলে বিবেচনা করা হতো।

এদিকে ১৭৮০ সালে এদেশের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হলেও তারও ১২ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৬৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস তাঁর চাকরি যাবার পর পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানির লোকেরা সম্ভাব্য বিপদের গন্ধ পেয়ে বোল্টস সাহেবকে জাহাজে করে দেশে পাঠিয়ে দেন।

এই বিপদের গন্ধ কিন্তু সংবাদপত্র বিরোধিরা অনেক আগে থেকেই পেয়ে আসছিলেন। তাই মুদ্রিত সংবাদপত্রের ওপর দমনও শুরু হয় এবং তা নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজারা, মানে সরকারপক্ষ। আর মুদ্রণ সাংবাদিকতার জন্ম দিয়েছে সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ সাধারণ প্রজারা হলো ছাপা কাগজের প্রকাশক। কাজেই প্রজাদের হাতে শক্তিশালী একটি গণমাধ্যম চলে যাওয়াকে রাজারা কখনও সহজে মেনে নিতে পারেননি। বৃটেনের রাজা ষষ্ঠ হেনরী সিংহাসনে আরোহণ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ছাপাখানা ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, কোন কিছু ছাপতে গেলে লাইসেন্স নিতে হবে।

রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় (১৫৫৮-১৬০৩) রোমান ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে একজন প্যাম্ফলেট লেখায় তাঁকে ধরে ফাঁসিতে লটকানো হয়। উইলিয়াম প্রাইন বলে এক মুদ্রক-প্রকাশককে রাজদ্রোহের অপরাধে কান কেটে দেয়া হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। ছাপাখানার বিরুদ্ধে একেবারে প্রথম থেকে এই নিপীড়ন, দমন ও নিয়ন্ত্রণ অভিযানের প্রেক্ষাপটেই আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেসের সৃষ্টি। এই আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেস যেমন সেই মধ্যযুগে ছিল, তা বর্তমানেও আছে। উনিশ শ ষাটের দশকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতার নামে ভণ্ডামি চলছিল তখন কিছু রাগী তরুণ আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেস গড়ে তোলে এবং তাঁদের মন্ময় (Subjective) রিপোর্টিং সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতার জগতে ঝড় তুলেছিল। তাঁদের সেই জীবননিষ্ঠ ও মন্তব্যশ্রয়ী রিপোর্টিংই পরে এক অর্থে নিউ-জার্নালিজম বা নব্য সাংবাদিকতার জন্ম দেয়। সাংবাদিকতার সেই সূচনালগ্ন থেকেই সংবাদপত্র হয়ে ওঠে জোরদার ও ক্রমবর্ধমান জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার একটি হাতিয়ার। আর সে প্রেক্ষাপটেই কর্তৃপক্ষীয় লোকজনেরা একে খুবই মারাত্মক ও ক্ষতিকারক মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রতি পদে পদে সেইসব লোকের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে যারা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে গলা টিপে মারতে চেয়েছে। কিন্তু কপালে যাই লেখা থাকুক না কেন এই দমন নিপীড়নের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মানুষ যুগে যুগেই সোচ্চার হয়েছেন, সাহসী শব্দমালা উচ্চারণ করেছেন।

বিয়ে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি বিতর্ককে কেন্দ্র করে কবি জন মিল্টন খোলামেলা কিছু কথাবার্তা বলার পর ১৬৪৪ সালে প্রথম গৃহযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মুদ্রণের বিস্তার রোধকল্পে সংবাদপত্রের ওপর লাইসেন্সিং আরোপ করে। এই নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে এবং সেন্সরশিপকে আক্রমণ করে মিল্টন মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক মহান

একখানি পুস্তিকা 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা' (Areopagitica) রচনা করেন। কবি তাঁর ওই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পুস্তিকাখানিতে লিখেছিলেনঃ 'আমাকে জানার স্বাধীনতা দাও, আমাকে অবাধে কথা বলার স্বাধীনতা দাও, আমাকে মুক্তভাবে বিতর্ক করার স্বাধীনতা দাও, বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা দাও। সবার ওপরে দাও আমাকে মুক্তি।'

মিলটনের সতত প্রয়াস সত্ত্বেও বৃটেনে মুদ্রণের ওপরে লাইসেন্স প্রথা রহিত করতে আরো পঞ্চাশটি বছর লেগেছিল। অর্থাৎ ১৬৯৫ সালে ওই প্রথাটি রহিত হয় এবং তা সাংবাদিকতার সেইসকল পথিকৃৎ বা জনকের কার্যক্ষেত্রের ভিত্তি রচনা করেছিল। এঁরা যে শুধু সাংবাদিকতার পথিকৃৎ ছিলেন তাই নয়, তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রেরও এক একজন দিকপাল ছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন ডানিয়েল ডিফো, জোনাথন সুইফট, স্যার রবার্ট স্টিল, জোসেফ এডিসন প্রমুখ।

তাঁদের লেখায় ভাষা সমৃদ্ধ হলেও তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল সাংবাদিকতা। খবর উপযোগী তথ্য সংগ্রহ এবং সংবাদাকারে লেখার কৌশল তাঁরা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। কিছুটা মন্তব্যাশ্রয়ী হলেও সাংবাদিকতার এইসব পথিকৃৎ বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্টিং লেখার কলাকৌশল শিখিয়ে গেছেন। ডিফো লিখেছেন, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ভাষার সত্যিকারের স্টাইলটি কী তাহলে আমি বলবো, একজন মানুষ যেমন কোন উন্মাদ বা নির্বোধ ব্যতীত অন্য আর পাঁচশ জন সাধারণ অথচ বিভিন্ন সামর্থ বা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একই সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলেন এবং যে কথা তাঁদের সবাই বোঝে সেটাই হচ্ছে ভাষার প্রকৃত রূপ। অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষাই হচ্ছে সত্যিকারের ভাষা।

১৭০৪ সালে ডিফো 'রিভিউ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন এবং তিনি একটি পরিবর্তনশীল বৃটেনের দিনপঞ্জিকার তথা সাংবাদিকরূপে পরিগণিত হন। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের রিপোর্টার। তাঁর লেখা ছিল খুবই সহজ সরল কিন্তু তাতে প্রভাব বিস্তারকারী কথাবার্তা থাকতো। সে তুলনায় জোনাথন সুইফট খুবই উন্নতমানের ভাষা ব্যবহার করতেন কিন্তু তাতে তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক বক্তব্য থাকতো। তাঁর ভাষা ও বক্তব্যে কঠোর সমালোচনার রেশ থাকতো।

এতো গোলো সাংবাদিকতার শুরুতে বৃটেনের কিছু রথী-মহারথীর ভূমিকা। কিন্তু আমাদের এ উপমহাদেশে যখন হিকি সাহেব সাংবাদিকতার সূচনা করেন, তখন তাঁর লেখাতেও তীব্র রোষ ও শ্লেষ মেশানো থাকতো। হিকির সাংবাদিকতার সূত্র ধরেই এ উপমহাদেশে সাংবাদিকতার সত্যিকারের প্রসার ও বিকাশ ঘটে। তবে একথা সত্যি ইউরোপীয়রাই এ উপমহাদেশে আধুনিক সাংবাদিকতার জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিকে যখন বাঙালিদের মাঝে বিশেষ করে হিন্দুদের মাঝে ইংরেজি

শিক্ষার ঢেউ লাগতে শুরু করেছে তখনই খুব কাছাকাছি সময়ে অনেকগুলো পত্রপত্রিকা বের হয়। বিশেষ করে ১৮১৮ সাল থেকে ১৮২১ সাল ছিল এ অঞ্চলের সাংবাদিকতার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ইংরেজরা যেমন পত্রপত্রিকা বের করে তাতে শুধুমাত্র তাঁদেরই কথাবার্তা বলার প্রয়াস পেতো তখন এদেশীয় শিক্ষিত বাঙালিরা নিজেদের একটি পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের কথা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। তারই ফল গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের মালিকানাধীন পত্রিকা 'বাঙ্গাল গেজেট'। এটি প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের ১৬ মে তারিখে। প্রথম খাঁটি ভারতীয় সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট' প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় বাঙালি শিক্ষকের সম্পাদনায়। সেই থেকে শুরু বাঙালিদের বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার।

সাংবাদিকতা কী

আমরা এতক্ষণ সাংবাদিকতার সূচনা ও তার বিকাশ পর্ব সম্পর্কে সীমিত পর্যায়ে কিছুটা জানতে পারলাম। কিন্তু সাংবাদিকতা কাকে বলে তার প্রকৃত রূপটি আমরা এখনও জানতে পারিনি।

ইংরেজি 'জার্নালিজম' (Journalism) শব্দ থেকে সাংবাদিকতা কথাটি এসেছে। এই Journalism হলো Journal ও Ism এই দুটো শব্দের সমন্বিত রূপ। জার্নাল মানে কোন কিছু প্রকাশ করা (Publishing something), অন্য অর্থে দিনপঞ্জি এবং ইজম মানে অভ্যাস বা অনুশীলন বা চর্চা (Practice)। পুরো অর্থে দিনপঞ্জি অনুশীলন।

আরেক অর্থে সাংবাদিকতা সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে খবর ও মন্তব্য প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নয়। অন্য অর্থে 'সাংবাদিকতা' শব্দটি এমন একটি ছাঁচ যার দ্বারা এবং যার মধ্য দিয়ে সংবাদ জ্ঞাপন কিংবা সেই সংবাদের ওপর মন্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছায়। সেই সংবাদ বা মন্তব্য কাউকে উদ্দীপ্ত করে এবং জনগণের উৎসাহকে ধরে রাখে। মানুষের এইরকম চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা বা কার্যক্রম হচ্ছে সাংবাদিকতার মূল উপাদান।

কেউ কেউ বলেছেন, সাংবাদিকতা হচ্ছে সাততাড়াতাড়ির সাহিত্যপত্র। কেউ একে বলেন, চলমান ইতিহাস। অনেকের মতে, সাংবাদিকতা এক নৈর্ব্যক্তিক জীবন প্রবাহের খণ্ডাংশ মাত্র, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের মধ্যেই যার সীমানা বিস্তৃত। প্রতিনিয়ত এমন সব ঘটনা ঘটছে কিংবা ঘটনা ঘটার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে যে সেই জীবন প্রবাহের খণ্ডাংশ জানার জন্যে মানুষ যুগে যুগে প্রত্যহ অপেক্ষা করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেসলি স্টিফেনের একটি সংজ্ঞা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ সে বিষয়গুলোর ওপর পারিশ্রমিক নিয়ে লেখাই হচ্ছে সাংবাদিকতা। এখানে অবশ্য পারিশ্রমিকের প্রশ্ন এসে গেছে, কিন্তু সাংবাদিকতার (বিশেষত বর্তমানের)

স্বরূপই ওই। যিনি সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ কাজে নিয়োজিত থাকেন তিনি তা পারিশ্রমিকের বিনিময়েই করে থাকেন। আর যিনি তা পয়সা দিয়ে পড়ে থাকেন, তাঁর এই পড়ার বিশ্বাসটা তিনি ইতিহাসের সত্য সত্য খণ্ডাংশকে জানবেন এই ভিত্তির ওপর থেকে। কারণ সাংবাদিকতা কখনো মিথ্যার বেসাতি করে না। যদি করে তাহলে তা সাংবাদিকতা নয়।

স্যার এরিখ হজিনস্ সত্যিই তাই বলেছেন, সাংবাদিকতা হচ্ছে সঠিক, পরিজ্ঞাত ও ত্বরিতগতিতে তথ্যাদির এদিক-ওদিক এমনভাবে প্রেরণ যাতে করে সত্য পরিবেশিত হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও সব তথ্যের যথার্থতা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কোথাও নিশ্চয়তা রক্ষিত হোক বা না হোক সাংবাদিকতার উপরোল্লিখিত দুটো ধারণাই স্বাধীনতার দর্শনে বিকশিত হয়েছে। দর্শন দুটোর প্রথমটিতে বলা হচ্ছে জনগণ যা চায় তাকে তাই দাও। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে জনগণকে তাই দাও যেখানে সত্য নিহিত রয়েছে।

সংবাদপত্র কোন প্রচারণার হাতিয়ার (Propaganda machinery) নয়। সে যা বলে তা সত্য করেই বলে। যে সংবাদপত্র মিথ্যা কথা বলে, জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। জনগণের বিশ্বাসই সংবাদপত্রের ভিত্তি, তাই এ হচ্ছে গণমাধ্যম (Mass media) । একসময় পর্যন্ত সংবাদপত্রই ছিল একমাত্র গণমাধ্যম। কিন্তু এখন সে আর একা নয়। নব নব প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রেডিও, টিভি, ফিল্ম কিংবা বইপত্র। ইংরেজি 'Press' শব্দের প্রচলিত বাংলা পরিভাষা 'সংবাদপত্র' হলেও সাংবাদিকতা শুধু মুদ্রণ সাংবাদিকতায় পরিব্যাপ্ত নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রেডিও, টিভি, ফিল্ম বা অন্য কথায় ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতা। সেখানে তথ্য ও গণজ্ঞাপন পদ্ধতিই মুখ্য, তাই ডেভিড ওয়েনরাইট যথার্থই বলেছেন, Journalism is informaton. It is communication. It is the events of the day distilled into a few words, sounds or pictures, processed by the mechanics of communication to satisfy the human curiosity of a world that is always eager to know what's new.

সাংবাদিকতা হচ্ছে তথ্য। সাংবাদিকতা হচ্ছে জ্ঞাপন বা যোগাযোগ সাধন। সাংবাদিকতা হচ্ছে কিছু শব্দ, ধ্বনি বা চিত্রের রূপে রূপায়িত প্রতিদিনের কিছু ঘটনাবলী। নতুনকে জানার জন্য বিশ্বের মানুষের অদম্য কৌতূহল মেটানোর লক্ষ্যে জ্ঞাপন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত।

একে আরো পরিশীলিত করে ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংজ্ঞায় বলেছেন, সাংবাদিকতা চলমান জীবনের শব্দময় প্রতিচ্ছবি, যা কখনও মন্ময় (Subjective), কখনও বস্তুনিষ্ঠ।

সাংবাদিকতা এই প্রতিচ্ছবিকে আপন হৃদয়ে ধারণ করে তাকে আবার সাধারণের কাছে ফিরিয়ে দেবার একটি জটিল পদ্ধতি। সাংবাদিকতা বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য ও দ্রুতলয়ের ইতিহাসের এক সংমিশ্রণ। সাংবাদিকতা জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি প্রকৃতি বর্ণনার এক কৌশল।

শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিনোদন তথা মানব সভ্যতা বিকাশের মূল বাহন হচ্ছে সাংবাদিকতা। চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, ধ্যান-ধারণার বিবর্তন, সমাজ বিপ্লব কিংবা সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারক ও বাহক হলো সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতা শুধু ইতিহাস নির্মাণ করে না, ইতিহাস নির্মাণেও সাহায্য করে। তার পথনির্দেশিকা দেয়। সাংবাদিকতা মানুষের জীবন আচরণের এক নিত্যসঙ্গী।

উইকহ্যামস্টিডের মতে, সাংবাদিকতা হচ্ছে সমাজসেবার প্রধান একটি আধুনিক রূপ।

সাংবাদিক কে

সাধারণ অর্থে যিনি সংবাদের সেবা করে থাকেন তিনিই সাংবাদিক। আরেক অর্থে যিনি সংবাদ লেখক তিনিই সাংবাদিক। আধুনিক সাংবাদিকতায় একজন পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক হচ্ছেন তিনি, যিনি রিপোর্টিং এডিটিংসহ সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শাখাতেই সমান পারদর্শী। এই প্রেক্ষাপটে 'সাংবাদিক' কে সে বিষয়ে আমরা কতগুলো সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি। যদিও 'সাংবাদিক' কথাটি হচ্ছে খুবই বিস্তৃত মাত্রার পদ। কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তাকে চেনার উপায় সেই, তবে মোটামুটি একটি চেহারা দাঁড়া করানো যায় যে একজন সাংবাদিক সংবাদ উপযোগী ঘটনাবলীর তথ্য সংগ্রহ করে তা সংবাদাকারে পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং তার বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে তাঁর কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট থাকা দরকার, তা না হলে তাঁর সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্যতা খর্ব হতে পারে সংবাদ সূত্রের কাছে। অবশ্য কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার সময় তিনি শুধুমাত্র শ্রমের বিনিময়ে সংবাদ বিবরণী উপস্থাপন করেন না বরং তিনি পাশাপাশি সমাজের দায়িত্ব পালন করেন। জনগণের একটি বৃহত্তর অংশের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। মানুষের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি তাঁর পত্রিকার জন্য জনসাধারণের মাঝে শুভেচ্ছার সেতুবন্ধ রচনা করেন।

অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে, একটি সরকারি সাময়িকী সম্পাদনা ও লেখার মাধ্যমে যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনিই সাংবাদিক।

অপরদিকে আর ডি ব্লুমেনফেল্ড বলেন, যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহ এবং তাকে সংবাদ উপযোগী করে তৈরি ও প্রকাশ করেন তিনিই সাংবাদিক।

টি এইচ এস স্কট বলেছেন, একটি প্রদেয় লক্ষ্যানুযায়ী সাময়িক বিরতিতে লেখার মাধ্যমে যিনি জনমতকে প্রভাবিত করতে চান, তিনিই সাংবাদিক।

অবশ্য একজন পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিকের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'দ্য টাইমস'-এর সম্পাদক উইকহ্যামস্টিডের সংজ্ঞায়। তিনি বলেছেন, 'একজন আদর্শ সাংবাদিক হচ্ছেন তিনি, যিনি আত্মীকরণ করে নিপুণতা অর্জন করেছেন প্রাচীনের প্রাজ্ঞতা, অধিকতর আধুনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান, প্রকৌশলীর যন্ত্রবিদ্যা, তাঁর নিজের ও অন্যান্য সময়ের ইতিহাস, অর্থনীতির মূল শর্তাবলী, সামাজিক রাজনৈতিক জীবন, চিন্তা-ভাবনা ও তার উপলব্ধি এবং চাহিদা অনুয়ায়ী তার সরবরাহ আর লক্ষ লক্ষ পাঠকের ইচ্ছা পূরণার্থে নীতিগতভাবে সেগুলোকে জ্ঞাত করা'।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন সাংবাদিক শুধুমাত্র সংবাদ সংগ্রহ করেন না। তিনি তাঁর সমকালের ইতিহাসের চঞ্চল স্রোতের ভেতর বাস করছেন, দেখছেন ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ও নির্মাণকে এবং সেখানে থেকে তুলে আনা টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে আগামীর ইতিহাসকে নির্মাণ করে দিচ্ছেন। এই দায়িত্বটি পালন করতে গিয়ে তাঁর প্রয়োজন অসাধারণ মেধা, মনন, সৃজনশীলতা ও যোগ্যতার।

একজন পেশাদার সাংবাদিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ১৯৭৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবাদপত্র আইনে বলা হয়েছে, পেশাদার সাংবাদিক হচ্ছেন একজন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক যিনি একটি সংবাদপত্র বা এতদসংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত — যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন সম্পাদক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, অনুলিপি পরীক্ষক (কপি টেস্টার), কার্টুনিস্ট, সংবাদ আলোকচিত্রী, ক্যালিগ্র্যাফিস্ট ও প্রুফ রিডার (সংবাদ সংশোধক)।

সাংবাদিকতার একজন পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তি এম ভি কামাথ তাঁর সংজ্ঞায় বলেছেন, একজন পেশাদার সাংবাদিক হচ্ছেন কোন পত্রিকার একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী যিনি সেই পত্রিকার জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, ফিচার লেখেন, সম্পাদনা করেন ও কপি সম্পাদনা করেন। তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন— সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, নগর সম্পাদক, বার্তা সম্পাক, প্রতিবেদক, ফিচার লেখক, বিশেষ সংবাদদাতা, সহকারী সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, বাণিজ্যিক সম্পাদক প্রভৃতি।

পাকিস্তান প্রেস কমিশনের মতে, সংবাদপত্রের সম্পাদনা এবং রিপোর্টিং বিভাগে কর্মরত ও সংবাদ সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরাই হচ্ছেন সাংবাদিক।

১৭১০ সালের 'জার্নালিস্ট' কথাটি গৃহীত হয়েছে। অ্যাডিসনের নামের সঙ্গে 'সাংবাদিক' কথাটি মুদ্রিত হয় এবং ডানিয়েল ডিফো তা পরে গ্রহণ করে নেন।

তবে সাংবাদিকতার সেই সূচনার দিনে তাঁর বিভিন্ন কাজের ধরনের জন্য তাকে তখন বিভিন্ন নামে ডাকা হতো। যে ব্যক্তি সংবাদ অনুসন্ধান, যাচাই ও মূল্যায়নের পর তা লিখে থাকেন তিনিই সাংবাদিক। কিন্তু সে আমলের সাংবাদিকের কাজের ধরন সেভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল না বিধায় তাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হতো। যেমন —

তিনি ছিলেন কাগজের ভদ্রলোক বা লিখিয়ে বাবু (Gentleman of Pad)।

তিনি একজন বয়ানকারী বা হিজিবিজি লেখার লোক বা রচনাকার (Man of scribble)
তিনি একজন সরকারি লেখক (Public Writer)
তিনি একজন সংবাদ রটনাকারী বা খবরবাজ (News monger)
তিনি একজন প্রণেতা (Author)
তিনি সংবাদের একজন চালানদার (Purveyor)
তিনি হচ্ছেন রাজলেখক (Court Pamphleteer)
তিনি হলেন কিউরান্টো মেকার (Curanto maker) বা চলতি ঘটনাবলীর সৃষ্টিকার।

তাঁকে কখনো কখনো ইনটেলিজেন্সিয়ারও (Intelligencer) বলা হতো। সে অর্থে তিনি গোয়েন্দা আবার কখনো তিনি সব্যসাচী।

বেন জনসনের 'স্টেপল অফ নিউজ'-এ উল্লিখিত এমিসারি (emissary) বা দূতরা ছিলেন দৃশ্যত আজকের দিনের রিপোর্টার, 'এগজামিনার অফ দ্য রেজিস্টার' (Examiner of the register) ছিলেন প্রকৃতপক্ষে আজকের 'সম্পাদক' এবং আজকের দিনের সহ-সম্পাদকদের উল্লেখ করা হতো ক্লার্ক বা করণিক হিসেবে।

'সম্পাদক' শব্দটি যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক। ডিফো একসময় এই সম্পাদককে 'জার্নাল ম্যান ' বা 'জার্নাল স্ক্রাইব' বলে অভিহিত করতেন এবং জেন্টলম্যান অফ প্যাড, মেন অফ স্ক্রিবল, ওয়ার্ল্ড ইনস্টিকেটর বা পাবলিক রাইটার প্রভৃতি শব্দ থেকে পার্থক্য করে দেখতেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও সাংবাদিকদের একটি বিকল্প পদবী 'নিউজপেপার ম্যান' হিসেবে ডাকা হতো। বিশেষ করে তা যুক্তরাষ্ট্রে। তবে ইদানীং সেই নিউজপেপারম্যান বা সংবাদপত্রসেবীর নাম আরো পরিমার্জিত হয়ে রূপ ধারণ করেছে নিউজম্যান বা সংবাদসেবী হিসেবে। কোন কোন সংবাদ মাধ্যমে সাংবাদিকের নাম দেয়া হয়েছে 'নিউজ রাইটার' হিসেবে।

সাংবাদিকের নামের এই ক্রমপরিবর্তনের পিছনে অবশ্যই কারণ ও যুক্তি রয়েছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত মুদ্রিত সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সাংবাদিকতা সীমাবদ্ধ ছিল। ততদিন পর্যন্ত

একজন সাংবাদিক সংবাদপত্রসেবী বা নিউজপেপারম্যান বা প্রেসম্যান হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্র নামের গণমাধ্যমের সঙ্গে যখন অপর দুটি গণমাধ্যম রেডিও ও টেলিভিশন যুক্ত হলো তখন সাংবাদিক বলতে শুধু নিউজপেপার ম্যান থাকলেন না। তিনি তখন থেকে নিউজম্যান বলে পরিচিত হলেন। 'প্রেস'-এর বাংলা পরিভাষা 'সংবাদপত্র' করা হলেও এই প্রেসের অন্তর্ভুক্ত এখন মুদ্রিত সংবাদপত্র ছাড়া রেডিও-টেলিভিশন তথ্য সম্প্রচার মাধ্যমসমূহ। স্বাভাবিকভাবেই একজন সাংবাদিক সংবাদপত্রসেবী না হয়ে তাঁকে 'সংবাদসেবী বা নিউজম্যান' বললেই তাঁর সামগ্রিক অবয়বটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

অপরদিকে আধুনিক সাংবাদিকতার যতগুলো শ্রেণী বা বিভাগ রয়েছে তার প্রতিটি বিভাগে কর্মরত মানুষগুলো একেকজন সাংবাদিক। আগে একসময় একজন সংবাদসেবীকে সংবাদ সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রকাশ পর্যন্ত খাটতে হতো। কাজ করতে হতো। কিন্তু আজকে যিনি রিপোর্ট করেন বা রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন তিনি সাব-এডিটরের দায়িত্ব পালন করেন না। আবার একজন সাব এডিটর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন না। তবে পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক হতে হলে একজনকে সাংবাদিকতার প্রতিটি শাখাতেই বিচরণ করতে হয়, দক্ষতা অর্জন করতে হয়। বাংলাদেশ সংবাদপত্র আইন অনুসারে একজন প্রুফ রিডারও (বর্তমানের সম্পাদনা সহকারী) সাংবাদিক। অর্থাৎ যিনি সংবাদ বিষয়ে লেখালেখি বা ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকেন বা সংবাদগল্প তৈরিতে কমবেশি ভূমিকা রাখেন তিনিই নিউজ রাইটার। একজন সাংবাদিক তাই হচ্ছেন পূর্ণাঙ্গ সংবাদসেবী। মনে হয় এ নামটিই তাঁর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত।

সাংবাদিকের গুণাবলী

মানুষ যে যে পেশায়ই থাকুন না কেন তাঁর নিজ পরিমণ্ডলে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করার জন্য কতকগুলো গুণ থাকা দরকার। সাংবাদিকের ক্ষেত্রেও তাই। তবে অন্য পেশার তুলনায় সাংবাদিকতা বৃত্তির লোকজনের জন্য একটু ভিন্নধর্মী গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। সাংবাদিকতার একাডেমিক শিক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও অনেকে পরিপূর্ণ সাংবাদিক হতে পারেন না। আবার অনেকে সাংবাদিকতায় একাডেমিক ডিগ্রি না নিয়েই বিরাট মাপের সাংবাদিক হয়েছেন এরকম নজির বহু রয়েছে। তবে 'সাংবাদিক জন্ম নেয়, তৈরি হয় না' একথাটা ভুল। সাংবাদিক হবার জন্য যে সকল গুণাবলী প্রয়োজন তা যদি কেউ রপ্ত বা করায়ত্ত করতে পারেন তাহলে কারো পক্ষে বড় সাংবাদিক হওয়া কোন অসুবিধা নয়।

একজন চিকিৎসক কিংবা একজন আইনজীবীকে তাঁর পেশায় পরিপূর্ণ হতে গেলে তাকে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের মাধ্যমেই তা করতে হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত একটি পাঠ ও

অভিজ্ঞতা নিয়ে কোন একজন ভালো সাংবাদিকে পরিণত হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর যদি সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক (Nose for news) বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, পুলিশ বা গোয়েন্দার মতো তার যদি দেখার বা বোঝার চোখ ও মন থাকে, সাহিত্যিকের মতো অনুভূতি থাকে আর যদি থাকে মাতৃভাষা ছাড়াও অপর একটি আন্তর্জাতিক ভাষার (বিশেষত ইংরেজি) ওপর দখল তাহলে তিনি একজন ভালো ও সফল সাংবাদিকে পরিণত হবেন।

একজন সফল সাংবাদিক হতে হলে প্রথমেই তাঁকে তার পেশার প্রতি হতে হবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। কাজের প্রতি তাঁর মহান দায়িত্বের কথা তাঁকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। কারণ পেশাগত বৃত্তি পালনের পাশাপাশি তাঁর সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে।

তিনি হবেন কঠোর পরিশ্রমী। সাংবাদিকের কোন বাঁধাধরা সময় নেই। তাঁকে যখন তখন যেকোন জায়গায় যেতে হতে পারে। যেকোন সময় যেকোন জায়গায় তাঁর ডাক পড়তে পারে। কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা না থাকলে তিনি এ পেশায় টিকতে পারেন না। আর এই পরিশ্রম করার স্বার্থেই তাঁকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হয়। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক বলেছেন, সাংবাদিকতায় সাফল্য লাভ করতে হলে কাজের যোগ্যতার পাশাপাশি শারীরিক দিক দিয়েও তাঁকে পুরোপুরি সামর্থবান হতে হবে।

তিনি হবেন কৌতূহলী। সবকিছুর ব্যাপারে তাঁর একটা জানার আগ্রহ বা কৌতূহল থাকবে। তাঁর থাকবে তীব্র পর্যবেক্ষণী ক্ষমতা। কোন বিষয়ে কৌতূহল না জন্মালে সে বিষয় সম্পর্কে তিনি পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ করার আগ্রহও খুঁজে পাবেন না। সবকিছুর ভালো মন্দ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে।

তাঁকে অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। সংবাদসূত্র বা সংবাদ বিষয়ে তাঁর ভালো জ্ঞান-বুদ্ধি থাকতে হবে। সংবাদ সংগ্রহ ও তা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। পাশাপাশি তাঁর তীব্র কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকতে হবে। তার মানে এই নয় যে তিনি কোন ফ্যান্টাসির রাজ্যে বাস করেন কিংবা অলীক কিছু কল্পনা বা উদ্ভাবন করেন।

তাঁকে হতে হবে যথেষ্ট সাহসী এবং তাঁর নার্ভ থাকবে যথেষ্ট মজবুত। প্রতিনিয়ত তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের ময়দানে অথবা বিপদসঙ্কুল সমুদ্রেও তাঁকে কাজ করতে যেতে হয়। 'ফকল্যান্ড যুদ্ধের' মতো পরিস্থিতিতে তাঁকে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও আটলান্টিকের গভীর সমুদ্রে যেতে হয়। আবার মরুভূমি বা পাহাড় অঞ্চলেও কাজ করতে হয়। যিনি ভীরু প্রকৃতির তাঁর দ্বারা সাংবাদিকতা নয়। সাংবাদিকতা করতে হলে জীবনে ঝুঁকি ও বিপদ বারবার আসে। সাহসের সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে হবে। বহু লোক তাঁর লেখায় বা কথায় চটে যেতে পারে। তাঁর

জীবন বিপন্নের হুমকিও আসতে পারে। তাঁরপরেও তাকে পিছু হটলে চলে না। ভেঙে পড়লে চলে না।

তিনি হবেন সবসময়ই সৌজন্যবাদী। বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি হবেন শান্তশিষ্ট, ভদ্র। সাংবাদিকের কখনো খিটখিটে মেজাজ থাকতে নেই। তাহলে তাঁরপক্ষে কোন কাজ উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই। তিনি অহংকারী অথবা গোমড়ামুখো হবেন না। তিনি সব সময়ই হবেন সহাস্যবদন। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা সবাইকে আকৃষ্ট করবেন। তিনি এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবেন যাতে লোকে তাঁকে পছন্দ করে। তিনি হবেন সহনশীল, সবার সঙ্গে তাঁর মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে এবং বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার মতো ধৈর্য তাঁর থাকতে হবে। কোন কাজে বারবার ব্যর্থ হলেও তাঁকে হাল ছাড়লে চলবে না। 'অক্ষমতা' বলে কোন শব্দ তাঁর অভিধানে লেখা নেই।

'সৎ সাংবাদিকতা' বলে আজকাল প্রায়শই কথা উঠছে। সাংবাদিককে অবশ্যই সৎ হতে হবে। সাংবাদিকতার পথ পিচ্ছিল ও প্রলোভনের পথ। সেই প্রলোভনের পথ তাঁকে জয় করতে হবে। এ জয় নিজের ইন্দ্রিয়কে জয়। নিজেকে জয় করতে না পারলে সাংবাদিক তাঁর 'মিশন' থেকে বিচ্যুত হবেন।

তাঁর কাজে সবসময় একটি ক্ষিপ্রতা থাকবে। কারণ প্রতিটি সাংবাদিক একটি সুনির্দিষ্ট সময় বা ডেডলাইনের ভেতরে বসে কাজ করেন। সময়ের গতিকে পরাজিত করে কাজ করার যোগ্যতা তাঁকে অর্জন করতে হবে। দ্রুত কাজ করার মধ্যেও তাঁকে নির্ভুল হতে হবে। তথ্যগত ভুল ও ভাষাগত শিথিলতার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তিনি তাঁর আস্থা হারাতে পারেন।

সাংবাদিকের থাকবে তীব্র স্মৃতিশক্তি। বিভিন্ন ঘটনার সময়, ক্ষণ, তারিখ, মানুষজনের জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের তারিখ তাঁর দৈনন্দিন কাজে প্রায়শই ব্যবহার করতে হয়। বিভিন্ন মানুষজনের নামধাম, টেলিফোন নম্বর, হিসাব, সংখ্যা প্রভৃতিও তাঁর প্রত্যহ প্রয়োজন হয়। এসব কিছু সবসময়ই তাঁর হাতের কাছে থাকে না। স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই তাঁকে এগুলো উল্লেখ করতে হয়। প্রখর স্মৃতিশক্তি সাংবাদিকের একটি বড় গুণ।

সাংবাদিকের চোখ কান সবসময়ই খোলা থাকবে। চলতি পথে অনেক ঘটনা, কথাবার্তা, ইঙ্গিত তাঁর জন্য বড় কোন সংবাদ ঘটনার সূত্র মিলিয়ে দিতে পারে। তিনি তাঁর চলতি পথের কোন তুচ্ছ ব্যাপারকেই ডাস্টবিনে ফেলে দেয়ার মতো কিছু ভাববেন না।

একজন সাংবাদিক হবেন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি বুদ্ধিমান হবেন তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে কুটবুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে। অনেক সময়ই তাঁকে তাঁর স্বার্থ (সংবাদ সংগ্রহ)

হাসিলের তাগিদে কুটিলতার আশ্রয় নিতে হয়। তবে তিনি যে কুটিলতার আশ্রয় নিচ্ছেন এটা যাতে ধরা না পড়ে সে ব্যাপারেও তাঁকে সচেতন থাকতে হবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রয়োজনমতো রণকৌশল বদল বা গ্রহণ এই কুটিলতার অন্যতম শর্ত।

সাংবাদিক হবেন দল বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ। তবে নিশ্চিতরূপেই একজন আদর্শবাদী। বাংলাদেশের মতো দেশে আমরা যখন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সেখানে একজন সাংবাদিক দল নিরপেক্ষ হলেও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। তিনি হবেন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কিন্তু তিনি কখনোই কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন। তিনি হবেন সাধারণ গণমানুষের পক্ষের লোক।

সাংবাদিকের মধ্যে রসবোধ ও সাহিত্যবোধ থাকতে হবে। তাঁর প্রখর সাহিত্যিক মন ও তীব্র অনুভূতি থাকতে হবে। তিনি সাহিত্য প্রবণ হলেও ভাবপ্রবণ হবেন না। যে সংবাদ ঘটনায় তথ্যভিত্তিক সমালোচনামূলক রচনার অবকাশ ছাড়া আর কিছু নেই, সেখানেও সাংবাদিক তাঁর রসবোধের কারণে মিছরির ছুরি হানতে পারেন। ইংরেজি নববর্ষকেও আমরা স্বাগত জানাই, কিন্তু সেই নববর্ষকে কেন্দ্র করে যখন অভিজাত শ্রেণীর উদ্দাম উল্লাস ও তাণ্ডব উৎসব চলে তখন সেখানে ভাষার ফুলঝুরি দিয়ে লেখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সর্বোপরি সাংবাদিকের থাকবে নেতৃত্বদান করার ক্ষমতা। তাঁর জন্য চাই সংগঠন শক্তি। জীবনের প্রতিটি স্তরে ও ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর পক্ষের ও মতের লোকজনদের সমবেত করা এবং নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। লোকস্বার্থে তাঁকে সবার প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে।

মনে রাখতে হবে একজন সাংবাদিক হচ্ছেন সমাজের প্রতিভূ। সমাজসেবাই তাঁর মূল লক্ষ্য। ব্যক্তি মানুষের চেয়ে সমাজ মানুষ হয়ে উঠতে পারাটা তাঁর জন্যে বড় কৃতিত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব

সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য

আগেই বর্ণিত সূত্র অনুসারে আমরা প্রেস বা সংবাদপত্র বলতে শুধুমাত্র মুদ্রণ সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আলোচনা করবো না। আমাদের আলোচনার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ইলেকট্রনিক বা সম্প্রচার সাংবাদিকতাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যকে সাংবাদিকতার কিংবা সংবাদক্ষেত্রের উদ্দেশ্য বলেও ধরে নিতে পরি।

প্রেস বা সংবাদক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে একেকটি গণমাধ্যম অর্থাৎ মুদ্রিত সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি প্রভৃতি। তাই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য বলতে এখানে গণমাধ্যমের কাজকেই বোঝায়। সংবাদপত্রের তথা সাংবাদিকতার বা গণমাধ্যমের মূলত চারটি কাজ:

এক. তথ্য সরবরাহ করা (To inform)
দুই. শিক্ষিত করা (To educate)
তিন. প্রভাব বিস্তার করা (To persuade)
চার. চিত্ত বিনোদন করা (To entertain)

এ চারটি মূল কাজ ছাড়াও প্রেস বা গণমাধ্যমসমূহ আরো কিছু কাজ করে। যেমন কোন কিছু সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা (To interprete), কোন কিছু বা বিষয় সম্পর্কে পথ নির্দেশ বা পরিচালিত করা (To guide) প্রভৃতি। এছাড়াও সংবাদ মাধ্যমসমূহের আরো কিছু কাজ আছে। যেমন বিজ্ঞপ্তি প্রচার কিংবা কোন দেশের বিশাল জনসমষ্টিকে তথ্য ও মন্তব্য দ্বারা সমৃদ্ধ করা যা সংবাদের সাধারণ তত্ত্ব হিসেবে আসে না।

খবর প্রচার করা সাংবাদিকতার প্রথম বৈশিষ্ট্য। তথ্য প্রচার হচ্ছে গণমাধ্যমের সবচেয়ে বড় ভূমিকা। প্রেস সবসময়ই নতুন তথ্য সম্প্রচার করে। এই নতুন তথ্য আসে সংবাদাকারে। আমেরিকার একটি সংবাদপত্রের মতে, ওই সমাজের লোকজন কী করছে, কী ভাবছে বা তাঁদের অনুভূতি কী সে বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা সংবাদক্ষেত্র বা প্রেসের প্রাথমিক কাজ। খবর বা তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকলে সভ্যতার ইতি হয়তো ঘটতো অনেক আগেই। এইচ জি ওয়েলস্ একদা বলেছিলেন, রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটতো না যদি তাঁদের সংবাদপত্র থাকতো। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল সংবাদ মাধ্যমগুলো তাঁকে বয়কট করার কারণে। দৈনন্দিন ঘটনা ছাড়াও কতকগুলো নৈমিত্তিক তথ্যের

জন্যে পাঠক গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া, শেয়ার বাজার, দিনপঞ্জি, সিনেমা শো, সভা-সমিতি প্রভৃতির সব তথ্যই সংবাদ মাধ্যমে এসে থাকে।

এছাড়াও সংবাদ মাধ্যম রাজনীতি, সরকারের উত্থানপতন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি আলোচনা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিভিন্ন রথী-মহারথীর চিন্তা-ভাবনা, বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত, সেনা অভ্যুত্থান, খেলাধুলা এসব কিছু সম্পর্কে প্রত্যহ তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সংবাদমাধ্যম ছাড়া এ বিশ্ব অচল। আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন যথার্থই বলেছেন, সংবাদপত্রবিহীন সরকার এবং সরকারবিহীন সংবাদপত্রের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে তিনি দ্বিতীয়টিকে বেছে নিতে দ্বিধা করবেন না।

আধুনিক যুগে সংবাদমাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা বিস্তারের এক অন্যতম হাতিয়ার। মুদ্রণ সাংবাদিকতার শুরুটা হয়েছিল বলা যায় বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এখন পর্যন্ত বই হলো শিক্ষার প্রধান উপকরণ। মুদ্রিত বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে শিক্ষা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রতিনিয়ত মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে। বাংলাদেশের অন্যতম দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক জনকণ্ঠ' উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোচিং ক্লাস শুরু করেছিল এবং তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দারুণ সাড়াও মিলেছে। শুধুমাত্র পদ্ধতিগত শিক্ষাদানই সংবাদপত্রের কাজ নয়, মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য, তাঁদের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য মুদ্রিত সংবাদপত্র দারুণভাবে কাজ করে। সংবাদপত্র নানা বিষয়ের অবতারণা করে পাঠকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার ঘটায়।

মুদ্রিত সংবাদপত্র ছাড়া রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমেও শিক্ষা বিস্তারের কাজ চলছে। স্কুল কলেজে রেডিও-টেলিভিশন মারফত দূরশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পাঠক্রম আজ টেলিভিশন মারফত সরবরাহ করা হচ্ছে।

সংবাদপত্র, রেডিও-টিভির সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের প্রেক্ষাপটে তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক সঞ্চারতা (Psychic Mobility) আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সংবাদমাধ্যমগুলো তার সংবাদ নিবন্ধ থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ের মারফত জনগণকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। পাঠক এতে দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছে। এমনকি পাঠক সংবাদপত্রের শিক্ষা বিষয়ক বিষয়বস্তু নির্ধারণেও বড় ভূমিকা রাখছে। অর্থাৎ সংবাদপত্রসমূহ কার্যকরভাবে দ্বিমুখী যোগাযোগ সাধন করে যাচ্ছে।

আদিমকাল থেকেই সাংবাদিকতা মানবজীবনকে প্রভাবিত করতে চায়। বই, বেতার বার্তা, প্যাম্পলেট, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি, কার্টুন ও কথামালা এবং

টিভিতে অনুষ্ঠিত সব স্বপ্নময় কথাবার্তার মাধ্যমে সাংবাদিকতা মানব মনকে নিজের দিকে টেনে আনতে সচেষ্ট হয়। মানুষের মনকে নিজের দিকে টেনে আনার জন্য, কোন বিষয় সম্পর্কে মানুষের মন টলানোর জন্য তাই সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের সর্বপ্রকার যুক্তিতর্ক ফন্দিফিকির উপস্থাপন করে। গণমাধ্যমের প্রভাব জনমানসে খুবই শক্তিশালী। সংবাদক্ষেত্র বা প্রেস কখনো মিথ্যে বলে না মানুষের এই সুগভীর বিশ্বাসের ওপর ভর করেই সংবাদ মাধ্যমগুলো জনগণের ওপর কোন বিষয় সম্পর্কে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়। তবে সব গণমাধ্যমই যে জনগণকে সমানভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন নয়। কারণ গণমাধ্যমে প্রচারিত কোন কথাবার্তা সমাজের এক শ্রেণীকে প্রভাবিত করলেও আরেকটি শ্রেণী সমভাবে প্রভাবিত নাও হতে পারে। তবে সংবাদপত্রের প্ররোচনাতেই যে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেতে পারে তার নজিরও ইতিহাসে রয়েছে। নিউইয়র্ক জার্নালের প্রকাশক উইলিয়াম র‍্যাঁডলফ্ হার্স্ট বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে আমেরিকা ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। ভলটেয়ারের বই পড়েই ফ্রান্সের জনগণ তাদের দেশে বিপ্লব ঘটানোর অনুপ্রেরণা পেয়েছিল যা 'ফরাসি বিপ্লব' নামে পরিচিত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্র' ও অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দারুণ অনুপ্রেরণা যোগাতো।

সংবাদমাধ্যমগুলোতে সংবাদ প্রচার হয়। আবার তার পাশাপাশি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করা হয়। সকল সম্পাদকীয় অভিমত এমন সব শব্দাবলীতে প্রচারিত বা প্রকাশিত হয় যা জনগণকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্র ও বিবিসি থেকে প্রচারিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মতামত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জনগণকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আবার বিবিসির সংবাদ ও সাংবাদভাষ্য বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। প্রতিটি সংবাদমাধ্যমই ফিচার, কার্টুন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও অভিমতের কথিকা দিয়ে তার পাঠক দর্শক ও শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ এবং প্রভাবিত করার কাজে নিয়োজিত থাকে। সংবাদ ভাষ্যকাররা তাঁদের ভাষ্যে এমন সব জোরদার কথাবার্তা বলেন, জনগণ তাতে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। সংবাদক্ষেত্রের মাধ্যমে যা কিছু বলা হচ্ছে বা করা হচ্ছে তা হচ্ছে যোগাযোগ সাধন। আর এই যোগাযোগের পিছনে ছড়িয়ে আছে প্রভাবন (Persuasion)। প্রভাবনের লক্ষ্যই হচ্ছে উৎসের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে প্রাপকের দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে আনা।

সংবাদমাধ্যমসমূহ তথ্য সরবরাহকারী, তথ্যের ব্যাখ্যাকার, শিক্ষাদাতা ও অভিমতের প্রবক্তার মতো দুর্দান্ত কতকগুলো ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি তার কার্যক্রমে 'বিনোদনকেও' একটি বিরাট গুরুত্ব দিয়ে রেখেছে। মানুষের এ এক ঐতিহাসিক অগ্রগতি। মানুষ অন্য প্রাণীর চেয়ে জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ, তাই সে নিজেকে এক

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাঁধতে পেরেছে। মানুষের এই সাংস্কৃতিক জীবনকে সমুন্নত রাখা, তাঁর সাংস্কৃতিক বোধকে জাগ্রত করা ও তাঁর বিকাশে সংবাদমাধ্যমগুলো এক বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিনোদনের মাধ্যমে মানুষের কর্মস্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। তাঁর মন পরিশীলিত হয়, হৃদয় প্রসারিত হয়। তাঁর সূক্ষ্ম হৃদয়তন্ত্রীগুলো সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, মন প্রফুল্ল হয়। আর এসব কাজে সংবাদমাধ্যমগুলো বিশেষ করে রেডিও টিভি দারুণ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে চলচ্চিত্র, বেতার ও টেলিভিশন বিনোদনভিত্তিক। বিনোদনভিত্তিক বলেই এই মাধ্যমগুলোর এত জনপ্রিয়তা ও চাহিদা রয়েছে।

বিনোদনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র বা টিভির মতো বড় ভূমিকা মুদ্রিত সংবাদপত্রের নেই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের বিস্তারিত কাহিনী যাঁরা পড়তে ভালোবাসে সেই সমস্ত কাহিনী দিয়ে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনসমূহ তার পাঠকদের উজ্জীবিত করতে পারে। রসপূর্ণ উপাখ্যান, গল্প, কাহিনী ও বিনোদনমূলক ফিচার প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো বিনোদন দিতে পারে। টার্জান জাতীয় ফটোফিচার দিয়ে, ক্রসওয়ার্ড পাজল কিংবা কমিকের মাধ্যমেও সংবাদপত্রগুলো পাঠকের চিত্তবিনোদন করতে পারে। শিক্ষামূলক চুটকি, রম্য ও ব্যাঙ্গাত্মক রচনার মাধ্যমেও আমরা বিরল আনন্দ উপভোগ করে থাকি।

কোন সংবাদ ঘটনার ব্যাখ্যা করাও সাংবাদিকতার কাজ। জটিল এই যন্ত্রযুগে মানুষ আর কোন খবরের সাদামাটা দিকটি নিয়েই সন্তুষ্ট নয়। তাই খবরের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা খুবই জরুরি। মানুষের বর্তমান জীবন জটিল এবং সেই জীবন প্রবাহে মানুষের স্বার্থ এতখানি বিজড়িত যে তার সূত্র খুঁজে পেতে বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ঘটনার খবরাখবর, তার তত্ত্ব, তার ব্যাখ্যা কিংবা কোন কাহিনীর ভিত্তিভূমি পর্যালোচনা প্রভৃতির ব্যাপারে পাঠক ও শ্রোতার যে আগ্রহ বাড়ছে তার সব কিছুই বর্তমান সাংবাদিকতায় মেটানো হচ্ছে। ঘটনার পূর্বাপর তাৎপর্য সম্পর্কে সাংবাদিকতায় জানানো হচ্ছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক-শ্রোতা তাঁদের ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে সংবাদমাধ্যমসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন খবরের ব্যাখ্যাকার, বিভিন্ন ঘটনা, পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাখ্যাকার। সংবাদক্ষেত্র বা প্রেস সমাজের পথনির্দেশক বা পরিচালক হিসেবেও ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে সংবাদক্ষেত্র যথেষ্ট নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। সংবাদক্ষেত্রের একটি সামাজিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকার রয়েছে। জাতির মানস গঠনে সে বড় ভূমিকা রাখে। যথাযথ স্বাধীনতা ভোগকারী সংবাদক্ষেত্র সমাজের শাসক গোষ্ঠীর ভুলভ্রান্তি তুলে ধরতে পিছপা হয় না। জাতির অগ্রগতির কর্মসূচিকে সে আলোকবর্তিকা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভুল পথে অগ্রসর হলে তা থেকে সরে আসার আহ্বান জানায়, আবার সঠিক পথে এগুতে তাকে

উৎসাহিত করে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমসমূহ বারবার সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কদের গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। জাতি যাতে ফের সামরিক একনায়কত্বে ফিরে না যায় তার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে সংবাদমাধ্যম হচ্ছে জাতির এগিয়ে চলার মশালবাহক।

সংবাদক্ষেত্র বা প্রেসের এসব উদ্দেশ্য ছাড়াও তার আরেকটি কাজ হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি প্রচার। বিজ্ঞাপন হচ্ছে গণমাধ্যমের একটি তথ্যসূত্র। বিজ্ঞাপন কোন দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বাজারকে যে শুধু বাঁচিয়ে রাখে তাই নয়, তা অফুরন্ত তথ্যেরও উৎস। বিজ্ঞাপন থেকে আমরা পণ্যের নাম, পরিচয় বা তার উৎকর্ষ সম্পর্কে জানতে পারি। আমরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই জানতে পারি কোন প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও পরিচয়। পণ্যদ্রব্যের কথা ছাড়াও আমরা জানতে পারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও কর্মকাণ্ড।

জনমানসে বিজ্ঞাপনের প্রভাব অপরিসীম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীরা তাঁদের প্রার্থিতার সপক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে টেলিভিশনের সময় ক্রয় করে থাকেন। আসলে বর্তমান সমাজটাই পরিণত হয়েছে বিজ্ঞাপনী সমাজে। বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মারফতই যেমন কোটি কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হয় তেমনি তাতে তথ্যেরও সন্ধান মেলে। বিজ্ঞাপন হচ্ছে যোগাযোগের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার এবং সংবাদক্ষেত্র হচ্ছে তার শক্তিশালী বাহন।

সংবাদপত্রের দায়িত্ব

মার্কিন কথাসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন একবার বলেছিলেন, প্রতিদিন দুটো করে সূর্য ওঠে। একটি প্রভাতসূর্য এবং অপরটি এপি বা এসোসিয়েটেড প্রেস অন্য অর্থে সংবাদপত্র সূর্য। সূর্যের চিরন্তন আলোয় সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হয়। তেমনি সংবাদপত্র সূর্য বা সাংবাদিকতার কল্যাণে আমরা পুরো পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘটনাবলীকে জানতে পারি। মনের অন্ধকারকে দূর করতে পারি। মনের সেই অন্ধকার দূর করা কিংবা সবাইকে জানানোর ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সে দায়িত্ব প্রভাতসূর্যের মতোই চিরভাস্বর।

সংবাদপত্রের দায়িত্বজনিত কারণে স্বাধীনতার গ্যারান্টি থাকা দরকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই স্বাধীনতা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে অবশ্যই রক্ষা করে চলতে হয়। সমাজের প্রতি সংবাদপত্রের যে অসীম দায়িত্ব রয়েছে সেই চাহিদা পূরণার্থে সংবাদপত্রের নিজের প্রতি মর্যাদাশীল হতে হয়। সংবাদপত্র বা প্রেসের কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় তা নিচে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো ঃ

সংবাদপত্র হবে স্বাধীন: সংবাদপত্র বা প্রেসকে স্বাধীন বা স্বাবলম্বী হতে হলে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। অন্যের কোনপ্রকার সাহায্য ছাড়াই সংবাদপত্রকে লাভজনক বৃত্তিতে পরিণত করতে হয়। কারো লেজুড় হয়ে থাকলে পাঠকশ্রেণীর স্বার্থ নিয়ে সে কথা বলতে পারে না। জনগণও তার প্রতি সমর্থন জানাবে না। সংবাদপত্রের রয়েছে জনগণ থেকে প্রাপ্ত চরম সুবিধা, রয়েছে তার পুরো স্বাধীনতা আর এ কারণেই সে সমকালীন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত গড়তে পারবে না। সাংবাদিকতা কখনো তার চিরস্থায়ী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সরকারের সুবিধাবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে না। সংবাদপত্রের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে কোন সময়ের ঘটনার সঠিক ও নিরন্তর খবর সংগ্রহ এবং তা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করা, যাতে করে তা জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়। সংবাদপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকে। সংবাদপত্রে যা স্থান পায় তা সমকালের ইতিহাস ও জ্ঞান ভাণ্ডারের অঙ্গ হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রের দায়িত্ব হচ্ছে কথা বলা। অপরদিকে রাষ্ট্র নায়করা অনেক ক্ষেত্রেই নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন। একটি দেশের সরকার আরেকটি দেশের সরকারকে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও বৈদেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে থাকে। বিভিন্ন শর্তাশর্তের কারণে তারা বিভিন্নভাবে কোন জালে আবদ্ধ, রাষ্ট্রনায়করাও তাই অনেক সময় নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু সংবাদপত্র কোন জালে আবদ্ধ নয়। কথা তারা বলবেই।

সাংবাদিকের দায়িত্ব একজন ঐতিহাসিকের মতো। তার মহান কর্তব্য হচ্ছে সত্য উদ্‌ঘাটন করা এবং পাঠকের কাছে তা সরবরাহ করা। তিনি তা তুলে ধরবেন নিখুঁতভাবে। রাষ্ট্রের দেয়া ফরমুলা অনুযায়ী নয়, নিজের মতো করে তিনি তা তুলে ধরবেন জনস্বার্থের কথা মনে রেখে।

সংবাদপত্র হবে নিরপেক্ষ: অধিকাংশ মানুষেরই বিশ্বাস, নিরপেক্ষতা এমন একটা গুণ যা অর্জন করতে হয়। নিরপেক্ষতা হচ্ছে সাংবাদিকতার আদর্শ। ভালো লেখক কিংবা ভালো সংবাদপত্রগুলো নির্বিচার ও ইচ্ছাকৃত পক্ষপাত এড়িয়ে চলে। সংবাদপত্রে যাতে অন্যেরও কথা বলার সুযোগ পায় এটা হচ্ছে একটি বহুল প্রচলিত রীতি। ভুল, পক্ষপাতমূলক ও অতিরঞ্জিত খবরকে এড়িয়েই কেবল সাংবাদিকতার আদর্শ অর্জিত হয়।

গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের যেভাবে কথা বলার অধিকার দেয়া হয়, সংবাদপত্রেও সেভাবে যেকারোর কথা বলার অধিকার দিতে হয়। কোন কিছু সম্পর্কে বা কারো সম্পর্কে সংবাদপত্রে কিছু প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট সেইসব জনকেও তাঁদের মতামত পেশের অধিকার দিতে হবে। গণতন্ত্রের মহিমাই এখানে ঘোষিত হয়। সাংবাদিকতা হচ্ছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, তাই এটি হচ্ছে নিরপেক্ষ মতপ্রকাশের এক আশ্চর্য মাধ্যম।

সংবাদপত্র হবে যথার্থ : এর অর্থ হলো সংবাদপত্র তথ্য পরিবেশনায় যথার্থ হবে অর্থাৎ নিখুঁত বা সঠিক সংবাদ পরিবেশন করবে। পক্ষপাতহীন এই যথার্থতা অর্জনের প্রয়াস হচ্ছে সাংবাদিকতার চরিত্রের মাপকাঠি। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা প্রকাশ বা সম্প্রচার হচ্ছে সুসাংবাদিকতার লব্ধ আদর্শকে আরো উজ্জ্বল করা। কোন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক তাঁর ডেডলাইনকে মনে রেখেই কোন সংবাদ নিবন্ধকে প্রকাশযোগ্য করেন। তিনি এটি ছাপেন তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরতাকে ভর করেই। কোন রিপোর্টার তাঁর সূত্র বা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে কোন ঘটনার যেসব বিবরণী ছাপেন তা সবসময়ই চূড়ান্তভাবে সত্য হবে এমন নয়। কারণ রিপোর্টারের সেই সূত্র বা প্রত্যক্ষদর্শীও রক্ত মাংসের মানুষ। তাঁদেরও ভুল হতে পারে। কিন্তু সেই সংবাদ ঘটনাটির চূড়ান্ত সত্যের জন্যে যদি বার্তা সম্পাদক প্রতিনিয়তই অপেক্ষা করতে থাকেন তাহলে অতীতের শত শত বছরের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই মানুষের অজানা থেকে যেতো। কারণ পরম সত্য বলে কোন কথা নেই। তা না হলে ঐতিহাসিকদের বলার শক্তি থাকতো না, কোন্‌টা নিখুঁত সত্যি। বিদ্বজ্জনেরাও তাঁদের অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতেন না কোন দিন।

সংবাদপত্র হবে সৎ: দৈনন্দিন সংগ্রাম ছাড়া সংবাদপত্র তার সৎ চরিত্র অর্জন ও তা টিকিয়ে রাখতে পারে না। জনসাধারণ হলো সংবাদপত্রের বেঁচে থাকার আশ্রয়। সেই জনসাধারণের সাথে সতত পরিবর্তনশীল সংস্পর্শ বা যোগাযোগ ছাড়া সাংবাদিকতার কোন কাজই এগুতে পারে না। এই পরিবর্তিত সমস্যাগুলোই সাংবাদিকতার মূল উপাদান হিসেবে আসছে। এই পরিবর্তিত সমস্যাসমূহের সূত্র খুঁজতে গিয়ে সাংবাদিক কখনই মিথ্যাচার করে না। সত্যান্বেষণই তাঁর একমাত্র কাজ। আজকের দিনে যখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নামে ঢালাও নির্বিচার মন্তব্য প্রকাশের জোয়ার বইছে তখন সৎ সাংবাদিকতার প্রশ্নটিও জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে, দাবি উঠেছে। সতত সৎ না থাকলে সংবাদপত্র তার আশ্রয়ের ভিত্তি জনগণকে হারিয়ে ফেলতে পারে।

সংবাদপত্র হবে দায়িত্বশীল: সমাজই সংবাদপত্রগুলোকে সমর্থন যুগিয়ে থাকে। সেজন্য সমাজের প্রতি সংবাদপত্রের দায়িত্ব রয়েছে। সে দায়িত্ব সমাজের লোকজনের প্রতি সে দায়িত্ব কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মচারী বাহিনীর প্রতিও। জনসাধারণের স্বার্থেই ও একটি মহান লক্ষ্যেই সংবাদমাধ্যমগুলো কাজ করে থাকে। সংবাদপত্র শুধুমাত্র টাকা অর্জনের হাতিয়ার নয়। জনকল্যাণও তার লক্ষ্য। সেই কল্যাণ যেমন সাধারণ জনতার, তেমনি সংস্থার অভ্যন্তরীণ জনগণের। সংবাদপত্র তার সামাজিক দায়িত্বের কারণেই নিজ প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য আর্থিক সমর্থন তৈরি করে নেয়। বিদেশে যেকোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান তার নিজ কর্মচারী বা সাংবাদিকদের পেশাগত জীবিকাকে সর্বদা সজীব রাখার চেষ্টা করে। আর্থিক সুবিধা

দেয়, সামাজিক মর্যাদা দেয়। যে দায়িত্ব নিয়ে তারা কাজ করে, আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলো তেমনটা করে না। সাংবাদিক, কর্মচারীদের রুটি রুজির দাবিতে ইউনিয়ন কর্মীদের রাস্তায় আন্দোলনে নামতে হয়। একটা কথা স্মরণযোগ্য, কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠান নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দায়িত্ব নিতে না পারলে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনেও সে ব্যর্থ হয়।

সংবাদপত্র হবে পরিচ্ছন্ন ঃ ভাষা ও ছবির রুচিশীলতাই শুধু সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য নয়, খবরাখবর সংগ্রহের ক্ষেত্রেও রুচিশীলতা বজায় রাখা উচিত। মানব জীবনে প্রায়শই এমন অনেক ঘটনা ঘটে যে সমস্ত ব্যাপারে পত্রপত্রিকা তথা গণমাধ্যমসমূহ মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় দেবে এটাই স্বাভাবিক। যে সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব সাংবাদিকতার ওপর বর্তেছে বা সেই দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণেই সংবাদপত্র কখনও অমার্জিত, অশালীন কথাবার্তা বা ছবি প্রকাশ করবে না কিংবা এমন কাজে প্ররোচিত করবে না যাতে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সাংবাদিকতার সামগ্রিক পরিধিটাই একটি মার্জিত রুচিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পত্রপত্রিকা তার পরিচ্ছন্ন রুচির বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেললে নিশ্চিতরূপেই সে পাঠকপ্রিয়তা হারাবে। সুরুচি বহির্ভূত কার্যকলাপ চালালে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। পরিচ্ছন্ন সংবাদপত্র কখনোই তার পাঠকপ্রিয়তা হারায় না।

সংবাদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ

সংবাদের সংজ্ঞা

যদি প্রশ্ন করা হয় সংবাদ কী ? তাহলে সোজা কথায় এর উত্তর, 'এ হচ্ছে কিছু (সত্য) ঘটনাবলীর এমন একটি বিবরণী যা জনগণের স্বার্থেই প্রকাশযোগ্য'। এ সজ্ঞাটিতে সংবাদের চরিত্র পুরো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কারণ যে কোন প্রতিষ্ঠানেই কোনো ঘটনাবলীর বিবরণী প্রকাশিত হতে পারে যা সংবাদ বলে বিবেচ্য নাও হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, 'এ হচ্ছে এমন কিছু সংবাদ উপযোগী (সত্য) ঘটনাবলীর একটি বিবরণী যা জনগণের কাছে প্রকাশযোগ্য'। এটিকে সামান্য ঘুরিয়ে বলা যায়, যে ঘটনা, ভাব বা বিষয় সংবাদের মাপকাঠিতে প্রণিধানযোগ্য তাই সংবাদ। সংবাদ সম্পর্কে অবশ্য মানুষের গড়পড়তা উত্তর হচ্ছে, সংবাদ হচ্ছে তাই যা সংবাদপত্রগুলো ছেপে থাকে অথবা সংবাদ হচ্ছে তাই যা আমরা বেতারে শুনে থাকি।

প্রকৃতপক্ষে সংবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। কারণ 'সংবাদ' নামক পদটির ব্যাপ্তি বিশাল। দু'চারটি কথায় কিংবা দু'চারটি চরিত্র লক্ষণ দিয়ে তাকে চেনার উপায় নেই। সে প্রেক্ষাপটে আমরা এখানে বেশ কিছু সংজ্ঞা তুলে ধরবো যা সংবাদের চরিত্র নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করবে।

চার্লস এ. ডানা বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে যেকোন কিছু যা সমাজ গোষ্ঠীর বিরাট অংশকে আগ্রহী করে তোলে এবং যা কোন দিন তাঁদের দৃষ্টিগোচরে আনা হয়নি।

স্ট্যানলি ওয়াকার বলেছেন, একজন নগর সম্পাদক যখন সংবাদকে সংক্ষিপ্তাকারে সংজ্ঞায়িত করেন তখন তা তিনটি শব্দ 'যৌনতা, অর্থ ও অপরাধ'-এর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে।

নিউজ এজেন্সি জার্নালিজম-এ জন কার্ডুনি বলেছেন, সংবাদ উৎসারিত হয় সুর, সুরা ও সুরাইয়া (সঙ্গীত, মদ ও নারী) থেকে।

নিল ম্যাকনিলের মতে, সংবাদ হচ্ছে সংবাদপত্র পাঠকের জন্য চলমান কিছু আগ্রহোদ্দীপক ও গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা বা বাস্তব অবস্থার বিবরণীর সমষ্টি যা সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করে থাকে।

'দ্য কমপ্লিট রিপোর্টার'-এ জুলিয়ান হ্যারিস ও স্ট্যানলি জনসন বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে সকল চলতি ঘটনাবলীর সংমিশ্রণ যার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ রয়েছে এবং সেরা সংবাদ হচ্ছে তাই যা অধিকাংশ পাঠককে আগ্রহী করে তোলে।

'মর্ডান নিউজ রিপোর্টিং'-এ কার্ল ওয়ারেন বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে মানবজাতিকে আগ্রহী করে তোলে এমন কোন কিছুর সময়োচিত রিপোর্ট এবং সেরা সংবাদ হচ্ছে যা অধিকাংশ পাঠককে আগ্রহী করে তোলে।

'নিউজ রাইটিং : ফ্রম লিড টু ৩০' গ্রন্থে উইলিয়াম মেটজ্ বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে একটি ঘটনা, বিষয় বা মতামতের বিবরণী যা জনগণকে পড়তে আগ্রহী করে তোলে।

জন কার্ডুনী আরেক জায়গায় বলেছেন, গতকালের পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর পার্থক্যটাই হচ্ছে সংবাদ।

'এডিটিং দ্য ডে'জ নিউজ'-এ ব্যাস্টিয়ান, কেস ও বাস্কেট বলেছেন, একদিনে বা এক সপ্তাহে সংঘটিত বিশ্ব কার্যক্রমের একটি বৃহৎ সাজানো ডালিই সংবাদ নয় বরং সংবাদ হচ্ছে সুষম ও সম্পাদনাকৃত ঘটনাবলীর সমষ্টি।

ইউনাইটেড প্রেস এসোসিয়েশনের মতে, মানুষের জীবনের কোন কিছু বা সবকিছু এবং তাঁদের অভিব্যক্তির উপাদানই হচ্ছে সংবাদ।

একজন অজ্ঞাত সাংবাদিকের মতে, সংবাদ হচ্ছে কোন ধারণা, ঘটনা বা বিষয়ের পক্ষপাতশূন্য, সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োচিত বিবরণী যা পাঠককে আকৃষ্ট করে এবং তা প্রকাশ করে সংবাদপত্র আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষক বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে কোন ধ্যান-ধারণা বা ঘটনার পক্ষপাতশূন্য, সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োচিত বিবরণী যা স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করে অথবা তার সম্ভাবনাটা স্থিতাবস্থার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী।

ওপরের সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা সংবাদের চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারলাম। তবে সংবাদ রিপোর্টের সঙ্গে সংবাদকে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ, দুটো পরস্পর সংশ্লিষ্ট হলেও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সংবাদ নিজে কোন ঘটনা নয়। সংবাদ কোন স্বেচ্ছাচারের মৃত্যু অথবা প্রেসিডেন্টের নির্বাচন নয় বরং কোন মৃত্যু বা নির্বাচন হচ্ছে সাংবাদিকের রেকর্ড। যখন কোন সাংবাদিক বিশেষত রিপোর্টার সংবাদ ঘটনাকে 'ঘটনা'র বদলে 'রিপোর্ট' হিসেবে উপস্থাপিত করেন তখন তিনি সত্যিকার অর্থে বলতে চান যে একটি ঘটনার কথা যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞাপন করা না হচ্ছে, প্রকাশ করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ঘটনাটি সংবাদ নয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি দৃষ্টান্ত টানা যেতে পারে। ধরা যাক কোথাও একটা খুন হয়ে গেলো। কিন্তু কেউই সেই ঘটনার কথাটা জানতে পারলো না অথবা নিহতের লাশটির হদিস জানা গেলো না, উদ্ধারও হলো না, তাহলে সেটি কি সংবাদ ? এর থেকে

সংঘটিত কোন ঘটনা বা সে সম্পর্কে জ্ঞাপনের পার্থক্যটুকু ধরা পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না খুনের ঘটনাটি পাঠক শ্রোতার কাছে পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ঘটনাটি একটি অরিপোর্টকৃত ঘটনা। ফলে কোন খুনের অপ্রকাশ্য অবস্থাটা সংবাদ নয়। তবে একথা সত্য ঘটনাটি প্রকাশযোগ্য বা সংবাদযোগ্য।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদের তিনটি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। এক. কোন ঘটনা বা যেকোন ধরনের কার্যকলাপ (এখানে উল্লেখ্য, কোন ঘটনা ঘটার কথা ছিল, কিন্তু ঘটেনি সেটাও এক অর্থে ঘটনা, নতুন করে সৃষ্ট পরিস্থিতি), দুই. রিপোর্ট অর্থাৎ যার মধ্য দিয়ে কোন ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে অথবা লিপিবদ্ধ বা রেকর্ড করা হয়েছে এবং তিন. পাঠক বা শ্রোতাদর্শক অর্থাৎ ঘটনার সংবাদ বিবরণী যাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। ঘটনার বিবরণীটি সংবাদ মাধ্যম বা গণমাধ্যমের যে কোন মাধ্যমেই জ্ঞাপিত হতে পারে।

সংবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'News' কম্পাসের পয়েন্ট North, East, West ও South-এর আদ্যাক্ষরগুলো নিয়ে গঠিত হয়। বরং NEWS হচ্ছে New (বা নতুন) শব্দটির বহুবাচনিক রূপ। অর্থাৎ News মানেই New Something। নতুন কোন কিছু। তবে News কথাটির মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপ্তি রয়েছে। কারণ সংবাদের জন্য উপযোগী ঘটনার বিস্তৃতি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম দিগন্তব্যাপী। সাংবাদিকতার জ্ঞানী-গুণী মহাজনদের মতে, সংবাদ হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান এবং তা সাধারণ জনগণের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সেই বিশেষ জ্ঞানের সংযোজন মাত্র।

যে ঘটনার সংবাদমূল্য রয়েছে তা নিশ্চিতরূপেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার দাবি রাখে। কোন ঘটনার এই সংবাদমূল্যের পেছনে নিশ্চিতরূপেই মানব স্বার্থ (Human interest) ও আকর্ষণ (Interest) উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর দৈনন্দিন ভাষণ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দু'দল ছাত্রের মধ্যে গোলাগুলির খবর অধিকাংশ পাঠককে বেশি আগ্রহান্বিত করে।

সংবাদের বৈশিষ্ট্য

একজন সাংবাদিক বিশেষত একজন রিপোর্টার যখন তাঁর পত্রিকার জন্য কোন সংবাদ ঘটনার বিবরণী তৈরি করেন তখন তাঁর মাথায় কতগুলো দিক অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কারণ সংবাদের বৈশিষ্ট্যই যদি তাঁর জানা না থাকে তাহলে তিনি যে রিপোর্ট লিখবেন তা সংবাদের বৈশিষ্ট্যকে নাও তুলে ধরতে পারে। অথবা সংবাদের বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত না করতে পারার কারণে তিনি যে ঘটনাটির বিবরণী বার্তা সম্পাদকের সামনে পেশ করলেন তার হয়তো কোন সংবাদমূল্যই নেই। এরই পরিপ্রক্ষিতে আমরা সংবাদের বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি।

এক. সংবাদ হবে সত্যনিষ্ঠ বা সত্যনির্ভর। সাংবাদিকতার একটি উদ্দেশ্যই হচ্ছে সত্য প্রকাশ করা। সংবাদ কখনোই মিথ্যার বেসাতি করে না। তথ্য হলো সংবাদের কাঁচামাল। অতএব তথ্যের ওপর নির্ভর করেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। যে তথ্য মনগড়া নয়, সে তথ্য সত্যনিষ্ঠ। সংবাদ তথ্যনির্ভর, কল্পনাপ্রসূত নয় **(News is based on facts; Fiction is not news)।**

দুই. সংবাদ হবে যথার্থ। সংবাদ হবে নির্ভুল। সংবাদে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। গুজব কখনো সংবাদ নয়। তবে কোন গুজব ছড়ানোর ঘটনাটা সংবাদ। যা কিছু সত্য তা নির্ভুল ও যথাযথভাবে লিখতে হবে। কোন গুজবের ঘটনা ঘটলে তারও সঠিক বিবরণী দিতে হবে। কোন গুজব যে নিছকই গুজব এই কথাটি যথার্থভাবে জানাতে হবে।

তিন. সংবাদ হবে সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত। একটা প্রবলন চালু আছে 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। অথচ সহজ করে বলাটাই হচ্ছে সংবাদের বৈশিষ্ট্য। সংবাদের পাঠক নয় বছরের শিশু থেকে নব্বই বছরের বৃদ্ধ। সংবাদ পাঠকদের শিক্ষার মানদণ্ডও সমান নয়। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠককে সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে। অতএব সোজা করে ও সরল ভাষায় না বললে পাঠকের কাছে সংবাদ পরিবেশনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। সংবাদ বিবরণী ইনিয়ে বিনিয়ে বলার অবকাশ নেই। এখানে সাহিত্যিক মূল্যও থাকে না। তবে অবশ্যই রসোপযোগী হওয়া উচিত। সংবাদপত্রে হাজারো পাতা নেই। তবে সংবাদ আসে হাজারো। প্রথম পাতায় দৈনিক গড়পড়তা ১৪/১৫টি বাছাই করা সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। রেডিও-টিভিতে আরো কম, নির্বিচার সংবাদ প্রচার করলে সময় ও পাতার অপব্যবহারের প্রশ্ন আছে। তাই সংবাদ হবে বাছাই করা সেরা সংবাদ, সংক্ষিপ্ত অথচ খুবই পরিশীলিত। সংবাদ বিবরণী লম্বা হবে না, অথচ তাতে তথ্যের ঠাসবুননি থাকবে।

চার. সংবাদ হবে সুষম। সংবাদ ঘটনার যেসব তথ্যাবলী যতটুকু জায়গা বা গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে সেটি সাংবাদিক তাঁর সংবাদবিবরণীতে তুলে ধরতে পারলেই একটি সংবাদবিবরণী পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। তবে সংবাদ ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য বা উপাদানগুলোর কোনটাকে জোর করে বেশি গুরুত্বদান অথবা গুরুত্ব না দেয়া তার কোনটাই চলবে না। কোন সংবাদ ঘটনায় যদি পক্ষ-বিপক্ষ থাকে তাহলে তাদের উভয়ের বক্তব্যই তুলে ধরতে হবে। তাদের বক্তব্য শুনেই পাঠক বা শ্রোতা ঘটনাটি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা নিজেরাই গড়ে নিতে পারবে। সংবাদ হবে পক্ষপাতহীন। সাংবাদিকের কারো পক্ষ নেয়ার নৈতিক অধিকার নেই।

পাঁচ. সংবাদ হবে বস্তুনিষ্ঠ। যেভাবে ঘটনা ঘটেছে হুবহু সেভাবে ঘটনা বা পরিস্থিতির বর্ণনাই হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠতা। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার দাবি সারা বিশ্বেই সোচ্চার। যদিও

আধুনিককালে 'নব্য সাংবাদিকতা'র ধারায় 'মন্ময়' (Subjective) সাংবাদিকতাও চলছে। মন্তব্যাশ্রয়ী সেই সাংবাদিকতায়ও অবশ্য বস্তুনিষ্ঠতার একটি মূল দিক হলো কোন তথ্যের বিকৃতি নয়। সত্য ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে নিজের মনগড়া কথাবার্তায় সাজিয়ে কোন সংবাদ বিবরণী লিখলে তা হবে সম্পূর্ণ অসৎ সাংবাদিকতা। মন্তব্যাশ্রয়ী হলেও ঘটনার প্রকৃত রূপ বা মূল সুরটিকে বিকৃত করা চলবে না কিছুতেই। সাংবাদিক কোন সংবাদ ঘটনাকে রঙিন চশমা পরে নয়, খালি চোখে দেখার চেষ্টা করবেন। সংবাদ কখনই কল্পনার রঙে রঞ্জিত হবে না। কোন সংবাদেই মিথ্যার ছদ্মাবরণ পরানো যাবে না। সংবাদে কারো সাফাই গাওয়া চলবে না। নিজস্ব ভাবে বলাটা মন্ময়তা (Subjective) আর সব মিলিয়ে বলাটা বস্তুনিষ্টতা (Objective)।

ছয়. সংবাদ হবে সময়োচিত। সংবাদ হচ্ছে একটি পচনশীল দ্রব্য। মাছের মতো। একবার বাসি হয়ে গেলে তা আর বাজারে বিকোয় না। কোন সংবাদ ঘটনা (বিশেষত যেগুলো 'হার্ড নিউজ') মানুষের আগ্রহ সজীব থাকার মধ্যেই প্রকাশিত না হলে তার কোন মূল্য থাকে না। কিছু কিছু ঘটনা আছে যা মানুষ তাৎক্ষণিকভাবেই জানতে চায়। কিন্তু সাংবাদিক তা জানাতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের ওপর থেকে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যায়। সংবাদের সংজ্ঞাতেই আমরা বলেছি, সংবাদ হচ্ছে কোন ঘটনা, বিষয় বা পরিস্থিতির সময়োচিত বিবরণী। সংবাদ মানেই নতুন কোন কিছু। অতএব তরতাজা থাকতেই তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তবে এমন কিছু সংবাদ আছে যা দীর্ঘদিন পরেও প্রকাশ করা যায়, যদি তাতে সংবাদের কোন উপাদান দীপ্যমান (Prominence) থাকে।

সাত. সংবাদ হবে আপেক্ষিক। এ হলো কোন ঘটনার সঙ্গে ঘটনা, বিষয়ের সঙ্গে বিষয় বা কোন সূত্রের সঙ্গে সূত্রের সম্পর্কের ব্যাপার। কোন পাঠকের জীবনযাত্রার সঙ্গে যে সংবাদ জড়িত সেই সংবাদই তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলিতে কোন ছাত্র মারা গেলে তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরাই বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে অথবা তাঁদের বাবা-মা, অন্যেরা নয়। যিনি প্রত্যহ সকালে অনেকটা দূরে কর্মস্থলে যান, তাঁর কাছে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবরের চেয়ে আবহাওয়ার খবর কিংবা পরিবহনের খবরই বেশি করে আকৃষ্ট করবে। যে বিষয়সমূহ পাঠকের বা শ্রোতার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বা যে বিষয়গুলো তাকে প্রভাবিত করে সে বিষয় সংক্রান্ত সংবাদই তাঁকে বেশি করে আকৃষ্ট করে। যেমন তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর সম্পদ, নিরাপত্তা, সাফল্য, বীরত্ব, রহস্য, আনন্দ, রোমাঞ্চ, বিজ্ঞান বা কোন আবিষ্কার অথবা দুর্ঘটনা। একই দিনে বাংলাদেশে ও গুয়াতেমালায় একই ধরনের দুটো দুর্ঘটনা ঘটলে বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্ঘটনার খবরটিই বেশি করে আকৃষ্ট করবে।

আট. সংবাদ হবে রুচিশীল। যে কোন সংবাদবিবরণীই হবে রুচিশীল ও শোভন। সেটা ভাষার ক্ষেত্রে কিংবা ছবির ক্ষেত্রেই হোক। কোন ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে তা খোলামেলাভাবে বর্ণনা করা সংবাদপত্রের নীতিবিরুদ্ধ। একইভাবে সেই ধর্ষণ ঘটনার হোতা ও শিকারের ছবি ছাপাও সঙ্গত নয়। আগেই বলেছি সংবাদ পাঠকের বয়স নয় থেকে নব্বই। সংবাদের লেখা তাই সবার জন্য উপযোগী হতে হবে। সংবাদ বিবরণী এমন হবে না যে তাকে পিনসেঁটে বলতে হয় 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'। খুনোখুনি বা হত্যাকাণ্ডের ভয়াল ছবি কিংবা নির্মমভাবে নিহত হবার ছবি ছাপানো উচিত নয়। সংবাদ বিবরণীতে অশোভন কথাবার্তা বা গালিগালাজ কখনোই কাম্য নয়। সংবাদ সব সময়ই হবে সুরুচিসম্পন্ন। সংবাদে কদর্যতা কখনোই কাম্য নয়।

সংবাদের শ্রেণী বিভাগ

সংবাদের দুটো শ্রেণী রয়েছে। এর একটি ভৌগোলিক এবং আরেকটি প্রকৃতিগত। অঞ্চলভেদে যে সকল সংবাদ আসে সেগুলোকে আমরা 'ভৌগোলিক সংবাদ' শ্রেণীতে ফেলতে পারি। আর যেসব সংবাদ সংঘটিত কোন ঘটনা, বিষয়, ভাব বা পরিস্থিতির চরিত্র লক্ষণে যেভাবে প্রকাশিত হবার দাবি রাখে সেগুলোই প্রকৃতিগত সংবাদ। তবে এই দুটো ভাগ ছাড়াও আমরা সংবাদের উপস্থাপন বা পরিবেশনগত শ্রেণী বিভাগ নিয়েও আলোচনা করবো।

আমরা প্রথমেই সংবাদের ভৌগোলিক শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করবো। সংবাদের ভৌগোলিক শ্রেণী বিভাগ পাঁচ প্রকার।

এক. শহর বা স্থানীয় সংবাদ। যে স্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমটির সংবাদ প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত হচ্ছে সেটাই স্থানীয় সংবাদ। যেমন, ঢাকা শহর থেকে অধিকাংশ পত্রপত্রিকার প্রকাশিত সংবাদসমূহকে আমরা শহর বা স্থানীয় সংবাদ বলবো। স্থানীয় সংবাদ সাধারণত সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদনকরাই সংগ্রহ করে থাকে।

দুই. জেলা বা মফস্বল সংবাদ। রাজধানীর বাইরের বিভিন্ন জেলা, থানা কিংবা তারও ক্ষুদ্র পর্যায় থেকে যেসব সংবাদ আসে সেগুলো জেলা বা মফস্বল সংবাদ। মফস্বল সংবাদদাতারা সাধারণত এইসব সংবাদ প্রেরণ করে থাকে। বিদেশে অবশ্য মফস্বল সংবাদদাতা কিংবা মফস্বল সংবাদ বলে কিছু নেই। সেখানে এটাকে বলা হয় কান্ট্রি করেসপন্ডেন্ট বা কান্ট্রি নিউজ। মফস্বল সংবাদদাতারা এগুলো হাতে লিখেও পাঠান, আবার টেলিফোনেও পাঠান। অনেক সময় টেলিগ্রামেও পাঠান। আজকাল অবশ্য বেশিরভাগ সংবাদই ফ্যাক্সে পাঠাচ্ছেন।

তিন. আঞ্চলিক সংবাদ। একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে যেসব সংবাদ আসে সেগুলোই আঞ্চলিক সংবাদ। অবশ্য একটি অঞ্চলের মধ্যে একাধিক জেলা, থানা থাকতে পারে। যেমন উত্তরাঞ্চল। এর মধ্যে অনেকগুলো জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক প্রতিনিধিরাই সাধারণত আঞ্চলিক সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। হাতে লিখে, টেলিফোনে বা টেলিগ্রাম বা ফ্যাক্স মারফত এই সকল খবর সংবাদ অফিসে পৌঁছে থাকে।

চার. জাতীয় সংবাদ। যে সংবাদ গোটা জাতিকে বিজড়িত করে বা অধিকাংশ লোককে সম্পৃক্ত করে তোলে তাকেই জাতীয় সংবাদ বলে। জাতীয় খবরের উৎপত্তিস্থল সমগ্র দেশের যে কোন স্থানে হতে পারে। টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে যমুনা সেতুর যেদিন শুভ উদ্বোধন হয়েছিল সেদিন সেটি একটি জাতীয় খবরে পরিণত হয়েছিল, এলাকাটি একটি মফস্বল অঞ্চল হলেও। জাতীয় সংবাদ সমগ্র জাতিকে নাড়া দেয়। এ ধরনের সংবাদে সমগ্র জাতি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। জাতীয় সংবাদ কভার করে থাকেন সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদক বা রিপোর্টার অথবা বিশেষ সংবাদদাতারা। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা সাধারণত এ ধরনের খবর বেশি করে দিয়ে থাকে। মফস্বল অঞ্চল হলে সেগুলো মফস্বল সাংবাদিক, আঞ্চলিক প্রতিনিধি বা ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধিও তা সরবরাহ করে থাকে। মফস্বল অঞ্চলে সৃষ্ট জাতীয় সংবাদ সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরা ফ্যাক্স অথবা টেলিফোনের মাধ্যমেই জানিয়ে থাকেন।

পাঁচ. বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংবাদ। একটি দেশের খবর যখন তার চরিত্রগুণে বিদেশের পাঠককুলকে আগ্রহান্বিত করে তোলে তখন সেটা আন্তর্জাতিক খবর বলে স্বীকৃত। একটি আন্তর্জাতিক খবর দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, বিভিন্ন দেশকে জড়িত করে। যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পৃথিবীর ওপর প্রভাব ফেলে সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল সারা বিশ্বের দেশগুলোকে সচকিত করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক খবর সাধারণত সরবরাহ করে থাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংবাদ সংস্থাগুলো। টিভি-রেডিও কিংবা ইন্টারনেট তথা ওয়েব পেজ মনিটরিংয়ের মাধ্যমেও এ ধরনের সংবাদ পাওয়া যায়। এছাড়া টেলিফোনেও পাওয়া যেতে পারে। পত্রপত্রিকা মারফতও আসতে পারে।

এবার আমরা সংবাদের প্রকৃতিগত বা চারিত্রিক শ্রেণী বিভাগটা দেখবো। সংবাদের প্রকৃতিগত শ্রেণী বিভাগ কত প্রকার তা সুনির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। তবে আমরা তার কতকগুলোকে এক এক করে আলোচনা করবো।

এক. চরম বা পরম সংবাদ (Absolute news)। চরম ও পরম সংবাদ হচ্ছে এমন একটি সংবাদ যার মূল্য গজকাঠি দ্বারা মাপা যায় না বা তার প্রয়োজনও পড়ে না। চরম সংবাদের চরিত্র লক্ষণের কারণেই তাকে প্রকাশের ব্যাপারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া

হয়। যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসাত্মক ঘটনা, ভয়াবহ বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস, মহামারী, বাজেট পেশ প্রভৃতির ন্যায় মহাঘটনাগুলোকে চেপে রাখা যায় না। কিংবা কোন রাষ্ট্রনায়কের হত্যাকাণ্ড, যেমন ইন্দিরা গান্ধী বা প্রেমাদাসার হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনার সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনে টেলিগ্রাম আকারে প্রকাশিত হবার দাবি রাখে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে এক অপ্রত্যাশিত, সরল ও এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দুই. তরজাতা বা গুরু সংবাদ (Hard news)। তরতাজা বা গুরু সংবাদ হচ্ছে এমন সংবাদ যা জলদি বিতরণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে কিংবা তা প্রকাশের জন্য দেরি করতে পারে না। কোন সাংবাদিকই একে হিমাগারে রেখে দিতে পারে না। প্রকাশনার স্বার্থে একেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে এ চরম বা পরম সংবাদেরই সমর্থক। তবে দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু এই যে, চরম সংবাদ ঘটনার ব্যাপক মাত্রা নিয়ে সংঘটিত হয়, তার প্রভাবও থাকে সুদূরপ্রসারী ও দিগন্ত বিস্তৃত। এ ধরনের সংবাদ প্রায় অধিকাংশ পাঠককে আগ্রহান্বিত করে তোলে। হার্ড নিউজকে হট নিউজও (Hot news) বলা যায়। চরম সংবাদের জন্য উপযোগী ঘটনা যেমন দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষে মৃত্যু, রাষ্ট্রীয় নীতির ওপর প্রেসিডেন্টের বক্তব্য প্রভৃতি তরতাজা সংবাদের বিষয়বস্তু।

তিন. কোমল সংবাদ বা লঘু সংবাদ (Soft news)। এ হচ্ছে এমন সংবাদ যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশের দাবি রাখে না। দু-চারদিনের জন্য ধরে রাখলেও তার সংবাদমূল্য ও উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায় না। যেমন—সামাজিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ, বিয়ে, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা বা উচ্চতর ডিগ্রিলাভ প্রভৃতি।

চার. স্থানিক সংবাদ বা স্পট নিউজ (Spot news)। স্পট নিউজ বা স্থানিক সংবাদও একঅর্থে চরম ও গুরু সংবাদেরই ভিন্ন নাম। কোন অপ্রত্যাশিত, তাজা সাম্প্রতিক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনার খবরই হচ্ছে স্পট নিউজ। এই ধরনের সংবাদ পত্রিকা ছাপা শুরু হবার মাত্র কয়েক মিনিট আগেও এসে পৌঁছাতে পারে এবং সেই খবরটি যদি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বা অসাধারণ গুরুত্ববহ হয় তাহলে সেটির জন্য খবরের কাগজের প্রথম পাতার চেহারা ঝটপট বদলে যেতে পারে। যেমন— রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের খবর এসেছিল একেবারে মধ্যরাতে। একে সরেজমিন সংবাদও বলা হয়। যেহেতু ঘটনাস্থল থেকে সরেজমিনে এ খবরের বিবরণী দেয়া হয়।

আমরা এতক্ষণ সংবাদের ভৌগোলিক ও প্রকৃতিগত শ্রেণী বিভাগ বুঝতে পারলাম। আমরা এবার সংবাদের উপস্থাপন বা পরিবেশনগত শ্রেণী বিভাগটি দেখবো। এ বিভাগের অন্তর্গত সংবাদগুলো চরিত্র দিয়ে বিচার নয় বরং তার উপস্থাপন বা বর্ণনার

মধ্য দিয়ে চেনা যায়। অবশ্য ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী সংবাদের বিবরণী তৈরির বিষয়টি বা ধরনটি অনেকখানি জড়িত থাকে। আমরা এগুলোকে এক-এক করে দেখবো।

এক. সাদামাটা বা সরল সংবাদ (Stright jacket news)। সংবাদ ঘটনাবলীর সরলসোজা বা সাদামাটা বর্ণনাকে স্ট্রেট জ্যাকেট বা স্ট্রেট নিউজ বলে। প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু সংবাদ থাকে যা সাদামাটা বা সরলভাবে প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের সংবাদবিবরণীতে কোন জল্পনা থাকে না, কোন মন্তব্য থাকে না। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ সরল ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ ঘটনাবলী। ঘটনার সত্যনিষ্ঠ বিবরণীই এ ধরনের সংবাদে থাকে। কোন ঘটনা, বিষয়, ভাব বা পরিস্থিতিকে বিশ্বস্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বলার জন্য প্রতিনিধিত্ব করে এই সংবাদ। গুরু সংবাদের উপস্থাপন সাধারণত এই স্ট্রেট জ্যাকেট পদ্ধতিতেই হয়।

তিন. বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ (Objective News)। কোন ঘটনা, ভাব, বিষয় বা পরিস্থিতির সহজ সরল ও হুবহু বর্ণনাই হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ। আসলে এ হলো 'স্ট্রেট জ্যাকেট নিউজ'- এরই প্রতিরূপ। এ ধরনের সংবাদের ক্ষেত্রে রিপোর্টার যেমন ঘটনার অবিকল বর্ণনা দেন, আবার তার উপস্থাপনেরও কোন ভনিতা থাকে না। এ ধরনের সংবাদ বিবরণী তৈরির সময় তাতে কোন রিপোর্টার তাঁর বা তাঁর সংবাদ সংস্থার আদর্শগত মেজাজ প্রতিফলিত করেন না। এ ধরনের সংবাদবিবরণীতে কোন ঘটনার সাদা চোখে দেখা বর্ণনা থাকে। যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই এতে সন্নিবেশিত হয়। এ ধরনের সংবাদ হয় পক্ষপাতহীন। তাতে কোন মতামত প্রবিষ্ট হয় না। সংঘটিত কোন ঘটনা তলিয়ে দেখা হয় না এতে।

চার. ব্যাখ্যামূলক সংবাদ (Interpretative news)। ঘটনা যাই ঘটুক বা যেভাবেই ঘটুক না কেন, এ ধরনের সংবাদবিবরণীতে অবশ্যই ব্যাখ্যা থাকে। আগেই বললাম, কোন ঘটনার হুবহু বর্ণনা মানে বস্তুনিষ্ঠভাবে বলা, পক্ষপাতহীনভাবে বলা। কিন্তু ব্যাখ্যামূলক খবরে কোন ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে খতিয়ে বলতে হয়। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বস্তুনিষ্ঠভাবে হয়তো বলা যায়, এই এই কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এতে এত জন মারা গেছে। এতজন আহত হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যামূলক সংবাদের প্রকৃতিই হলো এই, তাতে ঘটনার গভীরে গিয়ে অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করা। যে শর্তাবলীর কারণে দুর্ঘটনা ঘটলো সেই শর্তাবলীর পেছনের কারণগুলো কী তা অনুসন্ধান করা। এ ধরনের সংবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সাংবাদিক তাঁর বর্ণনার মধ্যে সংঘটিত সেই ঘটনা বা বিষয়ের সম্পর্কে ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ করেন। কার্যকারণ উপস্থাপন করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় তিনি যেন তাতে নিজের মতামত দিয়ে দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই মতামত সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিভিন্ন সূত্রের চার্ট, রেখাচিত্র, ম্যাপ ও নেপথ্য উপাদানের সহযোগিতায় এই সংবাদকে এমনভাবে পরিবেশন করা যায় যে এতে করে কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে একটি বৃহত্তর ঘটনা প্রবাহের মধ্যে স্থাপন করা যায়।

পাঠকও একটি ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য নিয়েই থেমে যায় না, নতুন করেও রীতিমতোভাবে তা নিয়ে ভাবতে বসে।

ব্যাখ্যামূলক সংবাদ হচ্ছে তাই যা গতকালের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আজকের যে ঘটনাটি ঘটলো তা আগামীকালের জন্য এক অর্থ বয়ে আনে।

পাঁচ. মন্ময়ী সংবাদ (Subjective news)। কোন সংবাদদাতা বা রিপোর্টার যখন কোন রিপোর্টে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের আদর্শের মেজাজ সন্নিবেশিত করেন তবে তা মন্ময়ী সংবাদ। অর্থাৎ এ হলো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের উল্টো দিক। এ ধরনের সংবাদে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার তাঁর নিজের বা তাঁর প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গিকে মিশ্রিত ও রঞ্জিত করে ফেলেন। অন্য অর্থে এ হলো মন্তব্যাশ্রয়ী রিপোর্ট। অর্থাৎ কোন ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনার মন্তব্য করে ফেলেন। আজকাল অনেক পত্রপত্রিকাই এ ধরনের রিপোর্ট করছে। যাঁরা করছে তাঁদের যুক্তি হলো যে নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই। সুনির্দিষ্টভাবেই তাঁরা একটি পক্ষের হয়ে কাজ করছেন। সে পক্ষ গণমানুষের পক্ষ, অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের পক্ষ। ফলে তাঁরা কোন ঘটনা তলিয়ে দেখার পাশাপাশি সেই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের সরাসরি অভিযুক্ত করতে ছাড়েন না। এ ধরনের সংবাদবিবরণীতে মন্তব্যের পাশাপাশি কিছুটা ভাষাগত মাধুরীর সংমিশ্রণও থাকে।

ছয়. মতামত (Opinion)। যা মতামত তা নিশ্চিতরূপেই কোন সংবাদ নয়। ব্যাখ্যামূলক সংবাদে মন্তব্য থাকে, তবে তা সংশ্লিষ্ট সূত্রের মুখ দিয়ে। মন্ময়ী সংবাদে রিপোর্টার নিজেই মন্তব্যাশ্রয়ী রিপোর্ট করে থাকেন। কিন্তু সংবাদের মূল বৈশিষ্ট্য তাতে ব্যাহত হয় না বা সংবাদের তিল পরিমাণ অভাবও থাকে না। কিন্তু যা মতামত বলে বিবেচিত মূলত তা সংবাদ নয়। মতামত সাধারণত সম্পাদকীয়তে পাওয়া যায়। মতামত কোন সংবাদের বিচারমূল্য (Value of Judgement) প্রদান করে।

এখানে উল্লেখ্য, মতামতকে প্রায়শই সংবাদের ক্যাটাগরিতে ফেলে দেয়া হয়, কিন্তু এটি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস তা বোঝানোর জন্য বিষয়টিকে এই অধ্যায়েই সন্নিবেশিত করা হলো।

সংবাদের উপাদান ও সংবাদমূল্য

সংবাদের উপাদান

আমরা আগের এক অধ্যায়েই সংবাদের সংজ্ঞা মারফত সংবাদের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পেরেছি। এ অধ্যায়ে আমরা সংবাদের উপাদান এবং সংবাদমূল্য নির্ধারণী শর্তাবলী সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। সংবাদ প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে কিছু তথ্যাবলীর সমষ্টি। তথ্য হচ্ছে এমন কিছু বিষয় বা বস্তু যা অনিশ্চয়তা দূর করে। অন্য অর্থে তথ্য হলো ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও সামাজিক বাস্তবতা। কোন ঘটনা, ভাব, বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কেই এই ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা সামাজিক বাস্তবতা। (এখানে উল্লেখ্য যে, সুঘটনাও একটি ঘটনা, দুর্ঘটনাও একটি ঘটনা। আবার একটি ঘটনা ঘটার কথা ছিল কিন্তু ঘটেনি তাও প্রকৃতপক্ষে একটি ঘটনা)। সমাজ জীবনে এইসব ঘটনা, বিষয় বা পরিস্থিতির একেকটি দিক থাকে। যে দিকগুলোই প্রকৃতপক্ষে সংবাদের উপাদান এবং তা 'সংবাদ' নামক পদটির মাত্রা নির্ধারণ করে। সমাজে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ঘটে চলেছে। তার তাৎপর্য কিংবা পরিণাম আছে। এ নিয়ে আবেগ, কৌতুকের সৃষ্টি হচ্ছে, রহস্যের সৃষ্টি হচ্ছে, উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। আর এ সব কিছুই সময়ের মাপকাঠিতে, গুরুত্বের মাপকাঠিতে বিচার হচ্ছে। আসলে এ সবই হচ্ছে সংবাদের একেকটি উপাদান যা সংবাদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে অথবা যেসব উপাদানের কারণে সেগুলোকে আমরা সংবাদ বলে মেনে নিচ্ছি। আমরা এখানে সংবাদের সেইসব উপাদানকে এক-এক করে সংক্ষিপ্তাকারে বিশ্লেষণ করবো।

এক. তাৎক্ষণিকতা (Immediacy)। একটা কথা আমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে সংবাদ হচ্ছে পচনশীল বিষয় (Perishable item)। এটা ঠিক মাছের মতোই। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মাছ যেমন পচে যায় এবং তার মূল্য ক্রমশ কমে আসে সংবাদের ক্ষেত্রেও তাই। পরিবেশিত সংবাদের সময়োপযোগিতা না থাকলে তার কোন দাম থাকে না।

সংবাদের পাঠকশ্রোতাও তাই তরজাতা সংবাদ চান। তথ্যে ভরপুর সংবাদ চান। আর সেজন্যই তাঁরা পত্রিকা কেনে, রেডিও শোনে, টেলিভিশন দেখে। বর্তমান আধুনিক

যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্ময়কর অগ্রগতির কল্যাণে, বিশেষ করে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে আমরা দ্রুত সংবাদ পেয়ে যাচ্ছি। যেমন—

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসার হত্যাকাণ্ডের খবর আমাদের কাছে পৌঁছুতে খুব বেশি দেরি হয়নি। কে কত আগে সংবাদ পাঠক-শ্রোতার কাছে পৌঁছাতে পারে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছে। সংবাদের তাৎক্ষণিকতার গুরুত্ব তাই অপরিসীম। এখানে উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় পরেও কোন সংবাদ প্রচারিত হতে পারে যদি তার সংবাদ মূল্য থাকে বা নতুন কোন প্রেক্ষাপটে তার সংবাদমূল্য তৈরি হয়ে যায়।

দুই. নৈকট্য (Proximity)। কোন পাঠকের কাছে হাজার হাজার মাইল দূরের কোন সংঘটিত বৃহৎ ঘটনার চেয়ে নিজের বাড়ির কাছের কোন ক্ষুদ্র ঘটনাই বেশি আকৃষ্ট করে। মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। নিজের স্বার্থ নিজের কাছেই বেশি মূল্যবান। নিজের পরিপার্শ্বের ঘটনার পরেই সে দূরের পরিপার্শ্বের ঘটনার দিকে নজর দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে গোলাগুলিতে কোন ছাত্র খুন হলে সে খবরটা আগে নেবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের বাবা-মায়েরা। অথচ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সিউল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সহিংসতার কথা তেমন আকৃষ্ট করবে না। ঘটনার নৈকট্য তাই সংবাদের একটি বড় উপাদান। নৈকট্য অবশ্য দু'প্রকার। একটি মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য। অপরটি ভৌগলিক নৈকট্য। হাজার মাইলের দূরের কোন ঘটনাও মনস্তাত্ত্বিক কারণে খুব কাছের বলে মনে হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য চিন্তার ক্ষেত্রে, ধর্মীয় চেতনা ও সংঘের ক্ষেত্রে, জাতিসত্তার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

তিন. প্রখ্যাতি (Prominence)। কে বলছে, কী বিষয়ে বলছে, কোন জায়গার কথা বলছে অর্থাৎ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্থান কাল পাত্র বা অবস্থানের ওপর সংবাদের গুরুত্ব নির্ভর করে। কোন দুর্ঘটনায় হতাহতের মধ্যে কোন মন্ত্রী বা প্রখ্যাত ব্যক্তি থাকলে তিনিই বেশি উল্লিখিত হবেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কোন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখলে তা একই বিষয়ে কোন মন্ত্রীর বক্তব্যের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। প্রখ্যাতি যেমন সংবাদের উপাদান হয়, কুখ্যাতি অর্থাৎ কলংকের কালিমাময় নামও সংবাদের উপাদান হয়। আবার এমন যদি হয় কেউ প্রখ্যাত ছিলেন কিন্তু কোনো কারণে সেই মর্যাদা থেকে তার পতন ঘটেছে অর্থাৎ তিনি Defamous হয়ে পড়েছেন তাহলে তিনিও সংবাদ শিরোনাম হবেন। শুধু মানুষ নয়, কোন ঘটনার ছোট অথবা বড় ব্যাপ্তিও সংবাদের মাত্রা নির্ধারণ করে।

চার. বিষমতা (Oddity)। সাধারণ কোন ঘটনা সাধারণত কোন সংবাদ নয়। ঘটনা অসাধারণ হলেই সংবাদ। আবার এইসব ঘটনার কিছু কিছু হয় বেশ ব্যতিক্রমধর্মী। আপাতদৃষ্টিতে তা সাধারণ ও তুচ্ছ বলে মনে হলেও তা থাকে বিষমতায় ভরপুর। বিষধর সাপের সঙ্গে দিনের পর দিন বসবাস, গভীর সমুদ্রে পড়েও বেঁচে যাওয়া, সুউচ্চ ভবন থেকে পড়েও শিশুর অক্ষত থাকা এ সবই বিষমতার উপাদান। বিনা অক্সিজেনে এভারেস্ট জয়, হাত পা বেঁধে সাঁতার কাটা, খোঁড়া মানুষের দৌড় প্রতিযোগিতায় জয় আজকাল খুব বেশি অসাধারণ ঘটনা নয়, কিন্তু এসব ঘটনার মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ রয়েছে। এর ভালো পাঠকও রয়েছে। সংবাদ হবার জন্য এ ধরনের ঘটনাগুলো একেকটি বড় উপাদান।

পাঁচ. দ্বন্দ্ব বা সংঘাত (Conflict)। সংবাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি দ্বান্দ্বিক অবস্থা বিরাজ করছে। বিশ্বজুড়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতেরই ফল। আবার যেখানে শান্তি আলোচনা চলছে তাতেও কিন্তু পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে একটি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রের সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যেও দ্বন্দ্ব বা সংঘাত রয়েছে। চাকরি ক্ষেত্রে একই পদমর্যাদার একাধিক কর্মকর্তা বা কর্মচারির মধ্যে প্রমোশন সংক্রান্ত সংঘাত রয়েছে। আর এই দ্বন্দ্ব বা সংঘাতকে কেন্দ্র করে যেমন বড় বড় ঘটনা ঘটছে, আবার বড় বড় সংবাদ উপযোগী দুর্ঘটনাও ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে এ জগতই হচ্ছে সংঘাতের মল্লভূমি। জগতের অধিকাংশ সংবাদ ঘটনাই সংঘাতে ভরপুর। কোন ফুটবল খেলায় ফেভারিট দলের জয়ের তুলনায় আন্ডারডগ দলের জয় একটি বড় সংবাদ। সুখী দাম্পত্য জীবনের চেয়ে বিয়ে বিচ্ছেদের মধ্যে সংঘাত বিদ্যমান।

ছয়. মানবিক আবেদন বা আবেগ (Human interest or emotion)। মানুষই হচ্ছে এ জগতের সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কোন সংঘটিত ঘটনা, বিষয়, ভাব বা উদ্ভূত পরিস্থিতি মানুষের আবেগকে নাড়া দিতে পারলেই তা সংবাদ বলে বিবেচ্য। যে ঘটনা মানুষকে আবেগদীপ্ত করে, তাঁকে আন্দোলিত করে, তাঁকে শোকগ্রস্ত কিংবা ব্যথিত করে তোলে, তাঁকে উদ্বেলিত করে, তাঁকে আনন্দিত করে সে সবই সংবাদের উপাদাননিষ্ঠ ঘটনা। মানবিক আবেদননিষ্ঠ কোন ঘটনার সঙ্গে যদি সে মনে করে এরকম ঘটনা তাঁর জীবনেও তো ঘটতে পারতো তাহলেই বোঝা যাবে সেসব ঘটনা সংবাদ উপযোগী ঘটনা। ভূমিকম্পের পর ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েও বেঁচে থাকার ঘটনা এ ধরনের সংবাদ উপাদানের দৃষ্টান্ত। জগন্নাথ হলের মিলনায়তন ভবনের ছাদ ধসে পড়ে ৩৯ জন

ছাত্র কর্মচারীর মৃত্যুর খবর সমগ্র বাংলাদেশবাসীকে শোকাভিভূত করে তুলেছিল। বছর দশেক পরে অবশ্য আহত ছাত্রদের মধ্যকার আরেকজন মারা গেছে। সেই দুর্ঘটনায় যেসকল বাবা-মা'র সন্তান মারা যায়নি তাঁরা পর্যন্ত এই শোকবিহবল ঘটনায় দারুণভাবে মর্মপীড়িত হয়েছিলেন। দুঃখ, ঘৃণা, শোক, ক্ষোভ, আনন্দ, কৌতূহল, সৌন্দর্যপ্রিয়তা সবই মানবিক আবেদননিষ্ঠ গুণাবলী।

সাত. পরিণাম (Consequence)। কোন ঘটনা আরেকটি ঘটনারই জন্ম দেয়ার ইঙ্গিত বহন করে। যে ঘটনা ঘটেনি অথচ ঘটার কথা ছিল সেটাও একটা ঘটনা এবং সে ঘটনাও আরেকটি সম্ভাব্য ঘটনারই ভিত্তিভূমি মাত্র। অর্থাৎ যে কোন ঘটনারই একটি সম্ভাব্য পরিণাম বা পরিণতি আছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্যকে পদত্যাগ করতে বললেন কিংবা কোন মন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন সাদা চোখে সেটা স্রেফ পদত্যাগের ঘটনা মনে হলেও তার পেছনে সুদূরপ্রসারী ঘটনাপ্রবাহ আছে এবং তার একটি চূড়ান্ত পরিণতিও আছে। কারণ ইতিহাস থেকেই আমরা জানতে পারি যে একজন মন্ত্রীর পদত্যাগ থেকেই লাইন ধরে অন্যান্য মন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনা এবং তার চূড়ান্ত পরিণাম হিসেবে পুরো মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে।

আট. তাৎপর্য (Significance)। কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোন ঘটনার জন্ম হয় না। কোন সংঘটিত ঘটনা, ভাব, বিষয় বা পরিস্থিতির একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। সবকিছুর মধ্যে একটি কার্যকারণ লুক্কায়িত থাকে। কোন প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী কেন মন্ত্রিসভার রদবদল করলেন তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকে। নিশ্চয়ই তিনি মন্ত্রিসভার রদবদল ঘটিয়ে তাঁর আস্থাভাজনদের কাছে টেনে আনলেন কিংবা কাউকে বাদ দিয়ে দূরে ঠেলে দিলেন। অথবা এমন হতে পারে যে তিনি মন্ত্রিসভার রদবদল ঘটিয়ে জনসাধারণের কাছে ক্ষয়ে যাওয়া তাঁর আস্থাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন অথবা এর মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের কাছে অধিকতর জবাবদিহিমূলক হতে চাইলেন। প্রকৃতপক্ষে যেকোন পরিবর্তনের পিছনে কোন না কোন কারণ জড়িত থাকে, অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে।

নয়. রহস্য বা বিস্ময় (Suspense)। যেসব ঘটনায় রহস্য বা বিস্ময় রয়েছে সেগুলো আমাদের আকৃষ্ট করে। কোন হত্যাকাণ্ডের ঘটনার রহস্য উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত তা পাঠকের মনে দারুণ আগ্রহকে ধরে রাখে। এসব ঘটনার 'ফলোআপ' চলতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে।

দশ. কর্ম (Action)। এমন কোন কাজ যেগুলো সাধারণ কর্ম বলে স্বীকৃত নয়- যেমন কোন দুঃসাহসিক কর্ম বা অভিযান— সেসব ঘটনাও সংবাদের উপাদান। নৌকায় করে আটলান্টিক পাড়ি, পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেলে চেপে বিশ্বপরিভ্রমণ এর অন্তর্ভুক্ত।

এগারো. সাফল্য (Achievement)। যে কোন ধরনের সাফল্য বা জীবনে সিদ্ধি অর্জন, নাম, খ্যাতি, যশ অর্জন প্রভৃতিও সংবাদের উপাদান। লটারিতে বড় অংকের টাকা প্রাপ্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদাসূচক ডিগ্রিলাভ, ক্রীড়াক্ষেত্রে দারুণ প্রতিভা ও মেধা প্রদর্শন সবই সাফল্যের অন্তর্ভুক্ত।

বারো. রসবোধ (Humour)। এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা মানুষের মাঝে রসবোধের সৃষ্টি করে। চার্লি চ্যাপলিনের বিষয় নিয়ে অনেক রসবোধের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন নির্বাচনে (১৯৯২) তৃতীয় প্রার্থী রস পেরোর অংশগ্রহণ এবং তাঁর বক্তৃতা বিবৃতি হাস্যরসের যথেষ্ট খোরাক দান করেছিল।

মোটামুটি এই হচ্ছে সংবাদের প্রধান প্রধান উপাদান। এছাড়াও বেশ কিছু উপাদান আছে যা সংবাদ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখে থাকে। যেমন, যৌনতা বা কেলেংকারি, সৌন্দর্য বা রোমান্স, সংখ্যা বা আকার, সম্পদ, হঠাৎ কোন যোগাযোগ (Coincidence), অভিনবত্ব, শিশু-কিশোর, পশু-পাখি, ক্রীড়া প্রভৃতি। বৃটেনের রাজপরিবারের পুত্র কন্যাদের বিয়েশাদি ও যৌন সম্পর্ক নিয়ে খবরের সৃষ্টি হয়েছে। কুকুর মানুষকে কামড়ালে নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালেই খবর হয় এবং সেটা অভিনবত্বের মধ্যে পড়ে। ১২ বছর বয়সেই অক্সফোর্ডের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন, চিড়িয়াখানার নতুন কোন প্রাণীর আগমন বা জন্ম, মাদক গ্রহণের জন্যে ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার, কোন নামি ব্যক্তির বাড়ি বিক্রয় কিংবা বিয়ে ভাগ্যে সম্পদ লাভ এসবই সংবাদের উপাদান। কোন অখ্যাত পল্লীর মেয়ে বিশ্বসুন্দরী হয়ে গেলো, কেউ হয়তো ৫০টা বিয়ে করে ফেলেছে, কেউ হয়তো ৮ ফুট লম্বা এসবই সংবাদের উপাদান।

সংবাদমূল্য নির্ধারক শর্তাবলী

সংবাদমূল্য নিরূপণের শর্তাবলী সম্পর্কে একজন সাংবাদিক বিশেষত একজন রিপোর্টার পরিচিত না হলে তাঁর পক্ষে সংবাদের উপাদান খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং স্বভাবতই সংবাদবিবরণী তৈরি করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কোন ঘটনার সংবাদমূল্য হবার (Newsworthiness) পেছনে সবসময় মানব স্বার্থ ও আকর্ষণ কাজ করে। কিন্তু কতকগুলো শর্ত আছে যা ওই মানব স্বার্থ ও আকর্ষণকে বিজড়িত করতে না পারলে কোন পাঠকের কাছে তা সংবাদমূল্য হিসেবে পরিগণিত হবে না।

মূলত চারটি শর্ত (Factor) সংবাদমূল্য নিরূপণ করে থাকে। সেগুলো হলো ঃ সময়োপযোগিতা (Timeliness), নৈকট্য (Proximity), আকার (Size) ও গুরুত্ব ((Importance)। এছাড়াও আরো কিছু শর্তাবলী আছে। এখানে উল্লেখ্য, সংবাদমূল্য নিরূপক শর্তাবলীকে অনেক সময় সংবাদের উপাদানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সংবাদমূল্য নিরূপক শর্তগুলো সংবাদের এক একটি উপাদান বটে। তবে সব সংবাদ উপাদনই (Element) সংবাদমূল্য নিরূপক শর্ত হিসেবে কাজ করে না। আমরা এখানে ওই চারটি মূল শর্ত সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সময়োপযোগিতা: আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেই বলি, সংবাদ মাছের মতোই পচনশীল দ্রব্য। বেলা বাড়ার সাথে সাথেই মাছের পচনের মতো সংবাদেও পচন ধরে। অর্থাৎ সময়মতো সংবাদ পরিবেশিত না হলে তার কোন দাম থাকে না। নতুন কিছু পাবার জন্যই পাঠকরা পত্রিকা কিনে থাকে কিংবা দর্শক শ্রোতা টিভি-রেডিও দেখে-শুনে থাকে। আধুনিক যুগে বিস্ময়কর যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে আমরা কোন ঘটনার খবর তা ঘটার প্রায় সাথে সাথেই পেয়ে থাকি। সেইসব হাজারো ঘটনার সংবাদ উপযোগিতা ও তার সময়োপযোগিতাকে যদি সাংবাদিক বুঝতে না পারেন তাহলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের জীবনে সাফল্য আসবে না, তাঁর প্রতিষ্ঠানের সুনামও বৃদ্ধি পাবে না। যে কোন গণমাধ্যমের কর্মীই সময়ের গতিকে পরাজিত করে 'সংবাদ' নামক অমূল্য সম্পদ টাকার বিনিময়ে ক্রেতার কাছে বিক্রি করছেন। কথায় বলে সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। সময়মতো একটি সংবাদ পরিবেশন করতে না পারলে তার ফলোআপ দিয়ে আগে হারিয়ে যাওয়া পাঠক, শ্রোতা দর্শককূলকে ফিরিয়ে আনা যায় না। তবে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘ সময় পরেও কোন ঘটনার সংবাদ প্রচারিত বা প্রকাশিত হতে পারে যদি তাতে সংবাদমূল্য থাকে। তখন হয়তো সেই ঘটনার তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিই সময়োপযোগিতাকে নির্ধারণ করবে। সময়োপযোগিতার এই শর্তটি তাই বুঝতে না পারলে সংবাদের মূল্য নিরূপণ সম্ভব নয়।

নৈকট্য: নৈকট্য সংবাদের উপাদান বটে, তবে এ সংবাদমূল্য নিরূপণের সহায়ক শর্তও বটে। নিজের বাড়ির কাছে সংঘটিত কোন ক্ষুদ্র ঘটনাই একজন পাঠকের কাছে কোন দূরের বা হাজার হাজার মাইল ব্যবধানের সংঘটিত বড় ঘটনার চেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে ফায়ারিং স্কোয়াডে হাজার হাজার বিরোধীকে মেরে ফেলার ঘটনার চেয়ে আমাদের এখানে কোন হরতাল বা ধর্মঘটের সময় কোন ছাত্র বা শ্রমিকের নির্মম মৃত্যুর খবরই বেশি করে আকৃষ্ট করবে। পাঠকের চাহিদার স্বার্থেই স্থানীয় পত্রিকাগুলো স্থানীয় খবরের ওপরই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। স্থানীয় আবেদন

যে সংবাদের মধ্যে থাকবে সে সংবাদই স্থানীয় পাঠকদের বেশি করে আকৃষ্ট কর । যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গিয়েছিল যে শুধুমাত্র বড় ঘটনাগুলো (Major events) ছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মাত্র ১০ শতাংশ লোক আন্তর্জাতিক খবরাখবর পড়ে থাকে।

গুরুত্ব: কোন সংবাদকে তার তুলনামূলক গুরুত্বের জন্যই পরিমাপ করা যায়। বিশেষ করে যখন দুটো বা ততোধিক সংবাদ পত্রিকার পাতায় জায়গার জন্য কিংবা রেডিও-টিভির সময় পাবার জন্য পাশাপাশি লড়াইয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন গুরুত্বের কারণেই কোনটি বেশি প্রাধান্য পায়, কোনটি পায় কম। আবার কোনটি সংবাদ উপযোগিতাই খুঁজে পায় না। আসলে পাঠক সমাজে যদি কোন গুরুত্বই না থাকে তাহলে সে সংক্রান্ত ঘটনার সংবাদাকারে বিবরণী প্রকাশ করে কী লাভ? জনস্বার্থবিহীন, এমনকি কোন সংবাদ পড়ে পাঠক কোন উপকার বা মজাই পেলো না তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেটা কোন সংবাদ নয়। সংবাদের পরশপাথরই হচ্ছে আগ্রহ বা উৎসাহ (Interest)। আগ্রহোদ্দীপক কোন উপাদান না থাকলে সেই ঘটনা গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত। ভালো পত্রিকাগুলো সেই সংবাদই প্রকাশ করে থাকে যেগুলো কোন ঘটনার গুরুত্ব বা তাৎপর্যকে প্রতিফলিত করে পুরোপুরি ষোলআনা। কোন ঘটনার গুরুত্বের ওপরই সে সংক্রান্ত বিবরণীর যথাযথ মর্যাদা (Treatment) ও দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয়। জনগুরুত্ববিহীন ও পাঠকের কাছে অনাকর্ষণীয় সংবাদ প্রকৃতপক্ষে কোন সংবাদ নয়।

আকার: খুবই ছোট অথবা খবুই বড় জিনিস আমাদের আকৃষ্ট করে থাকে। কোন ভূমিকম্পে দু-একজনের মৃত্যুর খবর আমাদের আকৃষ্ট করে না। যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হয়, স্বাভাবিকভাবেই সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হই। কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম, আবার কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীর দীর্ঘতম, কোন্ প্রাণী পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম, কোন্ প্রাণী পৃথিবীর দীর্ঘতম এসব কিছুই আমরা জানতে চাই। কোন দানহিতৈষীর দানের খবর আমরা জানতে চাই। আবার কোন দরিদ্রতম ব্যক্তি বা ভিখারী তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দান করে গেলেও তা সংবাদের শর্ত হিসেবে কাজ করে। কোন অতীব দরিদ্র লোকের লটারিতে লক্ষ টাকা পাবার খবরও আমাদের আকৃষ্ট করে। ঢাকা বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের একখানি বিশাল বিমান অবতরণ করেছিল তাও আমাদের আকৃষ্ট করেছিল। অর্থাৎ আকাররূপী সংবাদমূল্য সংবাদ নিরূপণে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

৪৪৭৩

একজন সাংবাদিক বিশেষত রিপোর্টার তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি বা সংবাদ মূল্যের শর্তাবলী প্রয়োগ করে সংবাদ ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করেন এবং তা সংগ্রহ করেন। একই দিনে তাঁর এই সংগ্রহের ভাণ্ডার ব্যাপক হতে পারে। কিন্তু পত্রিকার পাতায় তার সবকিছুই দেয়া চলে না, রেডিও-টিভিতে তার সবটাই সম্প্রচারিত হয় না। আর এ জন্যই তাকে ওই সংবাদের লটের মধ্যে থেকে কম গুরুত্বপূর্ণগুলোকে বাদ দিয়ে অধিক গুরুত্বসম্পন্ন সংবাদগুলোই বাছাই করতে হয়। আর এই বাছাই কাজ করতে গিয়ে তাকে গুরুত্বের দিকটি ছাড়াও সময়োপযোগিতা, নৈকট্য ও আকারের ব্যাপারটিও দেখতে হয়। কোন ঘটনার সংবাদমূল্য নিরূপণে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার পলিসি বা নীতিও ভূমিকা রাখে। কোন পত্রিকা তার পরিবেশনায় সংযত ও সংহত, কেউ চাঞ্চল্য প্রকাশে আগ্রহী। কেউ উদার কেউ রক্ষণশীল। পত্রিকার চরিত্রও অনেক সময় কোন সংবাদের সংবাদমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়াও ঘটনার সংবাদ হবার মতো নিজস্ব জোর কতখানি তার মাত্রা নির্ধারণ সাংবাদিক করে থাকেন তাঁর ওই সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে। কারণ ফর্মুলা বা শর্ত দিয়ে সারাজীবন সংবাদমূল্য নিরূপণ সাংবাদিকের যোগ্যতার মাপকাঠি নয়।

সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক: সাংবাদিকতার একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই যে কেবল যে কোন ঘটনার সংবাদমূল্য নির্ধারক উপাদান খুঁজে পাবেন একজন সাংবাদিক এমন নয়। বরং সংবাদের গন্ধ শোঁকার মতো একটা সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিটি পেশাদার সাংবাদিকের থাকা উচিত। একজন সাংবাদিককে সংবাদ সংগ্রহের উন্নততর সাজসরঞ্জাম ও প্রচুর তথ্য ঠেসে দিলেই তিনি সংবাদ মূল্য সম্বলিত বিবরণী তৈরি করতে পারবেন না যতক্ষণ তিনি কোন ঘটনার মধ্যে সংবাদের উপাদান খুঁজে পান এবং সংবাদের সেই উপাদান খুঁজে না পেলে তাঁর সহায়ক যন্ত্রপাতিও তাঁর জন্য অচল হয়ে পড়ে এবং তথ্যাবলীর পাহাড় তাঁর কাছে সবই তুচ্ছ কথার জঞ্জাল বলে মনে হবে। তিনি হয়তো এই এত কথার স্তূপ ঝুড়িতে ফেলে দেবেন। পরের দিন দেখবেন যে তাঁর ফেলে দেয়া কোন তুচ্ছ কথার থেকেই অন্য কোন পত্রিকা 'লিড নিউজ' করেছে।

'সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক' থাকা একজন সাংবাদিকের জন্য একটি বিশেষ গুণ। এর অর্থ হচ্ছে যে তিনি সংবাদ হবার মতো সম্ভাবনাপূর্ণ কোন ঘটনা, বিষয় বা পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ। সংবাদোপযোগী ঘটনা বা বিষয়কে চিহ্নিত করার সামর্থকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

এক. কোন তথ্য পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে এরকম তথ্যকে চিহ্নিত করার সামর্থ।

দুই. কোন ক্লু (Clue) বা সংবাদ আহরণের প্রাথমিক সূত্রটি আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা মনে হতে পারে, কিন্তু এই ক্লু-টিই কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আবিষ্কারের পথকে চালিত করতে পারে। সেই ক্লু-কে চিহ্নিত করতে পারার সামর্থ।

তিন. একটি সাধারণ বিষয়ের মধ্যেই অসংখ্য তথ্য সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। এই অসংখ্য তথ্যের মধ্যে কোন-কোনটা হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোর থেকে ভালো সংবাদ সৃষ্টি হতে পারে। তাকে চিহ্নিত করতে পারার সামর্থ।

চার. এমন হতে পারে হাতের কাছে এমন তথ্য আছে যার থেকে অন্য কোন সংবাদ হবার মতো সম্ভাবনা থাকতে পারে। অর্থাৎ একটি তথ্য ঘাঁটতে গিয়ে এমন একটি তথ্য আবিষ্কার হলো যার থেকে সংবাদ সৃষ্টি হতে পারে এবং তাকে চিহ্নিত করতে পারার সামর্থ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিঁধেল চুরির ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়েই দুই মার্কিন সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টাইন ওয়াটারগেট কেলেংকারির মতো বড় ঘটনার সন্ধান পেয়েছিলেন। আমরা কয়েকটি উদাহরণ টেনে 'সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক' বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবো।

কোন সাংবাদিক বিশেষত রিপোর্টারকে পাঠানো হলো কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিয়ের অনুষ্ঠান কভার করার জন্য। তিনি সেখানে গেলেন। বিয়ের অনুষ্ঠান সব ঠিকঠাক। কিন্তু কোন কারণে বর এলো না, বিয়ে হয়নি। কিন্তু ওই বিয়ের ঘটনাটি না ঘটলেও সেটাই একটা ঘটনা। সেটাই যে খবরের একটি উপাদান তা ওই রিপোর্টার বুঝতে পারেননি।

একটি সাধারণ ঘটনা প্রবাহের মাঝে হঠাৎ করে আকস্মিক কোন ঘটনা ঘটতে পারে। আকস্মিক ওই ঘটনাটাই মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। ১৯৯২ সালে পুরোনো ঢাকায় 'মনা' নামে একজন ব্যবসায়ী নিহত হন ছিনতাইকারীদের হাতে। তাঁর স্মরণে গঠিত 'মনা স্মৃতি পরিষদ' তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ১৯৯৩ সালে জুলাই মাসে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। মনা হত্যার বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় সৈয়দ নেসার নোমানী নামে পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ফলে মনা হত্যার বিচারের দাবি ও ক্ষোভের বিষয়টির চেয়ে নোমানীর মৃত্যুটাই সেদিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রাষ্ট্রনায়কদের শীর্ষ সম্মেলনের সময় নেতাদের বক্তৃতার লিখিত বিবরণীর কপি সাংবাদিকদের প্রায়শই আগাম দেয়া হয়। কিন্তু অনেক সময় অনেক রাষ্ট্রনেতা প্রথা ভেঙে লিখিত বিবরণীর বাইরে বক্তব্য রাখেন। তাদের সেই বাড়তি বক্তব্যই অনেক

সময় বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের জন্ম দিয়ে থাকে। '৯০ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে শ্রীলংকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন লিখিত বিবরণীর বাইরেও বেশ কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। কোন রিপোর্টার তথ্য সাংবাদিক যদি কোন রাষ্ট্রনেতার তাৎক্ষণিক বক্তব্যের মূল সুরটি অনুসরণ করতে না পারেন তাহলে তাঁর পত্রিকা অন্য পত্রিকার সঙ্গে মার খেয়ে যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন তাঁর তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় যে কথাবার্তা বলেছিলেন সেটিই ছিল তাঁর বক্তৃতার মূল ভাব। আঞ্চলিক শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ওপর জোর দেয়া আবেগসঞ্জাত সেই বক্তব্যের মূল ভাবটিকে যাঁরা সেদিন অনুসরণ করতে পেরেছিলেন সম্ভবত তাঁরাই ভালো রিপোর্ট করতে পেরেছিলেন।

প্রতিদিন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে বাইরের বিভিন্ন সংগঠন, দফতর বা প্রতিষ্ঠানের অজস্র সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আসে। এগুলো থেকে প্রতিদিনই কিছু কিছু সংবাদাকারে পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলেও এগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ এই সামান্য সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকেই একজন সাংবাদিক বড় ধরনের সংবাদবিবরণী তৈরি করতে পারেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অনেক সময়ই বড় সংবাদের উপাদান লুক্কায়িত থাকে। সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক থাকলে তা থেকেই সাংবাদিক পরের দিনের লিড নিউজের মতো সংবাদও পেয়ে যেতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সংবাদশীর্ষ

সংবাদশীর্ষ কী এবং কেন

সংবাদের শুরুতেই অর্থাৎ কোন সংবাদ কাহিনীর প্রারম্ভের এক-দু বাক্য অথবা প্রথম অনুচ্ছেদটিই সংবাদশীর্ষ (News lead) নামে পরিচিত। সেই প্রথম অনুচ্ছেদেই কোন সংবাদ কাহিনীর মূল কথাটি বা সার কথাটি বলে দেয়া হয়। ওই প্রথম অনুচ্ছেদটুকু পড়েই পাঠক কোন সংবাদ কাহিনী সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত হয়ে যান এবং সংবাদশীর্ষটি যদি পাঠকের আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয় তবে সে খবরের বাকি অংশটাও পড়তে আগ্রহী হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে বা অন্য কোন কারণে পাঠকের যদি পড়ার অবকাশ না থাকে তার পরেও যাতে পাঠক কোন সংবাদ কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু থেকে বাদ না পড়ে যান তার জন্যই সংবাদশীর্ষের ব্যবস্থা। সংবাদ কাহিনীর শীর্ষে যেহেতু সংবাদটির মূল কথাটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত থাকে সেজন্যেই ওই অংশটুকুকে সংবাদশীর্ষ বলা হয়। বিষয়টি আরো সোজা করে বলা যায়: সংবাদ কাহিনীর সারসংক্ষেপের উপস্থাপনা বা পরিবেশনমূলক বাক্যসমূহই সংবাদশীর্ষ। সাধারণত এক অনুচ্ছেদেই এটি সারতে হয়। তবে প্রয়োজনে একাধিক অনুচ্ছেদেও তা সারা যায়।

একটা কথা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। কিন্তু সংবাদশীর্ষ লেখার একটি নিয়ম বা পাঠকের দিক থেকে প্রধান দাবিটি হচ্ছে, খুব সহজ কথায় সেটি লিখতে হবে। সংবাদের ভাষা হচ্ছে মানুষের মুখের ভাষা, কথোপকথনের ভাষা। মানুষে মানুষে যখন কথাবার্তা হয় তখন তাদের সেই সংলাপের ভাষায় কোন ঘোরপেঁচানো কিছু থাকে না, লেখ্য ভাষার মতো জটিলতা থাকে না। সংবাদপত্রের পাঠকরাও সেই কথোপকথনের ভাষাই প্রত্যাশা করে। যেহেতু সংবাদপত্রের পাঠকের শ্রেণী এক নয়। নয় বছরের শিশু থেকে নব্বই বছরের বৃদ্ধ, শিক্ষিত রিকশাওয়ালা থেকে বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত সংবাদপত্রের পাঠক। অতএব সবাই যাতে সন্তুষ্ট হয় সেভাবেই সংবাদপত্রের ভাষা তৈরি হয়। অতএব সহজ করে সংবাদবিবরণী তৈরি করা ছাড়া সাংবাদিকের গত্যন্তর নেই।

কিন্তু সহজ করে সংবাদশীর্ষ বা পুরো সংবাদবিবরণী তৈরি করা সহজ কাজ নয়। কোন সংবাদ কাহিনীর মূল কথাটি বা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি খুব সহজ করে উপস্থাপন করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যারা সাংবাদিকতা পেশায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন তারা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, আকর্ষণীয় সংবাদশীর্ষ সহকারে সংবাদ কাহিনী রচনা করা দারুণ

কঠিন কাজ। এর কারণ সংবাদের সূচনা যে কটি শব্দ দিয়ে শুরু তার জন্য যথেষ্ট চিন্তাভাবনার প্রয়োজন এবং ওই কটি শব্দ সমষ্টির ওপরই নির্ভর করে পাঠক ওই বিশেষ সংবাদখন্ডটুকু পড়তে আগ্রহী হবেন কিনা।

কৌতূহলোদ্দীপক করে সংবাদ কাহিনী লেখা সম্ভব হলে তা পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। কোন পাঠককে কোন সংবাদ পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য সংবাদশীর্ষ লেখার ব্যাপারে সংবাদ লেখককে যথেষ্ট মনোযোগী হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভালো সংবাদশীর্ষ লেখার দক্ষতা সংবাদ কাহিনী রচনার পারদর্শিতা অর্জনের পথে প্রথম নিশ্চিত ও সফল পদক্ষেপ। দক্ষতার সঙ্গে সংবাদশীর্ষ লেখার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকের ভালো সংবাদ শনাক্তকরণের যোগ্যতাও অনেকখানি বিবেচিত হয়। কারণ কোন ঘটনার মূল ভাবটি চিহ্নিত করতে পারার সামর্থ অর্জন করতে পারলে একজন সাংবাদিকের পক্ষে সংবাদশীর্ষ লেখা যেমন সহজ তেমনি কোন ঘটনার মূল ভাব দ্রুত নির্ধারণ করার সামর্থের মধ্য দিয়েই কোন সাংবাদিকের 'সংবাদের গন্ধ শোঁকার মতো নাক' আছে কিনা তা বোঝা যায়।

কোন সংবাদ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সারকে উপস্থাপিত করাই সংবাদশীর্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। পাঠককে ওই সংবাদ কাহিনীর পুরো বিবরণী পাঠে আগ্রহী করে তোলাও সংবাদশীর্ষের উদ্দেশ্য। এ কারণেই সংবাদশীর্ষ বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। আর তাই সহজ করে সংবাদ শীর্ষ লেখার ব্যাপারে হাত আসতে একজন সংবাদ রিপোর্টারের জন্য সহায়ক বিষয়টি হচ্ছে তার অভিজ্ঞতা। ক্রমাগত অনুশীলনের পর একজন রিপোর্টার খুব সহসাই একটি সংবাদশীর্ষ লিখে ফেলতে পারেন খুব সহজেই। একটি কথা বলা হয়ে থাকে 'Once the lead of a story is written, the fifty percent of the work is done' যাই হোক সংবাদশীর্ষকে একটি বুলেটিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বুলেটিন মানেই শেষ মুহূর্তের কোন খবর, একটা সংক্ষিপ্ত সার, একটা সংক্ষিপ্ত ঘোষণা বা ইশতেহার। তবে সংবাদ শীর্ষের ইংরেজি প্রতিশব্দ News lead থেকে ধারণা করা যায় যে প্রথম অনুচ্ছেদটুকু পুরো সংবাদ কাহিনীকে চালিত করে বলেই এর নাম হয়তোবা News lead। ইংল্যান্ড ও আমাদের দেশসহ অনেক স্থানেই সংবাদপত্রের প্রথম সম্পাদকীয়কে Leader বা শীর্ষক বলার প্রথা চালু রয়েছে। হয়তো সে থেকেই Lead বা 'সংবাদশীর্ষ' কথাটি এসেছে।

সংবাদ শীর্ষের উপাদান : কোন পন্থা পদ্ধতি ছাড়া সংবাদশীর্ষ লেখা কিন্তু সম্ভব নয় এবং তা করাও হয় না। যেকোন কাগজের কোন সংবাদ কাহিনীর শিরোনাম ও প্রথম অনুচ্ছেদে চোখ বুলিয়ে নিলেই সুনির্দিষ্ট সেই সংবাদ ঘটনার সকল গুরুত্বপূর্ণ খবরই

মোটামুটি পাওয়া যায়। যদিও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ও খুঁটিনাটি তথ্য আদ্যপ্রান্ত না পড়লে পাওয়া যায় না। তবু দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রীতি ও রেওয়াজের কারণেই সংবাদ শীর্ষের ওই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই সাংবাদিক পাঠকের সম্ভাব্য সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেন। পাঠকের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবটি কিন্তু সাংবাদিক একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়েই দেয়ার চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতি হচ্ছে পাঠকের কিছু প্রশ্নের সমষ্টিমাত্র। এই প্রশ্নসমূহকে ষড় 'ক' (ইংরেজিতে 5 w's and 1 H) বলা হয়। অর্থাৎ কে, কি, কখন, কেন, কোথায় এবং কেমন করে।

সারা বিশ্বের সংবাদপত্রসমূহে সাধারণত এই ষড় 'ক' এর আঙ্গিকেই সংবাদশীর্ষ লেখা হয়ে থাকে। সংবাদশীর্ষের অনুচ্ছেদে সাধারণত ওই ছটি প্রশ্নেরই উত্তর থাকে। সংবাদশীর্ষে পুরো সংবাদ কাহিনীর মূল সূর ও মেজাজ নিহিত থাকে। সংবাদ শিরোনাম পড়ে পাঠকের মনে যেসব প্রশ্নের উদ্ভব হয় সংবাদশীর্ষ পড়ে পাঠক সেসব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যান।

সংবাদশীর্ষ কোন সংবাদ কাহিনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ এবং সংবাদবিবরণী রচনার সবচেয়ে শ্রেষ্ট পন্থা অবলম্বন করেই তা লেখা হয়ে থাকে। সংবাদশীর্ষ লেখার ওই ষড় 'ক'-এর কাঠামো সম্পর্কে কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং তার একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।

কবিতার আকারে তিনি লিখেছেন —

I keep six honest service men
They taught me all I knew
Their names are, what and why and when
And how and where and who.

তবে একটা কথা উল্লেখ্য, সব সংবাদ কাহিনীর সংবাদশীর্ষে ষড় 'ক'-এর সবকটিই থাকবে অথবা ষড় 'ক'-এর সবকটিকে স্থান দিতে হবে এমন নয়। ষড় 'ক'-এর গোটা তিনেক দিয়েও সংবাদশীর্ষ তৈরি করা যায় এবং তারপরেও পাঠকের পুরো সংবাদ বিবরণীটি পাঠের আগ্রহ ধরে রাখা যায়।

অবশ্য বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর উপদেষ্টা রুডলফ্ ফ্লেশ জোর দিয়ে বলেছেন, প্রাচীন রীতির কে, কি, কখন, কোথায়, কেন'র সংবাদশীর্ষ সেকেলে ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারপরেও কিন্তু প্রাচীন রীতির ওই ষড় 'ক'-এর সাহায্যেই আজও দেশে বিদেশের অসংখ্য পত্রিকায় অধিকাংশ সংবাদ কাহিনীর সংবাদশীর্ষ লেখা

হচ্ছে। তবে আজকাল ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলো অর্থাৎ রেডিও-টিভি সংবাদ ঘটনাগুলোর ষড় 'ক' ভিত্তিক মূল কথাগুলো আগাম জানিয়ে দেয়ায় সংবাদপত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রে ষড় 'ক'-এর স্টাইল পরিবর্তন করে ফিচার স্টাইলে অথবা ব্যাখ্যামূলক ভঙ্গিতে সংবাদবিবরণী তৈরি করছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বজুড়ে খবরের কাগজগুলো সংবাদশীর্ষ তথা সংবাদবিবরণী আরো সুখপাঠ্য করে তোলার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে। ফলে সংবাদশীর্ষ আরো কম কথায় কত সহজ করে লেখা যায় তারই প্রবণতা ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। তবে একটা কথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে সংবাদশীর্ষ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে।

সংবাদশীর্ষের বহর : সংবাদশীর্ষ সাধারণত ছোট হওয়া উচিত। এতে পড়তে সুবিধা, আনন্দদায়ক এবং তা কখনই ক্লান্তিকর নয়। ছোট মাপের সংবাদশীর্ষ সাধারণত স্পষ্ট হয় এবং এতে করে পাঠকের সঙ্গে সাংবাদিকের যোগাযোগ প্রয়াসটি সফল বলে বিবেচিত হয়।

দেশে-বিদেশের বিভিন্ন নামি-দামি পত্রপত্রিকা থেকে আভাস মেলে যে সাধারণত সংবাদশীর্ষের অনুচ্ছেদটিতে ৩০টি শব্দের বেশি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে এটা ১৯ থেকে ২৫ শব্দে হলে আরো ভালো হয়। আসলে বড় জোর ৩০ শব্দের বেশি হলে অনুচ্ছেদটি হেলে পড়ে এবং সংবাদের মূল ভাবটির জোর কমে যায়, স্পষ্টতা নষ্ট হয়। স্বাভাবিকভাবেই সুনির্দিষ্ট সংবাদ কাহিনীর বাকি অংশ পড়তে পাঠকের আগ্রহে ছেদ বা ভাটা পড়ে।

আইএনএস-এর স্টাইল বুকে শীর্ষ অনুচ্ছেদ তিন বা তারও কম লাইনের মধ্যে সীমিত রাখতে বলা হয়েছে। পথচারীরা কিংবা কাজে খুব ব্যস্ত মানুষেরা ২০ শব্দে লেখা বেশির ভাগ সংবাদশীর্ষ শুনে বা পড়ে সংবাদ কাহিনীর মূল কথাগুলো বুঝতে পারেন। সংবাদশীর্ষ যেমন ১৯ থেকে ২৫ শব্দের মধ্যে লেখা হয় তেমনি এক থেকে নয় শব্দের মধ্যে শিরোনাম লিখতে পরলে কোন সংবাদ লেখকের নৈপুণ্যের প্রমাণ মেলে। আজকাল এক বাক্যে এক অনুচ্ছেদ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অনুশীলন অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

সহজ করে লেখা : সংবাদ পাঠকের জ্ঞানের বহর সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। ফলে যত সহজ করে বলা যায় ততই ভালো। সংবাদ লেখকের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো তাঁর বলার কথাটি পাঠককে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা। কম শব্দ ব্যবহার করে ভাব প্রকাশের কতকগুলো সুবিধা আছে। যেমন —

এক. এতে মূল তথ্য গুরুত্ব পায়।

দুই. বক্তব্য সরাসরি বলা যায় ও তীক্ষ্ণ হয়।

তিন. পাঠক বিষয়টি পড়ে সহজেই বুঝতে পারে।

চার. কম কথা পড়তে সহজ।

পাঁচ. কম শব্দে কথা বলতে গেলে বাধ্য হয়েই তা সোজাসুজি ও সহজবোধ্য করে বলতে হবে। তাই সংবাদ প্রতিবেদনের শীর্ষ বা সূচনা লেখার একটা ভালো কৌশল হচ্ছে **যেমনভাবে বলা তেমনভাবে লেখা**। কাজেই সামগ্রিক অর্থে সংবাদ লেখার সহজ ফর্মুলাটি হলো 'সহজ করে লিখ'। সাংবাদিকের মাথায় 'সহজ করে লিখ' কথাটি সজীব থাকলে তাঁর পক্ষে সহজবোধ্য লেখা অবশ্যই সম্ভব।

টমসন ফাউন্ডেশনের সাংবাদিকতার প্রশিক্ষকরা সংবাদশীর্ষ লেখার সময় চারটি নিয়ম মনে রাখতে বলেছেন। এই নিয়ম চারটি হচ্ছে ঃ

এক. সংবাদশীর্ষটি পুরো সংবাদ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

দুই. সংবাদ সূচনাটি পড়ে যেন পাঠক সংবাদ কাহিনীটির বাকি অংশ পড়তে আগ্রহী হন।

তিন. সংবাদশীর্ষটি সাধারণত সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং

চার. সংবাদশীর্ষ বা সূচনা সাধারণত সংবাদ কাহিনী বা বিরণীর প্রধান বা মূল তথ্যকে ভিত্তি করেই হবে। তবে এই নিয়মের প্রধান ব্যতিক্রম হচ্ছে বিলম্বিত ভাবারো২ক ধরনের সংবাদ শীর্ষ।

এই চারটি নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে বলা যায়, সংবাদশীর্ষ সংবাদ কাহিনীর পুরো বিষয়বস্তুর সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। রিপোর্টের বিষয়বস্তু হালকা হলে সংবাদশীর্ষও হালকা, বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর হলে সংবাদশীর্ষও গুরুগম্ভীর হবে। সংবাদশীর্ষ পড়ে পাঠক মনস্থির করবেন তিনি বাকি অংশ পড়বেন কিনা। কারণ সংবাদশীর্ষ পড়েই পাঠক বুঝে নিতে পারেন বাকিটুকু পড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিনা কিংবা তা পড়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। সংবাদশীর্ষ সংক্ষিপ্ত হলে পড়তে সহজ, বুঝতে সহজ। আর চতুর্থত খবরের কাগজে আজকাল খবরের মধ্যকার একটি ঘটনা, ভাব বা তথ্যকে আশ্রয় করেই সংবাদশীর্ষ লেখার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। কোন সংবাদ রিপোর্টে একাধিক তথ্য বা ঘটনার সন্নিবেশন থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে একাধিক তথ্য বা ঘটনার সমন্বয় ঘটিয়ে

মিশ্র সংবাদশীর্ষ তৈরি হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে রিপোর্টের প্রধান দুটো তথ্য দিয়েই তা করা যেতে পারে। কারণ দুইয়ের বেশি তথ্য দিয়ে সংবাদশীর্ষ তৈরি করলে তা আর সহজ সরল থাকে না। তা অনেক সময়ই ঝুলে পড়ে এবং পাঠকের জন্যও তা দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। পাঠক এতে পুরো রিপোর্ট পড়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলে।

কোন কোন সময় সংবাদ লেখক কোন সংবাদ কাহিনীর মূল বক্তব্যের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত করার লক্ষ্যে মূল বক্তব্যটি চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী শীর্ষে না এনে তা সংবাদ বিবরণীর শেষের দিকে নিয়ে যায়। শীর্ষে অন্য কথা বলে পাঠককে মূল বক্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন। অনুষঙ্গ কিছু কথার মাধ্যমে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠককে সংবাদ ঘটনাটির মূল বক্তব্যে টেনে নিয়ে যাবার এ ধরনটি সংবাদ কাহিনীরই কাঠামো নির্মাণের প্রচলিত 'উল্টো পিরামিড' পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা এ অধ্যায়েরই শেষ দিকে সংবাদ কাহিনীর কাঠামো নির্মাণের 'উল্টো পিরামিড' ও অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সংবাদশীর্ষের প্রকারভেদ: সংবাদশীর্ষ লেখার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। সব সংবাদ ঘটনার চরিত্রই এক নয়। ফলে ঘটনাভেদে সংবাদশীর্ষ রচনার স্টাইলও ভিন্ন হতে পারে। ঘটনাভেদে শীর্ষ রচনার পার্থক্য একেক সময় একেকটি নতুন আঙ্গিকের সংবাদ বিবরণী উপহার দেয়। সংবাদের ঘটনাভেদের পার্থক্যেই সংবাদ শীর্ষের কোনটায় ষড় 'ক'-এর ভিন্ন ভিন্নটি তার আপনগুণে জোরদার ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনুষ্যসৃষ্ট কোন বিপর্যয় ঘটলে তখন ষড় 'ক'-এর 'কেন' উপাদানটি জোরদার হয়ে ওঠে। আবার কোন সংবাদ ঘটনার নিজ প্রকৃতির কারণেই কোন সংবাদ শীর্ষে ষড় 'ক'-এর সবগুলো উপাদান থাকে না বা না দিলেও চলে। অর্থাৎ ষড় 'ক'-এর প্রতিটি উপাদানকে কেন্দ্র করে নয়, একটি মাত্র উপাদানকে গুরুত্ব দিয়েই সংবাদশীর্ষ রচিত হতে পারে।

ষড় 'ক'-এর উপাদানগুলোকে আলাদা আলাদা গুরুত্ব দিয়ে যেমন এক-একটি সংবাদশীর্ষ রচনা করা হয় তেমনি ঘটনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের ওপরও সংবাদশীর্ষ রচিত হয়ে থাকে। তার মানে এই নয় যে, 'স্টাইলভিত্তিক সেই উপাদানগুলোকে সাথে নিয়েই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী একেকটা ভিন্ন স্টাইলে সংবাদশীর্ষ রচিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে যেমন উদ্ধৃতি বা বিবৃতি শীর্ষের উল্লেখ করতে পারি। অর্থাৎ কোন ঘটনা সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কোন বিবৃতি রাখলেন। এটা দুর্নীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কোন বক্তব্যও হতে পারে। তাঁর সেই বিবৃতি উদ্ধৃতি আকারে সূচনার প্রারম্ভে দিয়েই সংবাদ কাহিনীর নির্মাণ কাজ শুরু হতে পারে।

তবে একটা কথা স্মরণযোগ্য, ষড় 'ক' উপাদানভিত্তিক অথবা স্টাইলভিত্তিক বা সুনির্দিষ্ট বিষয়নির্ভর সংবাদসূচনা সকল ক্ষেত্রেই সারাংশ শীর্ষ বা সূচনা তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ কোন ঘটনার মধ্যে ষড় 'ক' এর সবকটি উপাদানকেই সম্বলিত করে সংবাদশীর্ষ রচিত হতে পারে। এই ধরনের সংবাদশীর্ষকে সারমর্ম বা সারাংশ শীর্ষ বলা ছাড়াও A.P. **Lead (Associated Press Lead)** বা **Summary Lead** বলে।

আমরা এখন প্রথমে ষড় 'ক'-এর উপাদানগুলোর একেকটির ওপর গুরুত্ব সম্বলিত (Emphasis) সংবাদশীর্ষ রচনার দৃষ্টান্ত দেখবো। পরে দেখবো স্টাইলভিত্তিক শীর্ষ রচনা।

'ক' শীর্ষ

'গতকাল সিসেলস দ্বীপে এক প্রমোদবিহারের সময় পা পিছলে অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের বাম পা মচকে গেছে।'

'গতকাল টোকিওতে প্রাক মধ্যাহ্ন-ভোজ সংবাদ ব্রিফিংয়ের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জাপানি প্রধানমন্ত্রীর হাতের ওপর বমি করে দেন।'

'কি' শীর্ষ

'সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত বিয়োগান্তক ঘটনার তদন্ত করার জন্য গতকাল তিন সদস্যের এক তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। গত রোববার বিবদমান দুটি ছাত্রগোষ্ঠীর বন্দুক লড়াইয়ে তিনজন ছাত্র নিহত হয়।'

'দশ দফার দাবিতে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে থাকা ছাত্র ধর্মঘটের নিরসনে সরকার আজ ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় এক বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে।'

'কখন' শীর্ষ

'এখন থেকে শুক্রবারের বদলে রোববার হবে সাপ্তাহিক ছুটির দিন।'

'গতকাল টাঙ্গাইলের শহরতলীর একটি বাড়িতে বাসররাতেই এক বরের মৃত্যু ঘটেছে।'

'কোথায়' শীর্ষ

'ঢাকা অষ্টম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজক হতে চলেছে।'

'পোপ দ্বিতীয় জন পল কিউবায় তার সফর শুরু করেছেন। কট্টর কমিউনিস্ট শাসিত এ দেশে গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজকের এটাই প্রথম সফর।'

'গতকাল থেকে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে সপ্তাহব্যাপী এক ওয়াজ মহফিলের সূচনা হয়েছে।'

'কেন' শীর্ষ

'পনের দিন আগে চাকরি চলে যাওয়ায় তাঁর বিয়েও স্থগিত হয়ে যায়। এলিফ্যান্ট রোডের ২৫ বছরের যুবক আবদুল হাই মনের দুঃখে তাই গতকাল সন্ধ্যায় বিয়ের বদলে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।'

'দেশী শিল্পের চাহিদা ও প্রসার বাড়াতে সরকার আমদানিকৃত পোশাক সামগ্রীর ওপর ৫ শতাংশ কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'কিভাবে' শীর্ষ

'গতকাল সন্ধ্যায় বগুড়া থেকে ঢাকা আসার পথে নগরবাড়ি ফেরিঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় চিত্র পরিচালক আলমগীর কবিরের বহনকারী কারটি যমুনা নদীতে ডুবে গেলে সবার চোখের সামনে একজন চিত্রনায়িকাসহ তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।'

'গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাত্র দুই টাকার জন্য একই ক্লাসের ছাত্র এক বন্ধুর ঘুসিতে আরেক বন্ধু খুন হয়েছে।'

'গতকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি গ্রামে গলায় কৈ মাছ আটকে দশ বছরের একটি বালকের মৃত্যু ঘটেছে।'

ষড় 'ক'-এর বিভিন্ন উপাদানকে গুরুত্ব দিয়ে একেটি ভিন্ন মেজাজের সংবাদ শীর্ষের ধরন আমরা এখানে দেখলাম। ওই সংবাদশীর্ষগুলোতে ষড় 'ক'-এর অন্যান্য উপাদানও স্থান পেয়েছে।

এখন আমরা কোন সংবাদ উপযোগী ঘটনার নিজস্ব আঙ্গিকের প্রেক্ষাপটে স্টাইলভিত্তিক সংবাদশীর্ষের কতকগুলো উদাহরণ দেখবো।

সারমর্ম বা সারাংশ শীর্ষ

'দীর্ঘদিন বিচার বিবেচনার পর সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত সংস্থাপনমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী কাল অব্যাহতি দিয়েছেন।'

এই সংবাদশীর্ষটিতে একটি ঘটনার পুরোচিত্র ফুটে উঠেছে। একটা বিষয় সম্পর্কে পাঠকের যা যা প্রশ্ন তার সবকটির উত্তরই এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেয়া হয়েছে। সারমর্মভিত্তিক সংবাদ সূচনায় সংবাদ বিষয় সম্পর্কে সবকটি কথাই এতে স্থান পায়।

উল্টো পিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লিখনের জন্য এই ধরনের সংবাদশীর্ষ রচনা খুবই সুবিধাজনক।

এ ধরনের সংবাদ সূচনা তৈরি করতে গিয়ে রিপোর্টারকে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে হয় বিধায় পাঠক অনেক সময় বিভ্রান্ত হতে পারেন। আবার ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ না হলে পাঠক ওই ঘটনার সংক্ষিপ্ত সারটুকু পড়েই ক্ষান্ত দিতে পারেন। তবে একথা ঠিক এ ধরনের সংবাদশীর্ষই অধিকাংশ সংবাদ রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বর্ণনামূলক সংবাদশীর্ষ

নিহত ছাত্র-কর্মচারীদের মা-বাবা, ভাই-বোনদের আহাজারির সাথে প্রকৃতিও যেন শামিল হয়েছিল। সকাল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। দুপুর থেকেই জগন্নাথ হলের শহীদ মিনারের পাদদেশ থেকে নিহতদের কফিন যখন তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল, তখন তাঁদের স্বজনেরা চীৎকার করে কাঁদলেও সহপাঠী ও হলসাথিরা বুকে শোকের পাথর চেপে মৃতবন্ধুদের সৎগতির ব্যবস্থা করছিল।'

এ ধরনের সংবাদ শীর্ষের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিস্থিতির একটা জীবন্ত রূপের বর্ণনা দিয়ে পাঠককে সেখানে হাজির করা। এ ধরনের বিবরণীধর্মী সংবাদ সূচনা সাধারণত বড় কোন ঘটনার খবরের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিপূরক খবরের (Side bar) বর্ণনা দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সংবাদে যখন বিশেষভাবে কোন পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন থাকে কিংবা সংবাদের বিষয়বস্তুর কারণেই যেখানে বর্ণনার প্রয়োজন আছে সেখানেই এ ধরনের সংবাদশীর্ষ ব্যবহার করা যায়। এটা একটু ফিচারধর্মী। তবে বর্ণনায় খুব বেশি রূপক বা বিশেষণের প্রয়োজন নেই। পুরো পরিস্থিতি তার নিজস্ব মেজাজের কারণেই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। বর্ণনা তার আপনগতিতে এগিয়ে চলে।

বুলেট বা কার্তুজ সংবাদশীর্ষ

'ইন্দিরা গান্ধী নিহত'
'ইরাকের কুয়েত গ্রাস'
'বেনজীর সরকার বরখাস্ত'

এ ধরনের সংবাদশীর্ষ খুবই ছোট বাক্যে গঠিত। কিন্তু সেই ছোট ছোট বাক্যেরই এত জোর যে তা হৃদয়ে গিয়ে বিঁধে। প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু কিছু ঘটনা আছে যার প্রতিক্রিয়া পাঠকের ওপর তীব্র হয়। গগণবিদারী এই প্রতিক্রিয়াটিকে বুলেট বা কার্তুজের প্রচণ্ড আঘাত বা বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই ধরনের সংবাদ

ঘটনার যে প্রচণ্ড নাটকীয়তা ও আবেগ থাকে তা মানুষের সংবেদনশীল অনুভূতিগুলোতে প্রচণ্ড নাড়া দেয়।

কার্তুজ বা বুলেট সূচনা সাধারণত ব্যবহার করা হয় কোন খ্যাতিমান ব্যক্তি বা রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যু, কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা কিংবা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে নাড়া দেয় এমন সব ঘটনার ক্ষেত্রে। একজন বিশ্বনেতার মৃত্যুর বিবরণী দেয়ার বদলে সরাসরি তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে।

দু'চারটি শব্দের এ ধরনের শীর্ষ তৈরি হয় বলে এর ব্যবহার কম। এর গঠন প্রকৃতি শিরোনামের কাছাকাছি। তবে এ ধরনের সংবাদশীর্ষ লেখার সুযোগ সাংবাদিকদের কাছে দু-চারবারই আসে। তবে রেডিও-টিভিতে এ ধরনের বুলেটিন বারবার প্রচারিত হলে পরদিন সংবাদপত্রে এ ধরনের সংবাদশীর্ষ করার উপযোগিতা থাকে না। তখন করতে হয় বর্ণনাধর্মী।

স্ট্যাকাটো (Staccato) সংবাদশীর্ষ

'হঠাৎ গুলির আওয়াজ। সাই সাই। বুম বুম ..... ফটাস্। বহু কণ্ঠের চীৎকার! গুঞ্জন! মানুষগুলো এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে, পায়ের নিচে পিষ্ট হচ্ছে কেউ। হঠাৎ দেখলাম গায়ে রক্তমাখা সিনেটর কেনেডি পড়ে যাচ্ছেন। কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। কেউ একজন তাঁকে ধরে ফেললো। ততক্ষণে নিশ্চিন্ত জেনে গেছি কেনেডি মারা গেছেন...।'

প্রিয় পাঠক, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ছোট ভাই এবং ১৯৬৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের পদপ্রার্থী সিনেটর রবার্ট কেনেডি যেদিন আততায়ীর গুলিতে মারা যান সেদিন 'নিউ জার্নালিজমের' অন্যতম পথিকৃৎ পিট হ্যামিলটন 'ভিলেজ ভয়েস' পত্রিকায় সেই মৃত্যুদৃশ্যের যে বর্ণনাটি দিয়েছিলেন তারই একটি প্রায় কাল্পনিক বাংলারূপ এখানে উদ্ধৃত হলো যা স্ট্যাকাটো সূচনার একটি আদল। ইংরেজি 'Staccato' শব্দটির অর্থ হলো আলাদা কিন্তু স্পষ্ট ধ্বনি। অর্থাৎ ছোট ছোট বাক্যে কাটা কাটা করে বলার ধরনটিকেই স্ট্যাকাটো সংবাদশীর্ষ বলে। এতে এক ধরনের মেজাজ সৃষ্টিকারী ছন্দ থাকে। এই ধরনের সংবাদ শীর্ষে নাটকীয়তা থাকে এবং তা মূলত বর্ণনাধর্মী।

উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদশীর্ষ

'আবাহনীতে আমার প্রয়োজন বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে।'

ঢাকা ফুটবল লীগে চলতি দল বদলের চূড়ান্ত পর্যায়েও আবাহনীর কর্মকর্তারা দলে থাকা না থাকা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন কথা না বলায় দেশের সেরা স্ট্রাইকার শেখ আসলাম গতকাল ওই মন্তব্য করেন।

এই ধরনের সংবাদশীর্ষের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উদ্ধৃত একটি 'শ্লেষ' বা 'বিবৃতির' মধ্য দিয়ে শুরু হয়। বক্তার উদ্ধৃত সেই কথায় এক ধরনের ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য বা শ্লেষ থাকে। তবে এই ধরনের ছোট কিন্তু আকর্ষণীয় ও উদ্দীপ্ত সংবাদশীর্ষ পাঠককে সংবাদের বাকি অংশ পড়তেও দারুণ আগ্রহী করে তোলে। তবে এ ধরনের সংবাদ সূচনা খুব বেশি লেখা হয় না, কারণ এগুলো লেখা খুব সহজ এবং সাংবাদিকের জন্য দায়সারার মতো এক সহজ পন্থা। তবে সংবাদ গল্পটির রসোপলব্ধিতে যদি এ ধরনের সংবাদশীর্ষ রচিত হবার দাবি রাখে তখন এ ধরনের সংবাদশীর্ষ লেখা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

প্রশ্নবোধক সংবাদশীর্ষ

'ছাত্রদের দশ দফা দাবির প্রতি অটল থাকা কি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল ? সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন থেকে জনাব আলী বহিষ্কৃত হওয়ায় আজ অনেকের মনেই এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।'

কোন সংবাদপত্র সংগঠন যদি কোন বিতর্কিত বিষয়কে আরো চাঙ্গা করতে চায় কিংবা কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূচনা করতে চায় কিংবা কোন বিষয়ে পাঠকের ঔৎসুক্য বাড়াতে চায় তাহলে তারা এ ধরনের সংবাদশীর্ষ তৈরি করতে পারে। তবে এ ধরনের সংবাদশীর্ষ সাধারণত রাজনৈতিক বিষয়ের জন্যই সবচেয়ে উপযোগী। অবশ্য এ ধরনের সংবাদশীর্ষে মন্তব্যধর্মী ভাব থাকে বিধায় আদর্শ সংবাদপত্রগুলো সচরাচর এ ধরনের সংবাদশীর্ষ লেখে না। তবে এর পেছনে যদি কোন গঠনমূলক দিক ও রাষ্ট্রীয় সুস্বার্থ লুকিয়ে থাকে তাহলে তা করা উচিত। অবশ্য যে ধরনের সংবাদগল্পের সঙ্গে এই ধরনের সংবাদশীর্ষ যুতসই সেখানেই এটা ব্যবহার করা উচিত। এধরনের সংবাদশীর্ষে প্রশ্নের পাশাপাশি উত্তর দেয়ার ব্যবস্থা অর্থাৎ কথোপকথন স্টাইলেও সংবাদশীর্ষ তৈরি করা যায়।

সংলাপ সংবাদশীর্ষ

'সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের নেতা মি. আলী বলেছেন, ছাত্রদের দশ দফা দাবির ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ছাত্র বিষয়ক

উপদেষ্টা মি. রহমান বলেছেন, আপনার বক্তব্য দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল, তাই আপনাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো।'

এ ধরনের সংবাদশীর্ষ একটু ব্যতিক্রমী। এর ব্যবহার সচরাচর হয় না। উল্লিখিত ধরনের সংবাদগল্পের মূল কথাটি সংলাপের মাধ্যমে পাঠকের কাছে খুব সহসাই পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের সংবাদশীর্ষ রুটিন মাফিক অন্যান্য সংবাদশীর্ষের মতো নয়। তবে বিষয় উপযোগী ঘটনার ক্ষেত্রে এ ধরনের সংবাদশীর্ষের আবেদন খুবই কার্যকর।

অলংকার বা রূপকধর্মী সংবাদশীর্ষ

'দল বদলের শেষ বেলায় যখন কোন ছোট দল নয়, মোহামেডানের মতো খোদ বড় দল সবাইকে চমকে দিয়ে আসলামকে লুফে নিলো তখন আবাহনীর অনেক সমর্থকেরই মনে হয়েছে, আসলাম বোধহয় দলের জন্য বোঝা ছিলেন না।'

কবি সাহিত্যিকরা যেমন করে তাদের লেখায় ভাব প্রকাশের জন্য যে অলংকার বা ভাষাগত রূপক ব্যবহার করে একটা বিশেষ ছবি তুলে ধরেন অলংকার বা রূপকধর্মী সংবাদশীর্ষের মাধ্যমেও একজন সাংবাদিক তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে 'শেষ বেলা', 'খোদ', 'চমকে', 'লুফে', 'বোঝা' হচ্ছে সেই রূপকধর্মী ভাষা। এই ধরনের সংবাদশীর্ষ একটু সুষ্ঠু ধারা বিবর্জিত হলেও কিছু কিছু সময় তা বেশ ভালো লাগে। এ ধরনের সংবাদশীর্ষে বিবৃতি বা উদ্ধৃতিমূলক সংবাদশীর্ষের ধাঁচও এসে যায় কোন কোন সময়।

বিষয় বা পরিস্থিতিনির্ভর স্টাইলভিত্তিক সংবাদশীর্ষসমূহের মধ্যে এগুলোই প্রধান। তবে আরো দুয়েকটি সংবাদশীর্ষ রয়েছে। যেগুলো এর মধ্যে পড়ে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'প্রত্যক্ষ আবেদন শীর্ষ', 'রুদ্ধ কৌতূহল শীর্ষ', 'চমক শীর্ষ' প্রভৃতি। যে ধরনের সংবাদশীর্ষের মাধ্যমে পাঠকের মানবিক আবেদন বোধকে জাগিয়ে তোলা হয় সেটাই 'প্রত্যক্ষ আবেদন শীর্ষ'। আবার এমন কিছু কথা সংবাদবিবরণীর শুরুতেই দিয়ে দেয়া হলো যা পাঠকের কৌতূহল দারুণভাবে বাড়িয়ে দেয়। এ ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী সংবাদ শীর্ষের নাম 'রুদ্ধ কৌতূহল সংবাদশীর্ষ'। আবার এমন কিছু বিস্ময়কর বা পিলে চমকানো কথাবার্তার সংবাদশীর্ষ তৈরি হয় যা 'চমক শীর্ষ' নামে পরিচিত। যে সকল সম্পাদক সাধারণত চমক বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে চান তারাই এ ধরনের সংবাদশীর্ষ ব্যবহার করে থাকেন।

সংবাদশীর্ষ নিয়ে আরো কিছু কথা

সংবাদ গল্পের শুরুতেই সংবাদশীর্ষের স্থান। সংবাদশীর্ষের এই কৌশলগত দিকটি যদি না থাকে তবে কোন সংবাদ গল্প হয়ে পড়বে এমন একটি উপাখ্যান বা কল্পকাহিনী - যে উপাখ্যান বা কল্পকাহিনীর লেখক তার গল্পাংশের জন্য যে কোন জায়গা থেকে শুরু করতে পারেন। ফিচারের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়।

কিন্তু সংবাদ সূচনার মধ্য দিয়ে একজন সংবাদগল্প লেখক প্রাপ্ত জরুরি তথ্যগুলো দিয়ে তার পাঠককে ধরে রাখতে পারেন। সংবাদশীর্ষ হচ্ছে সংবাদ গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথম অনুচ্ছেদে একটি মাত্র বাক্য, এমনকি একটি মাত্র লাইনের মধ্য দিয়েই সাংবাদিক তাঁর পাঠককে ধরে রাখতে পারেন। আর এ সংক্রান্ত গুণাবলীর অভাবে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক তাঁর পাঠককে ধরে নাও রাখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সংবাদশীর্ষ হচ্ছে সংবাদ লেখকের প্রদর্শন বাক্স (Show Case)। যেখানে তিনি তার শ্রেষ্ঠতর গুণাবলী সমৃদ্ধ কাজগুলোর প্রদর্শন করতে পারেন। পাঠক এবং সম্পাদকগণ যদি বোঝেন যে সংবাদলেখক তাঁর লেখায় 'মান' বজায় রাখতে পারছেন না তাহলে তাঁর পক্ষে শীর্ষস্থানে ও শীর্ষমানে পৌঁছানো দুরূহ।

সংবাদ পাঠককে সংবাদ পাঠে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে। একটা চোখ জুড়ানো বা চোখ ধাঁধানো শিরোনাম দিয়ে পাঠককে পয়লাই আকৃষ্ট করা। আর সেই শিরোনাম দেখে পাঠক যখন সংবাদগল্প পাঠে মনোনিবেশ করে যাতে খুব সহসাই চোখ উঠিয়ে না নেয় তার জন্য সুন্দর করে সংবাদশীর্ষ লেখার বা সাজানোর ওপর সংশ্লিষ্ট সংবাদলেখকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

অভিজ্ঞ রিপোর্টার বা সংবাদ লেখক দু-তিনবার চেষ্টার পর ভালো একটি সংবাদশীর্ষ তৈরি করেন। অনেকবার লেখার পরই হয়তো একটি লেখা তাকে সন্তুষ্ট করে। তার মনে হয়, এটাই যথোচিত হয়েছে। তবে একটু চিন্তা করে লিখলে অভিজ্ঞ লেখকের ক্ষেত্রে প্রথমবারেই বাজিমাত। অবশ্য একটা নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য। সংবাদশীর্ষটি সুন্দর হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি তা লিখুন, আবার লিখুন, পরিমার্জন করুন, আবার লিখুন।

সংবাদশীর্ষ একটি সংবাদ গল্প বিস্তৃত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথম বাক্যটি হবে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত। কারণ একটি অর্থবহ সংক্ষিপ্ত বাক্যের কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে সংবাদ গল্পটি কেমন হবে। সংবাদ লেখক তার সংবাদশীর্ষের ওই

স্বল্পপরিসরেই কোন ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় দান করে। কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা সম্পদের মালিকের নামধাম দেয়। প্রকৃতপক্ষে সংবাদশীর্ষ গল্পের স্থিরতা ঠিক করে। সংবাদশীর্ষ পাঠককে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রদান করে। ভালো সংবাদ সূচনা পাঠককে শুধুমাত্র পরিতৃপ্ত করে না বরং আরো পড়ার ক্ষুধাটাকে বাড়িয়ে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে আবারো বলা যায় সংবাদশীর্ষ চারটি উদ্দেশ্য সাধন করে।

এক. সংবাদশীর্ষ গল্পের সারমর্ম বা মূল কথা সম্পর্কে পাঠককে জানিয়ে দেয়। অর্থাৎ সংবাদ গল্পে কি আছে তা পাঠককে সংক্ষেপে বলে দেয়া।

দুই. পুরো গল্প পাঠে পাঠককে আকৃষ্ট করা। অন্য কথায় পাঠকের মাঝে পুরো সংবাদ বিবরণী পড়ার ইচ্ছাকে জাগ্রত করা।

তিন. ঘটনাটা পাঠককে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেখানোর চেষ্টাও সংবাদগল্পের একটা উদ্দেশ্য এবং

চার. যদি পাঠকের একটা আবছায়া পড়ার ইচ্ছা বা ভাব থাকে তবে সেই আবছায়া ইচ্ছা বা ভাবকে প্রকৃত ইচ্ছা বা ভাবে পরিণত করা।

সংবাদবিবরণীর নির্মাণ কাঠামো

পত্রিকার পাতায় চোখ মেলেই পাঠক বিভিন্ন খবরের শিরোনাম পড়েন। এর মধ্যেই কোনটাতে তার চোখ আটকে যায়। তার তখন মনে হয়, এই বিশেষ সংবাদ কাহিনীতে নিশ্চয়ই কিছু আছে। তখন তিনি সংবাদ কাহিনীটির শীর্ষে মনোসংযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

প্রথম একটি কিংবা দুটি অনুচ্ছেদেই সংবাদশীর্ষ লেখা হয়ে থাকে এবং তাতে খবরের মূল ভাবটি বর্ণিত থাকে। এই একটি বা দুটি অনুচ্ছেদ পড়েই পাঠক সংবাদের বাকি অংশ পড়তে আগ্রহী হন অথবা হন না। কিন্তু পাঠক যাতে সংবাদের বাকি অংশও পড়েন তার জন্য সংবাদ লেখক পর্যায়ক্রমিকভাবে তাঁর সংবাদ কাহিনীর কাঠামো নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর সংবাদ কাহিনীর জন্য প্রথমেই অর্থাৎ সংবাদশীর্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিষয় বাছাই করে নেন। তারপর পর্যায়ক্রমে ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে ঘটনাটির বিশদ বিবরণ সাজিয়ে যান এবং এভাবে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণীর মধ্য দিয়ে সংবাদ কাহিনী বা রিপোর্টের পরিসমাপ্তি ঘটে। এটাকে বলে Descending order of importance। অর্থাৎ ঘটনার তথ্যগুলো গুরুত্বের ক্রমাবনতি অনুসারে সাজানো হয়। যেখানে শীর্ষে থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিচে

থাকে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সংবাদমূল্য বা গুরুত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সংবাদ কাহিনীটি একটি নকশার ছকে বা মডেলের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত একটি উল্টো পিরামিডের আকৃতি ধারণ করে।

একজন রিপোর্টার সংবাদ কাহিনীর অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদানের জন্য সবচেয়ে বেশি জায়গা বরাদ্দ করেন এবং সেটুকুর প্রদর্শনও হয় বেশি। তারচেয়ে একটু কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের স্থান ও প্রদর্শন স্বাভাবিকভাবেই একটু কমই মেলে। এইভাবে কাহিনীটি উল্টো পিরামিডের শীর্ষে গিয়ে শেষ হয়—যেখানে স্থান পায় সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শেষের দিকে এমন দু'একটি অনুচ্ছেদ থাকে যাকে মেকআপ সম্পাদক তাঁর পৃষ্ঠা সাজানোর স্বার্থে অবলীলায় কেটে বাদ দিতে পারেন। এই প্রেক্ষাপটে উল্টো পিরামিড আকারে সংবাদ কাহিনী নির্মাণের কৌশলটির অপরিসীম মূল্য রয়েছে মেকআপ সম্পাদকের কাছে।

উল্টো পিরামিড কাঠামোয় সংবাদ কাহিনী নির্মাণের ছক নিম্নরূপ :

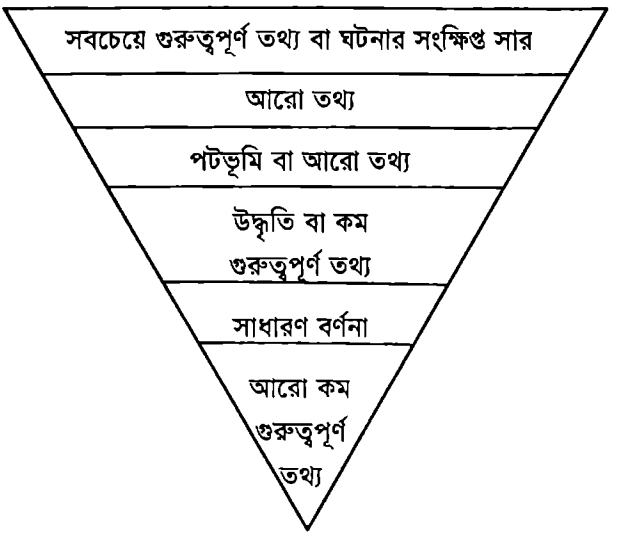

এই কাঠামোটাকে আরো সহজভাবে দেখানো যেতে পারে :

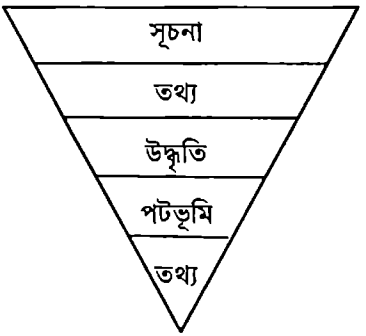

দুটো কাঠামোয় বর্ণিত বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী এবং স্তরে বর্ণিত দিক-নির্দেশিকা অনুযায়ী একজন রিপোর্টার তার সংবাদবিবরণী তৈরি করতে পারেন। তবে এগুলোর ব্যবহার রিপোর্টার বা সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের রিপোর্ট বা সংবাদ কাহিনীর ওপর কিংবা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে। অবশ্য একটি সাধারণ সংবাদ রিপোর্টের কাঠামো কিভাবে নির্মাণ করা উচিত ওপরের দুটো কাঠামো তার একটা কল্পনা মাত্র। তবে এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, পিরামিডের ভিত্তি যেমন পুরো কাঠামোকে ধরে রাখে এখানেও সেই ভিত্তিটি পুরো সংবাদবিবরণীর বাঁধনটাকে ধরে রাখে। আর যেহেতু সংবাদের মূল ভিত্তিটি পিরামিড কাঠামোর ভিত্তিতে অবস্থিত সেইজন্য তা উল্টোভাবে আসছে। সেই উল্টো পিরামিডের মূল ভিত্তি থেকে নিচের দিকে যখন সংবাদের পর্যায়ক্রমিক অংশটি স্থান পায় তখন তা ক্রমশ গুরুত্বের দিক থেকেও ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

সংবাদপত্রে যে সবসময় উল্টো পিরামিড কাঠামোতেই সংবাদ বা এতদসংশ্লিষ্ট রচনা নির্মিত হয় তা নয়। ঘটনানুক্রমিক গঠন (Chronological pattern) অনুযায়ীও সংবাদ বর্ণনা করা যেতে পারে। তবে সেটা হবে ফিচারধর্মী কাহিনী। অর্থাৎ একটি সূত্র বা পর্যায় (সেটি মূল ভাব নয়) থেকে শুরু হয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি ক্রমশ বিশাল হতে থাকে। এভাবে একটি সংবাদ কাহিনীর বর্ণনাকে চিন্তা করলে তা একটি পিরামিডের আকার ধারণ করে।

সংবাদ কাহিনীর ঘটনানুক্রমিক ধরনটি নিম্নরূপ—

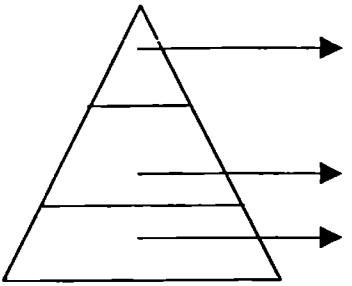

কতকগুলো সংবাদ কাহিনীর ক্ষেত্রে আজকাল সনাতনী বা চিরাচরিত পদ্ধতির 'উল্টো পিরামিড' বা 'ঘটনানুক্রমিক' ধারার একটি মিশ্ররূপের বহুল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এই ধাঁচের সংবাদ কাহিনীর সংবাদশীর্ষ হয় চূড়ান্ত পরিণতিমূলক (Climactic Lead)। এ সংক্রান্ত সংবাদ কাঠামো চিন্তা করলে তা কোন পিরামিডের মাথায় একটি বিমের মতো আকার ধারণ করে। অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতিমূলক শীর্ষের ব্যাপারটি হচ্ছে, যে পিরামিডের শীর্ষে সংবাদ কাহিনীর সর্বশেষ পরিস্থিতি বা তথ্য দেয়া হয়। এই সংবাদশীর্ষ দেয়ার পর ঘটনার সময়ানুক্রমিক সরল আখ্যান দিয়ে কাহিনী গড়ে তোলা হয়। সেই সরল আখ্যানটি পিরামিডের পুরো অংশ জুড়ে থাকে। এ ধরনের সংবাদ কাহিনীর কাঠামো নিম্নরূপ:

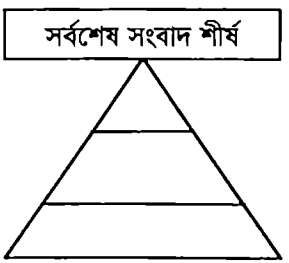

উল্টো পিরামিড কাঠামোর সুবিধা

কাউকে যদি প্রচলিত বা চিরাচরিত সংবাদগল্পের রেখাচিত্র অঙ্কন করতে বলা হয় তাহলে তিনি নিশ্চিতরূপেই উল্টো পিরামিড কাঠামোর কথাই বলবেন যার প্রশস্ত ভাগ (যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে) হবে উপরের দিকে এবং অবশিষ্টাংশ ক্রমশ নিচের দিকে সরু হয়ে যেতে থাকে। সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উল্টো

পিরামিডের নিচের দিকেই বর্ণিত হয়। উল্টো পিরামিডের এই বলার ধরনটি থেকে কমপক্ষে চারজন লোক উপকৃত হয়।

এক. একজন রিপোর্টার, যিনি কোন সংবাদ ঘটনা লিখছেন, তিনি খুব শীঘ্রই এই কাঠামোর বিন্যাসে তার গল্পে সংঘটিত ঘটনার সব কিছুই পরিমার্জিত রূপে গেঁথে দিতে পারেন। অর্থাৎ ওই কাঠামোর মাধ্যমে একজন রিপোর্টারের পক্ষে একটি সংবাদ কাঠামো দাঁড় করানো খুব সহজ।

দুই. কপি সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক, যিনি শিরোনাম লিখে থাকেন, পয়লা একটা দুটো অনুচ্ছেদ থেকেই তার জন্য জরুরি সত্যনিষ্ঠ তথ্যগুলো পেয়ে যান, তাকে পুরো ঘটনা পড়তে হয় না। প্রথম দু-এক অনুচ্ছেদ পড়েই তিনি যথাযথ শিরোনাম এবং সংবাদগল্পের অবস্থান ও মর্যাদা (Treatment) দিয়ে দিতে পারেন।

তিন. মেকআপ সম্পাদক, যিনি কোন গল্প কাটছাঁট ও সংক্ষিপ্ত করে তাঁর পত্রিকার জন্য লভ্য অংশের বাইরের ম্যাটার মেকআপের স্বার্থে কেটে বাদ দিয়ে দিতে পারেন।

চার. কোন কোন সময় কোন পাঠক মাত্র একনজর চোখ বুলিয়েই তাঁর পত্রিকা পড়া শেষ করেন। আজকের জীবনযন্ত্রণার যুগে অধিকাংশ পাঠকই প্রায়শই কর্মব্যস্ত থাকেন। ফলে পত্রিকা পড়া শুরু করতেই তাঁদের পড়া শেষ হয়ে যায় অনেক সময়, সম্পাদকগণ এটা খুব ভালোভাবেই জানেন। আর তাই তিনি পাঠকদের দ্রুত ও সহজতর খবর উপভোগের জন্য সংবাদগল্পের শুরুতেই তাঁর সার কথাটি দিয়ে দেন। ম্যাগাজিন সম্পাদকরা জানেন যে তাঁদের ম্যাগাজিনের কথকতা পাঠকরা বেশ সময় নিয়েই পড়েন বা পড়া শেষ করেন। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকরা জানেন তাঁর পাঠকরা পুরো পত্রিকা বা পুরো সংবাদগল্প অনেক সময়ই পড়েন না। ফলে উল্টো পিরামিড কাঠামোর প্রথম দু-এক অংশ পড়েই পাঠক একঅর্থে পুরো সংবাদ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন।

সংবাদ লেখার কৌশল

আমরা এতক্ষণ সংবাদশীর্ষ ও সংবাদ কাঠামো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। পন্থা-পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছি। তাহলে নিশ্চয়ই এখন সংবাদ লিখতে আর কোন অসুবিধা হবে না। একটা ভালো সংবাদশীর্ষ লিখে এবং কাঠামোর মধ্যে কায়দামতো অন্যান্য বিষয়কে বসিতে দিতে পারলে কোন সংবাদ কাহিনীর অবয়বটা নিশ্চিতরূপে দাঁড়িয়ে যাবে। তবে সংবাদ কাঠামোয় শব্দের মালা গেঁথে সংবাদটিকে আকর্ষণীয়, সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করে লিখতে হলে সংবাদ লেখককে অবশ্যই কতকগুলো বিষয় মনে রাখতে হবে। আগের কথার পুনরুক্তি করে বলা যায়, সংবাদ লেখার মৌল ও একমাত্র ফর্মুলা হলো 'সহজ করে লেখা'।

এই সহজ সরল করে লেখার জন্য কতগুলো কৌশল মনে রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এ কৌশল নয়, কতকগুলো মনে রাখার বিষয় মাত্র। ওই মনে রাখার বিষয়গুলো মাথায় থাকলে সংবাদ কাহিনী লেখা খুবই সহজ হয়ে যায়। সেসব মনে রাখার বিষয় হলো:

এক. ঘটনার পুরো চিত্র না বোঝা পর্যন্ত লেখায় হাত দিতে নেই।

যে বিষয় সম্পর্কে একজন সংবাদ লেখক লিখতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে যদি তাঁর স্পষ্ট ধারণা না থাকে তবে সেই বিষয় নিয়ে তাঁর কোনক্রমেই লেখা উচিত নয়। যে ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক লিখতে চাচ্ছেন, সে সম্পর্কে পাঠকের যতগুলো প্রশ্ন আসতে পারে তার সবগুলোর উত্তর জেনেই সংবাদ লেখকের সংবাদ লেখায় হাত দেয়া উচিত। সংবাদপত্রে যা লেখা হয় সে সম্পর্কে মানুষের একটি অতিরঞ্জিত ধারণা (Exaggerated notion) আছে। অর্থাৎ সংবাদপত্রে যা লেখা হয় তা প্রায় ঈশ্বরে বিশ্বাসের নামান্তর। সাংবাদিকের একটা ভুল পাঠকরা বিরাট করে দেখে। আবার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যাওয়া সাংবাদিকের একটা ভুলকেও পাঠক সঠিক বলে মনে করে। তাই কোন ঘটনার আদ্যোপ্রান্ত জেনেই কেবল তাঁর লেখায় হাত দিতে হয়। কোন সাংবাদিকের ক্ষণিকের ভুলে তাঁর সংগঠন এমনকি রাষ্ট্রেরও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

দুই. কী বলতে চান তা জানার আগে লেখা উচিত নয়। সংঘটিত সংবাদ ঘটনাটির চিত্র বোঝার পরও সংবাদ লেখককে নিজে নিজেই ঠিক করে নিতে হবে আসলে তিনি কী বলতে চান। কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে চান, সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় বা ঘটনার বিষয়বস্তু ও তার মাত্রা এবং সে প্রেক্ষাপটে পাঠকের দিকটি বিবেচনা করে তিনি তাঁর লেখার পরিমিতি ও স্টাইল নির্ধারণ করবেন। কিন্তু পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী ও বিবেকবান লেখক না হলে তা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘটনার মধ্যকার উপাদানগুলোর আপেক্ষিকতা বিচার করতে না পারলে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে লেখা সম্ভব নয়। স্বচ্ছ চিন্তা করুন, কী লিখবেন সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হোন। কারণ পরিচ্ছন্ন লেখা পরিচ্ছন্ন চিন্তারই ফসল।

তিন. স্রেফ প্রকাশের জন্য লিখুন, মোহিত করার জন্য নয়: কোন ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকের কাছে সাধারণত একাধিক তথ্য থাকে। সেই তথ্যগুলোর প্রধান দুটো তিনটিকে প্রাধান্য দিয়েই সংবাদ লেখক খুব দ্রুত সংক্ষিপ্তাকারে ও সহজবোধ্য করে লিখে তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন। আবারও সেই সহজ করে লেখার কথা এসে যায়। নবীন লেখকরা 'পাঠকদের তাক লাগিয়ে' দেয়ার মানসে দুর্বোধ্য শব্দ, দীর্ঘ ও জটিল বাক্য লিখে বাহাদুরি প্রকাশ করতে চান। সহজ করে লেখার পরামর্শকে ভুলে

যান। ফলে যোগাযোগ স্থাপনে তিনি ব্যর্থ হন। পাঠক তো তখন মোহিত হনই না বরং বিরক্ত হন। তবে পাঠকের আগে বেশি বিরক্ত হন তাঁর সম্পাদক বা ডেস্কের সহ-সম্পাদকেরা— যাঁরা কপির মানোন্নয়ন করেন এবং শিরোনাম লেখা কপি প্রেসে পাঠিয়ে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। দুর্বোধ্য ভাষায় লিখতে গিয়ে, সংবাদ লেখক বা রিপোর্টার নিজেরও যথেষ্ট সময় ও শ্রমের অপচয় করেন, কাগজ কলমেরও অপচয় হয়। একটা কথা সবসময় মনে রাখা উচিত সহজ ভাষায় লিখলে লেখকের মর্যাদা কখনই হানি হয় না বরং বাড়ে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী, সবাইকে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হয়। অতএব সহজ করে লেখা ছাড়া সংবাদ লেখকের আর কোন গত্যন্তর নেই। পাঠক যাতে বুঝতে পারে সেভাবেই লিখুন, তাঁদের মোহিত করার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

চার. যা দেখেছেন কেবল তাই বর্ণনা করুন। কোন সংবাদ উপযোগী ঘটনা যেভাবে ঘটেছে টিক সেভাবেই দেখাতে চেষ্টা করুন। অর্থাৎ কোন ঘটনাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করুন। আপনি যা যা দেখেছেন, হুবহু সেভাবেই লিখুন। ঘটনার গায়ে রং চড়াবার বা কল্পনার আশ্রয় নেয়ার অবকাশ তাঁর নেই। কোন ঘটনার দৃশ্যচিত্র বর্ণনার অধিকারই কেবল তাঁর আছে। সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার কিংবা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলার অবকাশ নেই। (অবশ্য এখানে উল্লেখ্য, ঘটনার হুবহু বর্ণনার ক্ষেত্রে খবরের পেছনের খবর মেলে না, আর সেজন্যই ব্যাখ্যামূলক ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজন হয়। সেটি অবশ্য ভিন্ন বিষয় ও পরিমণ্ডল)।

পাঁচ. কখনো বিচারকের ভূমিকা নেয়া উচিত নয়। কোন বিষয় নিয়েই সংবাদ লেখক বিচারকের ভূমিকা নেবেন না। উল্লেখ্য, সংবাদপত্র যখন বিচারের দায়িত্ব নেয় তখন তাকে Media trial বলে। কোন দুর্ঘটনার দায় তিনি তাৎক্ষণিকভাবেই কারো ওপরে চাপিয়ে দেবেন না। কোন বক্তৃতায় বক্তারা কার হয়ে কোন্ নীতির পক্ষে 'দলাদলি' করলেন সেটা বলাও তাঁর উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত ঘটনার পুরো চিত্র সংশ্লিষ্টজনের অভিজ্ঞতা ও উদ্ধৃতি সহকারে এমনভাবে তুলে ধরবেন যে পাঠক পড়ে নিজেই ধরে নিতে পারবেন কোন্ দুর্ঘটনার জন্যে কারা দায়ী অথবা কোন্ সেমিনারে বক্তারা কোন আদর্শের কথা বলছেন, কার সপক্ষে সাফাই গাইছেন। সাংবাদিক সত্যনিষ্ঠতার পুজারী, তিনি সত্যের পক্ষে কথা বলেন, সেজন্য তথ্যের বিশুদ্ধতা তাকে বজায় রাখতেই হয়।

ছয়. এমন কিছু লিখবেন না যা আপনি স্পষ্ট জানেন না। কোন সংবাদ ঘটনা কভার করতে গিয়ে একজন সংবাদ লেখক বা রিপোর্টার সেই ঘটনার সব কিছুই জেনে আসতে পারবেন এমন নয়। আবার এমনও হতে পারে, সংবাদ লিখতে গিয়ে মাথায়

এমন দুয়েকটি প্রশ্ন জাগলো যার উত্তর আপনার কাছে স্পষ্ট নেই। অথচ আপনার খুব ইচ্ছা ওই বিষয়গুলোকে তুলে ধরার। কিন্তু আপনি নিজেই যেখানে নিশ্চিত নন, সেখানে পাঠককে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলবেন না। কোন সংবাদবিবরণী পড়ে পাঠকের মনে বহু প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে। সেগুলোর উত্তরের দায় আপনার। কিন্তু সম্ভাব্য সেসব প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে মজুদ না থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'Ommission is better than commission', অর্থাৎ কোন কিছু নিজের কাছে স্পষ্ট না হলে, কোন তথ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকলে তা চালিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির বদলে তা বর্জন করাই শ্রেয়। ইংরেজিতে আরেকটি প্রবচন আছে- when in doubt, leave it out. অর্থাৎ সংশয় হলে তা বর্জন করাই শ্রেয়। এর বিপরীত ধারায় আজকাল সাংবাদিকতায় আরেকটি প্রবচন বলা হচ্ছে— অর্থাৎ 'When in doubt find it out', কোন কিছু নিয়ে সংশয় দেখা দিলে তা খুঁজে বের করুন। হাতে সময় থাকলে সংশয়ের নিরসন করে তারপর লিখুন।

সাত. সংবাদ বিবরণীতে পরিচিত শব্দ ব্যবহার করুন। তথ্য হচ্ছে রিপোর্টারের কাঁচামাল এবং শব্দ হচ্ছে তার মসলা। শব্দের সেই মসলা দিয়েই তিনি সংবাদ প্রস্তুত করেন। একজন রিপোর্টারের ভাণ্ডারে অজস্র শব্দ মজুদ থাকলেই কেবল তিনি তা থেকে নির্বাচিত শব্দগুলো তুলে নিয়ে তাঁর সংবাদ কাহিনীর গাঁথুনি দিতে পারেন। শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হলে রিপোর্টারের পক্ষে একেকটি সংবাদ ঘটনায় উপযোগী শব্দ চয়ন করে সংবাদবিবরণী তৈরি করা কঠিন নয়। তবে শব্দ চয়নের বিষয়টি সোজা নয়। কারণ সংবাদের ভাষা যেমন, আবার সম্পাদকীয়র ভাষা তেমন নয়। আবার প্রতিটি সংবাদের ক্ষেত্রেই একই ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয় না। লেখার মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তাই সংবাদ লেখককে অবশ্যই হিসেব করে শব্দ চয়ন করতে হবে। যে সকল শব্দের সাথে গড় পাঠকই পরিচিত সেই সকল শব্দই ব্যবহার করতে হবে। পরিচিত শব্দের লেখা হলে পাঠক খুব সহজেই সেই লেখা বুঝতে পারেন। পাশাপাশি লেখক তাঁর সংবাদগল্পে যে বার্তা প্রেরণ করেছেন, সহজ ভাষার কারণে পাঠক তা গ্রহণে সমর্থ হবে, যোগাযোগ সফল হবে। জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়।

কিছু কিছু লোক অপরিচিত শব্দ প্রয়োগ করতে ভালোবাসেন। পেশাগত অবস্থানের কারণেই তাঁরা তা করে থাকেন। এঁদের মধ্যে আমলা, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী প্রমুখ আছেন। এই অপরিচিত শব্দকে বলা হয় jargon (জার্গন)। অন্য অর্থে এ হচ্ছে Technical words, অর্থাৎ যেসব শব্দ অপরিচিত, দুর্বোধ্য ও জটিল। কিন্তু একটা কথা স্মরণীয় যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকেরা বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞানী, আমলা প্রমুখ

যে সকল 'জার্গন' ব্যবহার করেন সে সকল শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা রিপোর্টারকে অবশ্যই দিতে হবে। কোন কোন সংবাদগল্পই আছে যেগুলোতে এই ধরনের জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র কিংবা যন্ত্রকৌশল বিদ্যা বিষয়ক কোন সংবাদবিবরণীতে দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার হতেই পারে। সাংবাদিকের আরেকটি ভূমিকা আছে, কিছু কিছু শব্দকে প্রচলিত করে তোলা এবং তার অর্থগত দিকটিকে ফুটিয়ে তোলা।

আট. জটিল ও দীর্ঘ বাক্য পরিহার করে ছোট বাক্য ব্যবহার করুন।

একটা কথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে, দীর্ঘ বাক্য লেখা হলে প্রায়ই তা ঝুলে পড়ে। অর্থও অস্পষ্ট ও কঠিন হয়ে যায়। অতএব বাক্য ছোট রাখুন। আসলে ছোট ছোট বাক্যে সংবাদ লেখা এখন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। যদিও আমাদের দেশে তার অনুশীলন খুব কম। ছোট ছোট বাক্য লিখলে পড়তে সুবিধা, বুঝতে সুবিধা। শব্দ বেশি হলে এক শব্দের সঙ্গে আরেক শব্দের সম্পর্ক, ব্যঞ্জনা ও অর্থ জটিল হয়ে পড়ে। বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাই, ৮ থেকে ১১ শব্দের তৈরি হলে সে বাক্যের ধরনকে আমরা খুবই সহজ বলে ধরে নেবো। তবে ১৪ বা তার কমের মধ্যে হলে সেই বাক্য মোটামুটি সহজ। ১৭ পর্যন্ত হলেও মোটামুটি সহজ বলেই চালিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু ২১ পর্যন্ত উঠলেই তা কিছুটা জটিল। আর ২১-কে ছাড়িয়ে ২৯ বা ততোধিক শব্দের বাক্যে জটিলতর বা খুবই জটিল বলে বিবেচনা করবো।

নয়. সংবাদ বিবরণীর অনুচ্ছেদসমূহ ছোট ছোট রাখুন।

আমেরিকান সোসাইটি অফ নিউজ পেপার্স এডিটরস-এর সাবেক সভাপতি এডওয়ার্ড মারে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রেস ইন্সটিটিউটে এক প্রশিক্ষণ কোর্সের সময় বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাগুলোতে বিরাট বিরাট সংবাদশীর্ষ এবং বড় বড় অনুচ্ছেদে সংবাদ কাহিনী তৈরি করা হয়'। কিন্তু পাঠকের পড়া ও বোঝার সুবিধার্থে সব সময়ই অনুচ্ছেদ ছোট রাখতে হবে। অনুচ্ছেদ ছোট ছোট করে দিলে অনেকগুলো সুবিধা—

ক. ছোট অনুচ্ছেদ চোখকে আয়েশ দেয়। স্বভাবতই তা পাঠককে ধরে রাখে।

খ. ছোট ছোট অনুচ্ছেদে সংবাদ কাহিনী লেখা হলে সংবাদ লেখক তাঁর সংবাদ ঘটনাকে সুবিন্যস্তভাবে সাজাতে পারেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর চিন্তার ভালো একটা সমন্বয় সাধন করতে পারেন।

গ. ছোট ছোট অনুচ্ছেদে লেখা সংবাদ কাহিনী পাঠক খুব সহজে বুঝতে পারে। বিষয়বস্তুকে দ্রুত নিজের আয়ত্তে আনতে পারে।

দশ. ভাষা ব্যবহারে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন ও স্পষ্টতা দান করুন। ভালো লেখার প্রধান শর্তই হলো পরিচ্ছন্ন করে লেখা এবং স্পষ্ট করে লেখা। এই পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টতা মানে লেখার ভাষাগত পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টতা। ইতর ভাষা ব্যবহার করবেন না, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করবেন না (করলে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন)। অনাহূত শব্দ প্রয়োগ করবেন না, ইচ্ছাকৃতভাবে মানহানিকর শব্দ ব্যবহার করবেন না (এক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও শাস্তিযোগ্য)। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি সব সময়ই নির্ভেজাল ও ঝামেলামুক্ত থাকবেন।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা আনুন। একাত্তরের ৭ মার্চে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর বিশাল জনসভায় লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ হয়েছিল বললে প্রকৃতপক্ষে কত লোক হয়েছিল তা বোঝা যায় না। যদি বলা হয়, ২০ লাখ লোক হয়েছিল তাহলে বিষয়টি সুস্পষ্ট ও পরিমিত হলো।

যদি বলা হয়, লোকটি দুর্ঘটনায় মারা গেছে তাহলে লোকটির মৃত্যুর সঠিক কারণ সুনির্দিষ্ট হলো না। যদি বলা হয়, লোকটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে কিংবা শ্রমিকটি ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে তাহলে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হলো। অকারণে ভাষার অপব্যবহার করা উচিত নয়। অনাহূত বিশেষণ ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকুন।

এগারো. কথোপকথনের ঢঙে আপনার সংবাদগল্প লিখুন।

আমরা যখন একে অপরের সঙ্গে কথা বলি তখন কিন্তু আমরা খুব সোজা করে বলি। বুঝতে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না। একজন রিপোর্টারও যখন কোন সংবাদ ঘটনা নিয়ে তাঁর চিফ রিপোর্টার বা বার্তা সম্পাদকের কাছে বয়ান করেন তখন কিন্তু সোজা করেই বলেন। কিন্তু লিখতে গেলেই বিপত্তি, ভাষার জটিলতা এসে যায়। মুখের ভাষায় লিখতে পারাটা একটা বিরাট গুণ। এ কৌশল একজন সংবাদ লেখককে আয়ত্ত করতেই হবে। মুখের ভাষায় ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে পারলে লেখা খুব সহজ, সরল, অর্থবোধ্য ও সুস্পষ্ট হয়।

সংবাদগল্প লেখার কৌশল সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ কিছু সুনির্দিষ্ট পন্থা পদ্ধতি জানলাম। এছাড়াও আমাদের আরো কতকগুলো টুকটাক বিষয় মনে রাখতে হবে।

আপনার লেখার কেন্দ্রবিন্দু হবে মানুষ। যখনই আপনি লিখবেন তখনই আপনার চোখের সামনে মানুষের অবয়ব ভেসে উঠবে, যে কোন ঘটনার সঙ্গেই মানুষ সংশ্লিষ্ট।

যদি কোন সংবাদ কাহিনীর সঙ্গে মানুষ না থেকে অন্য কোন প্রাণী থাকে সেখানেও কিন্তু পরোক্ষে মানুষ থাকে। কারণ একটি প্রাণীর সুখ দুখের সঙ্গেও চূড়ান্তরূপে সেই মানুষই জড়িত। মূল কথা আপনার লেখায় মানবীয় দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করুন সব সময়।

লেখার সময় পাঠককে কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে আনুন। লেখায় যেন মনে হয় আপনি পাঠককে উদ্দেশ করে বলছেন। এতে পাঠক সংবাদ কাহিনীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেয়।

আপনার লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ উদ্ধৃতির ব্যবহার করুন। সংবাদ কাহিনীর বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি হুবহু দিলে সংবাদগল্প বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও জীবন্ত হয়।

সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে কখনো প্রচারধর্মী হবেন না, সবসময় যোগাযোগধর্মী হবার চেষ্টা করুন। পাঠকের সঙ্গে দেয়া-নেয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হবার চেষ্টা করুন। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সমঝোতা গড়ে তুলুন। নিজেকে আস্থাবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলুন।

শিরোনাম কি

কোন সংবাদবিবরণীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বা মূল কথাকে বা সার কথাকে যে সংক্ষিপ্তাকার রূপ দেয়া হয় তার নাম সংবাদশীর্ষ বা সংবাদ সূচনা। ইংরেজি প্রতিশব্দ যার Intro বা Lead । এই Intro লেখা হয় গড়পড়তা ১৯ থেকে ২৫ শব্দের মধ্যে। আর এই Intro বা Lead-কে আরো সংক্ষিপ্তাকারে করে লেখা হয় অর্থাৎ এক থেকে সর্বোচ্চ ৯ শব্দের মধ্যে এনে যে কথাটি বলা হয় তার নাম হলো শিরোনাম। ইংরেজিতে প্রতিশব্দ যার Headline। সংবাদশীর্ষকে যদি আমরা ইংরেজিতে Lead বা Newslead বলি তাহলে শিরোনামকে আরেকটি ইংরেজি শব্দে বলা হয় Superlead হিসেবে।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতাকে বলা হয় Show Window। সাধারণত দোকানের Show Window হচ্ছে তাই, যেখানে সবচেয়ে ভালো জিনিসগুলো থরে থরে সাজানো থাকে। এসব দেখে ক্রেতা ভিতরে আসে এবং কিনতে আগ্রহী হয়। পত্রিকার প্রথম পাতায় একেক দিনের সেরা সংবাদগুলো সাজানো থাকে এবং শিরোনামগুলো নির্দেশ করে যে এগুলো সেরা সংবাদ। ইংরেজিতে বলা যায় Headlines are the best samples of the best items। কিন্তু একটা কথা ঠিক, বড়ই হোক ছোটই হোক, সেরাই হোক আর নিকৃষ্টই হোক সব সংবাদ কাহিনীরই শিরোনাম থাকে। আসলে শিরোনাম দিয়ে সংবাদ কাহিনীকে যেমন চেনা যায়, তেমনি শিরোনামের ছোট বড় বিস্তৃতি বা অলংকারের মধ্য দিয়ে কোন সংবাদ কাহিনীর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বড়, কোনটাকে ছোট হিসেবে দেখানো হয়।

কোন সংবাদ কাহিনীর একটি নিখুঁত শিরোনাম সেই সংবাদ কাহিনীর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ। শিরোনাম হচ্ছে পুরো সংবাদ কাহিনীর বিজ্ঞাপক।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইংরেজিতে বলা যায়, The main objective of headline is to tell and sell। তথ্যদানের পাশাপাশি বিক্রি বাড়ানোই শিরোনামের মূল উদ্দেশ্য।

শিরোনাম পাঠকের চোখকে উন্মীলিত করে। শিরোনামগুলো যেন বলতে চায়— 'প্রিয় পাঠক! এই বা অমুক ঘটনা সম্পর্কে আপনি যা জানতে চান তার ন্যূনতম অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য উপাদানগুলো এখানে আছে, দেখে নিন।' শিরোনামের টাইপগুলো এবং পত্রিকার পাতায় তার অবস্থানই কিন্তু পাঠককে কোন সংবাদ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি

করতে সাহায্য করে এবং তার সূত্র ধরিয়ে দেয়। শিরোনাম যেন আরো বলে, 'প্রিয় পাঠক! আপনি যদি আরো পড়তে চান তাহলে সংবাদ কাহিনীতে চোখ বুলান।'

শিরোনামের উদ্দেশ্য বা কাজটা কী তা একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়।

এক. শিরোনাম পাঠককে কোন বিষয়, ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। পাঠককে কোন ঘটনার অতি সংক্ষিপ্তকার তথ্যটি জানিয়ে দেয়।

দুই. সংবাদ শিরোনাম পত্রিকার পাতার প্রত্যেক দিনের বিভিন্ন সংবাদ ঘটনার মাঝে গ্রেডেশন বা গুণগত পার্থক্য তৈরি করে। এছাড়া সে কোন দিনের ঘটনাবলীকে সুসংগঠিত করে পত্রিকার পাতায় নিজ নিজ অবস্থান ভেদে স্থান করে নিতে সাহায্য করে। কোন পত্রিকা সংগঠনের নীতি অনুযায়ী একটি সংবাদ ঘটনা Leadnews (কোনদিনের সেরা সংবাদ), সেকেন্ড লিড বা দিনের দ্বিতীয় সেরা সংবাদ এমনি করে অসংখ্য সংবাদ নিজ নিজ গুরুত্ব অনুসারে স্থান পায়। শিরোনামের টাইপ ও বহর সেই একেকটি সংবাদ ঘটনাগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করে দেয় বা গুণগত পার্থক্য নির্ধারণ করে।

তিন. সংবাদ শিরোনাম পাঠককে গল্প পাঠে আকৃষ্ট করে। ভালো শিরোনাম ব্যবহার করে পত্রিকা পাঠককে কোন সংবাদগল্প পাঠে প্ররোচিত করা যায়। একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম একজন পাঠককে উত্তেজিত করতে পারে এবং তাহলে সেই পাঠক সংবাদের বাকি অংশটা পড়তেও আগ্রহী হন। একজন সহ-সম্পাদক জানেন, পাঠক খবরের কাগজে তড়িঘড়ি চোখ বুলিয়ে যান, তাই তিনি আকর্ষণীয় শিরোনাম লেখেন যাতে পাঠকের চোখ আটকে যায়। একবার যদি পাঠক কোন শিরোনাম পড়ে মনে মনে বলেন, দেখিতো কাহিনীটিতে কী আছে তাহলে সেই সহ-সম্পাদকের শিরোনাম লেখা সার্থক।

চার. শিরোনাম পত্রিকার পাতার সৌন্দর্যবর্ধন করে।

শিরোনামবিহীন সংবাদপত্রের একটি পৃষ্ঠা কল্পনায় আনুন। মনে হবে যেন এক ধূসর মরুভূমি। চোখের সামনে হয়তো ঠেসে বসানো হয়েছে শুধু বডি টাইপের (কাহিনী লেখার জন্য যত পয়েন্টের টাইপ) অক্ষর আর অক্ষর। এক একটি কাহিনী শুধুমাত্র তার দৈর্ঘ্যের কারণেই যেন আরেকটি থেকে আলাদা। আগেকার দিনে পত্রিকার পাতায় এই শিরোনামবিহীন বিরক্তিকর বইয়ের পাতার মতো শুধু একই মাপের পয়েন্টের অক্ষর থাকতো। কিন্তু শিরোনাম সেই বিরক্তির অবসান ঘটিয়েছে। পৃষ্ঠার বৈচিত্র্য আনা ছাড়াও

প্রতিটি সংবাদের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে এবং তা পড়তে প্রলুব্ধ করার জন্য শিরোনাম প্রয়োজন।

শিরোনাম তার আকৃতি, গঠন, অক্ষরবিন্যাস কৌশল ও উপস্থাপনার গুণে খবরের কাগজের বাহ্যিক আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে, কালো অক্ষরের একঘেয়েমির মাঝে বৈচিত্র্য আনে। কোন ব্যস্ত পাঠক হয়তো বাস বা ট্রেন ধরতে দৌড়ে চলেছেন, কিন্তু পথের পাশের হকার্স কর্নারে সাজানো কোন পত্রিকার পাতার শিরোনাম তাঁর দৃষ্টিকে আটকে দেবে। চলার গতি যাবে তাঁর রুদ্ধ হয়ে। শিরোনাম পড়ে মুগ্ধ হলে তিনি হয়তো ওই পত্রিকাটিই কিনে ফেলবেন।

সতেজ খবরের (Hardnews) শিরোনামের বৈশিষ্ট্য

তাজা খবর বা হার্ড নিউজের শিরোনাম লেখার ক্ষেত্রে কতকগুলো অবশ্য পালনীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতে হয়। একটা কথা স্মরণযোগ্য যে শিরোনামের অবয়ব খুব ছোট হলেও তার লেখার একটা নিজস্ব নিয়ম-কানুন ও কায়দা আছে। প্রকৃতপক্ষে শিরোনাম লেখাটা খুব কঠিন ব্যাপার। তাই কতকগুলো নিয়মনীতি বা পদ্ধতির আশ্রয় না নিলে একটা ভালো অথচ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম লেখা খুব কঠিন। শিরোনাম লেখার সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

এক. শিরোনাম সাধারণত একটি মাত্র বাক্যেই লেখা হয় এবং এক থেকে নয় শব্দের মধ্যে লিখতে হয়। এ বিষয়টি অবশ্যই চার-পাঁচ কলামব্যাপী সংবাদ বিবরণীর ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। সিঙ্গেল কলাম খবরের ক্ষেত্রে তিন-চার লাইন ও বাক্যেও শিরোনাম হতে পারে। তবে ৯ শব্দের সীমারেখাটা সাধারণত সবসময়ই মেনে চলার চেষ্টা করা হয়।

দুই. সংবাদ শিরোনাম হবে খুবই সহজবোধ্য, সহজপাঠ্য ও আকর্ষণীয়। শিরোনামের আকর্ষণের মধ্যেই সংবাদ কাহিনীটির ওপর পাঠকের আকৃষ্ট হবার বিষয়টি অনেকাংশেই নির্ভর।

তিন. শিরোনাম সবসময়ই কর্তৃবাচ্যে (Active voice) লিখতে হবে। দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক এভাবে না লিখে কারো কোন কথা বা বক্তব্য সরাসরি বা কর্তার মুখ দিয়ে বলাতে হবে।

চার. শিরোনামের ভাষা ব্যাকরণগত দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে হবে। শিরোনাম ছোট ও চাঁচাছোলা করতে গিয়ে তার মধ্যে ব্যাকরণগত অশুদ্ধি আনা যাবে না। একটা জিনিস

মনে রাখতে হবে যে একেকটি পত্রিকা একেকটি পাঠশালা। মানুষের মাঝে শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়াও তার একটি কাজ।

পাঁচ. শিরোনাম সবসময়ই বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। শিরোনামে কখনই মিথ্যাচার করা চলে না। আমাদের দেশে কিছু কিছু সাপ্তাহিক পত্রিকা (দুয়েকটি দৈনিকও আছে) অযথা চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ শিরোনাম লিখে থাকে।

ছয়. শিরোনাম সবসময় বর্তমান কালকে (Present tense) ভিত্তি করে লিখতে হবে। এতে শিরোনামের সজীবতাও যেমন থাকে, সংবাদ ঘটনার সজীবতা সম্পর্কেও পাঠকের দ্বিধা থাকে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সদ্য অতীতকে (Immediate past) কেন্দ্র করেও শিরোনাম লেখা হয়।

সাত. শিরোনাম লেখার ক্ষেত্রে কোন ভনিতা থাকবে না। কোন নেতিবাচক দিক এতে থাকবে না। বলার ভঙ্গি হবে সোজা। কোন জটিলতা থাকবে না।

আট. শিরোনাম হবে ব্যাখ্যামূলক। শিরোনামের ওই ছোট্ট পরিসরেই সহ-সম্পাদকগণ তাঁর কথায় যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্লেষণের ইঙ্গিত রাখবেন। এ হবে অর্থগুণসম্পন্ন।

নয়. শব্দ সংকোচনের জন্য যা কিছু স্পষ্ট শিরোনামে তা এড়াতে হবে। যেমন— 'প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া' বলার দরকার নেই। শুধু প্রধানমন্ত্রী অথবা খালেদা জিয়া, অনেক ক্ষেত্রে স্রেফ 'খালেদা' বললেই চলে।

শিরোনামের স্টাইল

শিরোনাম সাধারণত সিঙ্গেল কলাম (S/C), ডবল কলাম (D/C), ট্রিপল কলাম (3/C) বা ফোর কলাম (4/C) হয়। প্রয়োজনে আরো বাড়ে না তা নয়। বড় ঘটনার ক্ষেত্রে তা ব্যানার (Banner) বা ফলাও শিরোনাম অর্থাৎ ছয় কিংবা আট কলাম জুড়েও হয়।

আমরা জানি প্রত্যেক পত্রিকারই **পৃষ্ঠাসজ্জা নীতি** (makeup policy) থাকে। পত্রিকার সেই পৃষ্ঠাসজ্জা নিজস্ব ঢঙে করার জন্য পত্রিকার সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিরা শিরোনামের ক্ষেত্রেও দু'ধরনের গুরুত্ব (Emphasis) দিয়ে থাকেন। সে দুটো হলো:

এক. উল্লম্ব গুরুত্ব (Vertical emphasis)
দুই. আনুভূমিক গুরুত্ব (Horizontal emphasis)

শিরোনাম যখন ওপর থেকে নিচে লেখা হয় তখন তাকে বলা হয় Vertical emphasis। আমাদের দেশের অধিকাংশ পত্রপত্রিকায় এই উল্লম্ব পদ্ধতিতেই শিরোনাম

লেখা হয়। Vertical emphasis-এ শিরোনাম deep হয় অর্থাৎ নিচের দিকে ঘনীভূত হয়। এজন্য এ ধরনের শিরোনামকে Deep Headlines বলে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা জানিয়ে রাখা ভালো শিরোনাম যখন একাধিক বাক্যে উপরে নিচে থাকে এবং সেই একাধিক বাক্য মূলত আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে তখন তাকে Banks বা Decks বলে। আবার যখন কোন মূল শিরোনামের ওপরেও অপেক্ষাকৃত ছোট পয়েন্টে যে ডেক থাকে তাকে শোল্ডার (Shoulder) বলে। আবার যদি মূল কোন শিরোনামের (বিশেষত চার-পাঁচ কলাম বা ব্যানার) নিচে অপেক্ষাকৃত ছোট পয়েন্টের কম গুরুত্বসম্পন্ন আরেকটি শিরোনাম থাকে তবে তাকে হ্যাংগার (Hanger) বলে।

যাই হোক শিরোনাম যখন এক পার্শ্ব থেকে আরেক পার্শ্বে বিস্তৃত হয় অর্থাৎ উপরে নিচে না হয়ে বাম থেকে ডান দিকে ক্রমশ চলে যায় তখন তাকে Horizontal emphasis বা আনুভূমিক গুরুত্ব বলে। আজকাল এই ধরনের শিরোনাম লেখার প্রচলন শুরু হয়ে গেছে, এটা পড়তেও সুবিধা, দেখতেও সুবিধা। রাস্তার পোস্টারের শিরোনামের মতো অনেকটা। ক্রমবিস্তৃত করে লেখার ঢঙের কারণে এ ধরনের শিরোনামকে Wide Headlinesও বলে।

শিরোনাম বিন্যাসে ভারসাম্য

পত্রিকার পাতায় শিরোনাম বিন্যাসের সময় সাধারণত দু'ধরনের ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। এগুলো হলো-

এক. কেন্দ্রমুখী ভারসাম্য (Centre Balance)

দুই. কেন্দ্র বহির্গামী ভারসাম্য (Off Centre Balance)

কেন্দ্রমুখী বা সেন্টার ব্যালান্সের নমুনা:

ক ক ক ক ----- ক ক ক ক ------ ক ক ক -----
ক ক ক ---- ক ক --- ক ক ক ----
ক ক ক ক ------

কেন্দ্র বহির্গামী বা অফ সেন্টার ব্যালান্সের নমুনা

ক ক ক ক ---- ক ক ক --- ক ক ক ক ----
ক ক ক --- ক ক ক ক ---- ক ক --
ক ক -- ক ক ক ক ক ----- ক ক ক ---

শিরোনামের গঠন কাঠামোর পদ্ধতি (System of Headlines)

সংবাদ কাহিনীর শিরোনাম বিভিন্নভাবে লেখা হয়ে থাকে। তবে তার সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতিগত কাঠামো থাকে। সেই কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন ছকের শিরোনাম লেখা হয়ে থাকে। শিরোনাম লেখার কাঠামোগত পদ্ধতি মূলত তিন প্রকার:

এক. পিরামিড কাঠামোর শিরোনাম

দুই. উল্টো পিরামিড কাঠামোর শিরোনাম

তিন. মিশ্র পিরামিড কাঠামোর শিরোনাম

পিরামিড কাঠামোর শিরোনামের নমুনা ঃ

ক ক -----

ক ক ক ---------

ক ক ক ক ----------

এ ধরনের শিরোনাম উপরের থেকে নিচের দিকে ক্রমশ বড় হয়ে আসে এবং পিরামিডের আকার ধারণ করে।

উল্টো পিরামিড কাঠামোর নমুনা ঃ

ক ক ক ক ----------

ক ক ক ----------

ক ক ------

এই ধরনের শিরোনাম উপরের থেকে নিচের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে থাকে এবং উল্টো পিরামিডের আকার ধারণ করে।

মিশ্র পিরামিড কাঠামোর নমুনাঃ

ক ক ক ক ----------

ক ক ক ----------

ক ক ------

ক ক ক ----------

ক ক ক ক ----------

এই ধরনের শিরোনাম উপর দিক নিচে ক্রমশ সরু হয়ে আসতে থাকে আবার মাঝপথে এসে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে মিশ্র পিরামিডের আকার ধারণ করে।

আমরা এতক্ষণ শিরোনামের ব্যালান্স ও সিস্টেম নিয়ে নমুনা সহযোগে কথা বললাম। এই দুটো বিষয়ের মধ্যে একটা ভালো যোগাযোগ রয়েছে।

ক ক ক ক ----------

ক ক ক ----------

আমরা উপরের নমুনা শিরোনামটিকে যদি ব্যালান্স ও সিস্টেমের সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে ব্যালেন্স বা ভারসাম্যের দিক দিয়ে এটি হবে কেন্দ্রমুখী ভারসাম্য বা সেন্টার ব্যালান্স এবং পদ্ধতি বা সিস্টেম হিসেবে একে বলা হবে উল্টো পিরামিড কাঠামো।

বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম

আমরা এখানে শিরোনামের বেশ কিছু ধরন নিয়ে আলোচনা করবো এবং এই আলোচনা সাংবাদিকতার নবীন শিক্ষার্থীদের অনেকটা উপকারে আসবে। আমরা প্রথমেই ব্যানার বা ফলাও শিরোনাম দিয়ে শুরু করবো।

ব্যানার বা ফলাও শিরোনাম (Banner): যে শিরোনাম পত্রিকার আট কলাম (সাধারণত সব পত্রিকার কলাম আটটিই হয়) জুড়ে অথবা নিদেনপক্ষে ছয় কলাম জুড়ে হয় তার নাম ব্যানার বা ফলাও শিরোনাম। যেসব ঘটনা দেশের সমগ্র মানুষকে জড়িত করে ফেলেছে অর্থাৎ যে ঘটনার প্রভাব সর্বগ্রাসী অথবা কোন ঘটনা দেশকাল অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সীমারেখা ছুঁয়েছে সেসব ঘটনার ওপর ব্যানার বা ফলাও শিরোনাম হয়। ব্যানার শিরোনাম সাধারণত কদাচিৎই হয়। যেমন 'ইরাকের কুয়েত গ্রাস' কিংবা 'আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্রেমাদাসা নিহত'।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যানার শিরোনামকে ডেকার (Decker) বা স্ট্রিমারও (Streamer) বলা হয়। এ ধরনের শিরোনাম স্বভাবতই পত্রিকার প্রথম পাতার একেবারে উপরের দিকে স্থান পায়। শিরোনামের অক্ষরগুলো মোটা হরফে লেখা হয়।

স্কাইলাইন বা উড়ালরেখা শিরোনাম (Skyline Headlines): কোন কোন শিরোনাম এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তা ব্যানারকেও যেন অতিক্রম করে ফেলে। এরকম পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলো কোন অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঘটনাকে ব্যানারের চেয়েও জোরদার শিরোনাম করার মানসে পত্রিকার নেমপ্লেট (Nameplate) বা নামফলককে লোয়ার ফোল্ডের (Lower fold বা পত্রিকার ভাঁজের নিচের অংশ) একেবারে নিচে দিয়ে দেয় এবং নামফলকের জায়গায় পুরো আটকলাম জুড়ে ওই শিরোনামটি দিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যানার ও স্কাইলাইন শিরোনামের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। সংবাদ

ঘটনাটাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য ওই ফলাও শিরোনামটিকে নামফলকের ওপরে চড়িয়ে দেয়া হয়।

ফ্লাশ লেফট বাম স্পর্শক (flush left): এ ধরনের শিরোনাম খুবই জনপ্রিয় এবং এর ব্যবহারও খুব বেশি। সাধারণত সিঙ্গেল কলাম থেকে শুরু করে তিন চার কলাম পর্যন্ত এই ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। এধরনের শিরোনামে একাধিক লাইন। এই সবগুলো লাইনই কলামের বামপ্রান্ত থেকে শুরু হয় এবং লাইনগুলো ছোট বড় হওয়াতে কলামের ডান পাশে বেশ ফাঁকা জায়গা (White space or air) থাকে। এতে পাঠকের চোখ বেশ আয়েশ পায়। এছাড়া এ ধরনের শিরোনাম লেখাও সহজ। কারণ ডানপ্রান্তে লাইনগুলো সমান রাখার প্রয়োজন পড়ে না। এ ধরনের শিরোনামের ইউনিট গণনা করাও সহজ। অফ সেন্টার ব্যালান্সের এ একটি ভালো উদাহরণ। এ ধরনের শিরোনাম জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তবে এই ধরনের শিরোনাম দিয়ে পুরো পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা বিরক্তিকর।

ফ্লাশ রাইট (Flush right): ফ্লাশ লেফটের বিপরীত অবস্থানকেই ফ্লাশ রাইট বলে। অর্থাৎ দুই তিন লাইনের এই শিরোনামের কলামের ডানপ্রান্ত ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। কিন্তু বাম দিকে লাইনগুলো ছোট বড় থাকে এবং বেশ সাদা জায়গা ছেড়ে দেয়। এ ধরনের শিরোনাম আজকাল ব্যবহার হতে শুরু হয়েছে। বিশেষ করে অষ্টম কলামের সিঙ্গেল কলামে শিরোনামগুলো এইভাবে তৈরি করলে দেখতে বেশ ভালো লাগে। এটা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম কলাম জুড়েও হতে পারে।

ক্রস লাইন শিরোনাম (Crossline): এ ধরনের শিরোনামে সাধারণত একটি মাত্র লাইন থাকে এবং শিরোনামটি কলামটির বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত জুড়ে হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ডান ও বাম উভয় পাশেই সমান জায়গা ছেড়ে দিয়ে একটু ভিতরে কেন্দ্রীভূত করে শিরোনামটি বসানো হয়। সাধারণত সিঙ্গেল কলামেই এ ধরনের শিরোনাম লেখা হয়।

স্টেপড্ বা সিঁড়ি শিরোনাম (Steppedline): এ ধরনের শিরোনাম সাধারণত এক কলামেই হয়ে থাকে। তবে এ বিন্যাসের কারণে তা দুই কলামে হলে ভালো লাগে। এ ধরনের শিরোনামের লাইনগুলো (সাধারণত তিন লাইন) সিঁড়ির মতো লাগে দেখতে। তবে এধরনের শিরোনামের লাইনগুলো একটি থেকে অপরটি বেশি বড় বা ছোট হলে দেখতে খারাপ লাগে। নমুনা দেখুন —

ক ক ক
ক ক ক
ক ক ক

বাম থেকে ডানে পদবিক্ষেপিত এই ধরনের শিরোনাম সংবাদের গতির পক্ষে অনুপযোগী এবং সঠিকভাবে লেখাও কঠিন। স্টেপলাইন শিরোনামকে ড্রপলাইন (Dropline) শিরোনামও বলে।

ওয়েস্টলাইন বা কটিরেখ শিরোনাম (Waistline headline): এ ধরনের শিরোনামে সাধারণত তিনটি লাইন থাকে। এর প্রথম ও তৃতীয় লাইনটি দুটি কলামের মধ্যবর্তী এলাকার পুরোটা জুড়ে বিস্তৃত থাকে। মাঝের লাইনটি ছোট ও মাঝামাঝি অবস্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত অবস্থায় থাকে। এ ধরনের শিরোনাম শেষ পর্যন্ত মিশ্র পিরামিডের আকার ধারণ করে।

ব্যাংক ও ডেক (Bank & Deck): কোন শিরোনামের যদি দুটো অংশ থাকে তবে সেগুলোর উপরের অংশকে ডেক এবং নিচের অংশকে ব্যাংক বলে। ডেককে আইব্রো (Eyebrow) বা ওভারহেডও (Overhead) বলে।

শোল্ডার বা কিকার (Shoulder or kicker): কোন শিরোনামের মূল অংশটির ওপরে রুল দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফের কম গুরুত্বপূর্ণ বা মূল অংশটির পরিচয় বা পটভূমি নির্দেশক অংশকে শোল্ডার বা কিকার বলে।

স্ট্র্যাপলাইন (Strapline): মূল শিরোনামের ওপরের অংশটি দীর্ঘায়িত না হলে শুধু দু'একটি শব্দে যদি মূল অংশের একটি বৃহত্তর পরিচয় করিয়ে দেয় তবে তাকে স্ট্র্যাপলাইন বলে। যেমন কোন প্রদর্শিত নাটকের সামগ্রিক বিবরণী লিখতে গিয়ে কোন লেখক হয়তো বড় কোন শিরোনাম দিলেন তার ওপরে বিষয় নির্দেশক হিসেবে শুধু 'নাটক' লিখে দেয়া হলো।

হ্যাংগার (Hanger): ফলাও শিরোনাম বড় কোন ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। কিন্তু এই শিরোনামের নিচে একই কাহিনীর অঙ্গীভূত আরো কিছু কথা ছোট হরফে শিরোনাম আকারে গেলে তাকে হ্যাংগার বলে।

সাব হেড (Sub head): একটি শিরোনাম মাথায় নিয়ে কোন সংবাদ কাহিনীর ঘটনার শুরু এবং সংবাদ কাহিনীর সঙ্গে যদি আরো কিছু লেজুর কাহিনী থাকে তাহলে খুবই ছোট টাইপের শিরোনাম দিয়ে সেগুলোকে আলাদা করে দেয়া হয়। এগুলোকে Sub head বলে। এতে সংবাদ কাহিনীটি দেখতেও সুন্দর লাগে, পড়তেও সুবিধা হয়।

জাম্প ও জাম্প হেড (Jump or Jump head): দু-একটি পত্রিকা আছে যেগুলো প্রথম পাতার খবর প্রথম পাতাতেই পুরোটা জায়গা করে দেয়। কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকার

প্রথম পাতায় সব সংবাদ কাহিনীর পুরোটা যায় না। কিছু অংশ দেয়ার পর বাকি অংশ 'অমুক পৃষ্ঠায় অমুক কলামে দেখুন' লেখা থাকে এবং সেই নির্দেশ মোতাবেক আমরা নির্দেশিত পৃষ্ঠায় নির্দেশিত কলামে যাই, এটাকে বলে Jump বা Jumpline এবং Jump-এর পর পরবর্তী পৃষ্ঠায় পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য অর্থাৎ পাঠক যাতে সংবাদটি বুঝতে পারে সে কারণে একটি ছোট্ট শিরোনাম থাকে, তাকে বলে জাম্প হেড (Jump Head) । অর্থাৎ নির্দেশিত পৃষ্ঠায় যে ছোট্ট শিরোনাম দিয়ে খবরের বাকি অংশের বিস্তার ঘটে তার নাম জাম্প হেড।

রিভার্স প্লেট (Reverse plate): সাধারণত সংবাদপত্রে শিরোনাম লেখা হয় সাদা বা ছাই রঙের নিউজপ্রিন্ট কাগজের ওপর কালো কালি দিয়ে। কিন্তু কালো কালির জমিনের ওপর সাদা রং দিয়ে শিরোনাম যখন লেখা হয় তখন তাকে বলে রিভার্স প্লেট।

বক্স প্লেট (Box plate): যদি কোন্ শিরোনামকে একটা বক্স বা বোরখা বা বেষ্টনীর ভেতরে আনা হয় তবে তাকে বলা হয় বক্স প্লেট।

শিরোনামের ইউনিট গণনা

ডেস্কে যিনি কাজ করেন অর্থাৎ সহ-সম্পাদকেরা প্রত্যহই অজস্র সংবাদ শিরোনাম লিখে যাচ্ছেন। তাঁর অনেকগুলো কাজের মধ্যে এটি একটি প্রধান কাজ। শিরোনাম লেখা নিশ্চিতরূপেই একটি শৈল্পিক কাজ। শিরোনাম লেখার জন্য তাঁকে দুটো জিনিস অবশ্যই জানতে হয়। এক. তিনি যে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন সেই পত্রিকা অফিসের মুদ্রণ কাজে ব্যবহৃত টাইপের বৈচিত্র্য ও তালিকা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত হতে হয়। দুই. তিনি যে সকল শিরোনাম লিখছেন সেগুলোর জন্য প্রাপ্ত স্থানের নিরিখে অক্ষর গণনা। শিরোনামে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোকে অবশ্য অক্ষর না বলে আমরা Character বা Unit বা একক বা মাত্রা বলবো। কারণ লেখার কাজে শুধু অক্ষর নয়, বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ব্যবহৃত হয়। এই একেকটি প্রতীক হচ্ছে একেকটা ইউনিট।

সংবাদপত্রে শিরোনামের দৈর্ঘ্য কলামের প্রস্থ ধারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু শিরোনামের প্রস্থ চুলমাত্রও বাড়ানো সম্ভব নয় বলে নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে শিরোনামের দৈর্ঘ্য একটুও বড় করা চলবে না। এছাড়া শিরোনাম লেখার সময় পরিস্থিতিগত বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। ফলে শিরোনামে অক্ষর বা অন্যান্য একক গণনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

একটি শিরোনাম কত পয়েন্টে লিখছি অর্থাৎ কোন্ মাপের অক্ষরগুলো দিয়ে লিখছি এবং সেটা লিখতে গেলে কলামের সুনির্দিষ্ট জায়গাটুকুর জন্য সর্বোচ্চ কতগুলো অক্ষর

প্রয়োজন এসব একজন সহ-সম্পাদককে জানতে হয়। কলামের ভিতর কতগুলো শব্দ যাচ্ছে, তাদের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটুকু কতটুকু করে জায়গা দখল করছে এসব সহ-সম্পাদককে জানতে হয়। অর্থাৎ শিরোনামের ব্যবহৃত অক্ষর বা এককগুলোর সাইজ বা আকার, মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটুকুর আকার এসব কিছু তাঁকে জানতে হয়। অর্থাৎ তাঁকে শিরোনামের হরফ গণনার পদ্ধতি জানতে হয়। এটি জানলে তাঁর পক্ষে কলামের সুনির্দিষ্ট পরিসরে একটি শিরোনমকে জায়গা করে দেয়া অসম্ভব কিছু নয়।

তবে যিনি অভিজ্ঞ সহ-সম্পাদক তাঁকে পাই পাই করে প্রতিটি অক্ষর, ফাঁকা জায়গা একদুই করে করে গুণে গুণে শিরোনাম তৈরি করতে হয় না। তিনি মোটামুটি একটি শিরোনাম লিখেই বুঝতে পারেন অক্ষর বা ফাঁকা জায়গা বেড়ে গেলো কিনা। প্রয়োজনে সামান্য কাটছাঁট করেন। আর আজকালতো কম্পিউটার কাজের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। অনেক সময়ই শিরোনাম লিখে বলতেও হয় না যে ৩৬ পয়েন্ট বোল্ড বা ৪৮ পয়েন্ট কনডেন্সড। অক্ষর ও ফাঁকা জায়গা মিলিয়ে কাছাকাছি থাকলেই হলো, খালি লিখে দিলেই হয় থ্রি সি বোল্ড বা থ্রি সি কনডেন্সড। ব্যস, কম্পিউটার তার কলাকৌশলে সেই নির্দেশিত শিরোনামকে ডিসি বা থ্রিসিতে জায়গা করে দেবে।

যাই হোক, অক্ষরের প্রস্থ সবগুলোর সমান নয়। আবার ফাঁকা জায়গার জন্য কমবেশি বরাদ্দ থাকে। ইংরেজিতে M বা W-কে Fat letter বলে। অর্থাৎ এরা বেশি জায়গা দখল করে। আবার বাংলায় আ, ক্ষ বা কোন কোন যুক্তাক্ষর (যেমন ক্ত) অন্যান্য অক্ষরের তুলনায় বেশি জায়গা দখল করে। আবার কিছু পাতলা অর্থাৎ Thin letter আছে। যেমন f, i, l, t প্রভৃতি।

অক্ষরগুলোর প্রস্থের হেরফেরের জন্য সেগুলোকে ইউনিট বা ক্যারেকটার হিসেবে গণ্য ও গণনা করা হয়।

উল্লেখ্য, ক্যাপিটাল লেটারকে আপার কেস বা Upper Case বা U/C বলা হয়। অপরদিকে স্মল লেটারকে লোয়ার কেস বা Lower Case বা L/C বলা হয়।

ইংরেজির ক্ষেত্রে প্রধানত দু'উপায়ে শিরোনামের ইউনিট গণনা করা হয়ে থাকে। ক্যাপিটাল লেটার অর্থাৎ শুধুমাত্র বড় হাতের অক্ষরের ব্যবহার করে লেখা শিরোনামের ইউনিটের মান ক্যাপিটাল ও স্মল লেটার মিলিয়ে লেখা শিরোনামের ইউনিটের মান এক নয়। ক্যাপিটাল লেটারকে বলে Upper Case বা U/C। অপরদিকে স্মল লেটারকে বলে Lower Case বা L/C। কিন্তু ক্যাপিটাল ও স্মল উভয় প্রকার লেটার মিলিয়ে লেখাকে বলে Upper-Lower।

শুধুমাত্র বড় হাতের অক্ষর অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লেখা শিরোনামের ইউনিট গণনার বিষয়টি খুবই সোজা ও সহজ। যদিও এই পদ্ধতিতে আজকাল আর শিরোনাম লেখা হয় না। ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লেখা শিরোনামের ইউনিটগুলোর মান নিম্নরূপঃ

ক্যাপিটাল M ও W	= ১½ ইউনিট
ক্যাপিটাল I	= ½ ইউনিট
অন্যসব ক্যাপিটাল লেটার	= ১ ইউনিট
ইংরেজি সংখ্যা ।।	= ½ ইউনিট
অন্যসব সংখ্যা	= ১ ইউনিট

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিরাম চিহ্ন বা Punctuation mark যেমন, (কমা), . (ফুল স্টপ), ঃ (বিসর্গ), ং (অনুস্বর) ও - (হাইফেন) হচ্ছে ½ ইউনিট। তবে — (ড্যাশ) হচ্ছে ১ ইউনিট। & হচ্ছে ১ ইউনিট, কারো মতে ½ ইউনিট। #, $, % প্রভৃতি হচ্ছে ১ ইউনিট।

ইংরেজিতে যে শিরোনাম লিখতে আপনার-লোয়ার অর্থাৎ বড় ও ছোট হাতের অক্ষর ব্যবহার করা হয় সেখানে ছোট হাতের অক্ষর (Small letter) মূল ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হয়।

একটি ব্যতিক্রম মনে রাখতে হবে যে, f, i, l ও t এই চারটি thin letter-এর মান ½ ইউনিট করে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই চারটি ইউনিটের সঙ্গে j-কেও ½ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অপরদিকে স্মল m ও w হচ্ছে ১½ ইউনিট করে। বাদবাকি সব স্মল ইউনিট ১ ইউনিট। তবে ক্যাপিটাল M ও W হচ্ছে ২ ইউনিট। অপরদিকে ক্যাপিটাল I হচ্ছে ½ ইউনিট। আপার-লোয়ারের অন্য সব ক্যাপিটাল ১½ ইউনিট। বিরাম চিহ্ন, সংখ্যা, ফাঁকা জায়গার মান আপার কেসের অনুরূপ।

বাংলায় বিভিন্ন ক্যারেকটারের মান নির্ধারণ একটু জটিল। কারণ এখানে যেমন সনাতনী মুদ্রণ প্রথা রয়েছে, তেমনি রয়েছে আরো একটু উন্নত লাইনো প্রথা। বর্তমানে কম্পিউটারের কারণে আরো কিছু পার্থক্য ঘটে গেছে। ফলে ক্যারেকটারগুলোর একটি সমতান বা ইউনিফর্মড (Uniformed) মান নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে। যেমন— ভূমিকা শব্দটির প্রথম অক্ষরটি যদি সনাতনী প্রথায় 'ভূ' লেখা হয় তবে ১ ইউনিট

হিসেবেই ধরা হবে। কিন্তু তা যদি 'ভূ' এইভাবে লেখা হয় তাহলে এর ইউনিট হবে ১½ ইউনিট। যুক্তাক্ষর উপরে নিচে হলে ১ ইউনিট (যেমন 'গ্ন' 'ত্ত্ব' প্রভৃতি) কিন্তু তা পাশাপাশি হলে বা ভেঙে গেলে ইউনিটের মান বেড়ে যাবে। যুক্তাক্ষর তিনরকম। তবে এগুলোকে একটা শামিলে আনার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, বাংলায় যুক্তাক্ষর আছে প্রায় সাড়ে চারশ। যাই হোক বাংলায় বিভিন্ন বর্ণ ও চিহ্নের মান নিচে দেয়া হলো:

স্বরবর্ণ : সনাতনী ও লাইনো

অ, ঋ, ঔ, ঐ - ১½ মাত্রা বা ইউনিট

আ - ২ ইউনিট

স্বরচিহ্ন : া (আকার), ে (একার), ি(হ্রস্ব-ইকার),ী (দীর্ঘ-ইকার), ½ ইউনিট

ব্যঞ্জন চিহ্ন : ্য (য-ফলা),র্ (রেফ),ঁ (চন্দ্রবিন্দু),্ (হসন্ত), ং (অনুস্বর), ঃ (বিসর্গ) ½ ইউনিট

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ ক - ১½ ইউনিট

ঝ - ১½ ইউনিট

ঞ - ১½ ইউনিট

ফ - ১½ ইউনিট

জ - ১½ ইউনিট

ক্ষ - ১½ ইউনিট

আর সব - ১ ইউনিট

ফাঁকা জায়গা ½ ইউনিট (সাধারণত) [কেউ ১ ইউনিট ধরলে সেই হিসেবেই চলবে]
সকল যতি বা বিরামচিহ্ন ও প্রথম বন্ধনী - ½ ইউনিট
ইংরেজিতে সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে যেমন কেবল । - ½ মাত্রা,
বাংলা ০ ও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সবই ১ মাত্রা।
মাত্রা বা ইউনিট বিস্তারের একটি নমুনা।

ব - ১

ক- ১½

কে - ২ ($\frac{১}{২}$ + ১$\frac{১}{২}$)

কো - ২$\frac{১}{২}$($\frac{১}{২}$ + ১$\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{২}$)

কু (সনাতনে) ১$\frac{১}{২}$

কূ (লাইনোতে) ২ (১$\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{২}$)

আমরা এখন ইংরেজি ও বাংলায় একটি করে কল্পিত শিরোনামের মাত্রা গণনার নমুনা দেখবো ঃ

Two to die for acid throwing

১$\frac{১}{২}$ + ১$\frac{১}{২}$ + ১১ $\frac{১}{২}$ + ১ ১ ১ + $\frac{১}{২}$ + ১ ১ $\frac{১}{২}$ + ১ + ১ ১ ১ + ১ + $\frac{১}{২}$ + ১ ১ $\frac{১}{২}$ + ১ + ১ + ১ + ১$\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{২}$ + ১ + ১ = ২৬$\frac{১}{২}$

(এখানে r বাবদ ১ ইউনিট এবং ফাঁকা জায়গা বাবদ ১ ইউনিট ধরা হয়েছে।)

জাতি গঠনে শিক্ষিত মেয়েদের

১$\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{২}$ + ১ ১ ১ + ১ + $\frac{১}{২}$ + ১ ১ $\frac{১}{২}$ + ১ + $\frac{১}{২}$ + ১$\frac{১}{২}$ + ১ ১ $\frac{১}{২}$ + ১ + $\frac{১}{২}$ + ১ + $\frac{১}{২}$ + ১ + ১ = ২০

ভূমিকা অপরিসীম

১ + $\frac{১}{২}$ + ১ + ১$\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{২}$ + ১ ১$\frac{১}{২}$ + ১ + $\frac{১}{২}$ + ১ + ১ + $\frac{১}{২}$ + ১ = ১২

এখানে লাইনো মতে 'ভূ' হলে $\frac{১}{২}$ মাত্রা বেশি যুক্ত হবে।

শিরোনাম নিয়ে শেষ কথা

ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'No Headlines should cry-wolf' অর্থাৎ কোন সংবাদগল্পের যতটুকু গুরুত্ব বা তাৎপর্য রয়েছে ঠিক সেই হারেই শিরোনাম রচিত হবে। গল্পের তেমন কোন গুরুত্ব বা তাৎপর্য নেই অথচ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে শিরোনাম বলা হলো— তাতে বিষয়টি সংবাদ পাঠকের সঙ্গে প্রতারণার শামিল হবে। এটা বাঘ এলো, বাঘ এলো বলে গল্পের সেই রাখাল বালকের চীৎকারের শামিল হবে। তবে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে গুরুত্বহীন খবরের শিরোনাম ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা যাবে না, আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ খবরের শিরোনাম Down play বা গুরুত্বহীন করে দিলে তাও পাঠককে প্রতারণার শামিল হবে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে শিরোনাম লেখা কোন আদর্শ পত্রিকায় নয়, পপুলার বা সস্তা পত্রিকার জন্য চলতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

সংবাদ রসায়ন ও সংবাদ গণিত

সংবাদের আবার রসায়ন হয় নাকি, কিংবা গণিত ? অনেকের মনেই এ বিষয়টি নিয়ে খটকা লাগতে পারে। তবে সবার সংশয়ের নিরসন করে বলা যায় হ্যাঁ, সংবাদের রসায়ন এবং গণিত দুটোই হয়। একটি রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে আরেকটি উপাদানের সংমিশ্রনের ফলে নতুন আরেকটি উপাদানের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যার যোগ-বিয়োগ বা পূরণ-ভাগের মাধ্যমেই নতুন আরেকটি সংখ্যার সৃষ্টি হয়। ঠিক একইভাবে সংবাদের সম্ভাব্য সব উপাদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিই সংবাদ রসায়ন, পাশাপাশি সংবাদ উপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্পর্কের ফলেই সংবাদের যে সংখ্যাগত গুরুত্বের সৃষ্টি সেটাই সংবাদ গণিত।

একটি লঞ্চ দুর্ঘটনায় ৫ জন মানুষের মৃত্যু ঘটলে সেটা অবশ্যই খবর। কিন্তু ঘটনাটি বিয়োগান্তক হলেও সেটি অন্তত আমাদের দেশের জন্য অতি সাধারণ খবর। কারণ এখানে লঞ্চ দুর্ঘটনা প্রায়শই হয়ে থাকে, মানুষের দুভার্গ্যজনক প্রাণহানিও ঘটে থাকে। কিন্তু সেই লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহত ৫ জনের মধ্যে যদি একজন মন্ত্রী থাকে তাহলে তা মহাখবর। কারণ মন্ত্রীর সঙ্গে সংবাদ উপাদানের অন্যতম প্রধান দুটি উপাদান প্রখ্যাতি (Prominence) ও গুরুত্ব (Importance) জড়িত রয়েছে। তবে একথাও সত্য যে লঞ্চ দুর্ঘটনাটিতে যদি শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং তাতে যদি কোন মন্ত্রী নাও থাকে তাহলেও তা মহাখবর। কারণ এখানে নিহতদের সংখ্যাটাই ঘটনাটিকে খবর হবার গুণাবলি ও যোগ্যতা দিয়েছে। এছাড়া এখানে দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকটি ছাড়াও তাৎপর্য, পরিণাম, মানবিক আবেদন ও গুরুত্ব প্রভৃতি উপাদান রয়েছে।

আমাদের কল্পিত ওই লঞ্চ দুর্ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই আমরা কিন্তু সংবাদ রসায়ন বা সংবাদ গণিত সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। কোন ঘটনা সংঘটিত হবার পর সংবাদ হবার মতো সম্ভাব্য উপাদানগুলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অথবা বলা যায় ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে সত্যিকারের সংবাদটি বেরিয়ে আসে। পাঁচজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু অতখানি নাড়া না দিলেও তাঁদের সঙ্গে কোন মন্ত্রীর মৃত্যু সংবাদকে নতুন একটি গুরুত্ব দিয়ে আবির্ভূত হতে সাহায্য করে। আবার সাধারণ মানুষই যখন অসংখ্য মারা গেছে তখন বড় আকারের সংখ্যাটাই সংবাদ হবার জন্য যথাযথ উপাদান। তবে এমন [illegible] হয় কোন ঘটনায় একজন মাত্র সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে সেই একটি মানুষই

বিরাট খবর হবে যদি তাঁর মৃত্যুর ঘটনার পিছনে অসাধারণ একটি পটভূমি থাকে। যদি কোন ব্যাংক ক্যাশিয়ার লক্ষাধিক টাকা তছরুপ করে জুয়া খেলে সর্বস্ব হারায়, তার পরে যদি সে তাঁর স্ত্রীকে জিম্মি রেখে জুয়ায় হারে এবং এইরকম সর্বস্বান্ত অবস্থায় যদি সে গাড়ির তলে মাথা দেয় তাহলে ঘটনাটি একটা বিরাট খবর। এখানে যেমন সংবাদের বিভিন্ন উপাদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রয়েছে, পাশাপাশি সংখ্যার অর্থাৎ গাণিতিক বিষয়ও জড়িত রয়েছে।

আমরা নিচে কতগুলো দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সংবাদ রসায়ন ও সংবাদ গণিতকে সম্যকরূপে বোঝার চেষ্টা করবো।

একজন সাধারণ মানুষ + একটা সাধারণ জীবন = ০

একজন সাধারণ মানুষ ও তার সাধারণ জীবনযাপনের কাহিনী অতিসাধারণ ব্যাপার এবং এ ধরনের ঘটনা সমাজের বিরাট একটা বা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আগ্রহী করে তোলে না। অতএব তা সংবাদ নয়।

একজন সাধারণ মানুষ + একটি অসাধারণ ঘটনা = সংবাদ

সমাজে অসংখ্য পঙ্গু মানুষ থাকে, অনেকেই কষ্টে চেষ্টে চলে। তা নিয়ে কোনদিন সংবাদ শিরোনাম হয় না। কিন্তু শারীরিকভাবে পঙ্গু কোন লোক যদি এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করে কিংবা দু'পা বিহীন কোন লোক ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয় তাহলে নিশ্চিতরূপেই তা সংবাদ।

একজন স্বামী + একজন স্ত্রী = ০

সমাজে লক্ষ কোটি স্বামী স্ত্রী বা দম্পতি আছে। তাঁরা কখনই সংবাদ উপাদান নয়। কিন্তু যদি এমন হয় স্ত্রী উচ্চশিক্ষিতা, স্বামী গণ্ডমূর্খ তাহলে সেটা অবশ্যই সংবাদ।

একজন স্বামী + ৫০ স্ত্রী = সংবাদ।

সাধারণ একজন পুরুষের একজনই স্ত্রীই থাকে। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী ৪ জন পর্যন্ত স্ত্রী রাখা যায়। এটা ধর্মীয় বিধান। কিন্তু সামাজিকভাবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বর্তমানে স্বীকৃত নয়। কিন্তু একজনের যদি ৫০ জন স্ত্রী থাকে তাহলে সেটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা এবং পাঠকদের তা আগ্রহী করে তোলে, অতএব তা সংবাদ।

৫ জন স্বামী + একজন স্ত্রী = সংবাদ।

একজন স্বামীর যদি ৫ জন স্ত্রীও থাকে তবুও সংবাদ তবে তার মাত্রাটা এত ব্যাপক নয়। কিন্তু মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো যদি কোন স্ত্রীলোকের ৫ জন স্বামী থাকে তাহলে তা মহাসংবাদ। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ কোন মহিলাকে একই সঙ্গে একাধিক স্বামীকে রাখার অধিকার দেয় না বা তা প্রশ্রয়ও দেয় না। ফলে এ ধরনের ঘটনা সমাজে নাড়া লাগে বেশ ভালো করেই। ৫ জন কেন, কোন মহিলার যদি দুই জন স্বামীও থাকে সেটাও আমাদের দেশের বিবেচনায় অপরাধ। অতএব তা সংবাদ। তবে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে একজন মহিলার একাধিক পুরুষের পাণিগ্রহণের দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে।

একজন কলগার্ল + একজন শিক্ষক (অথবা একজন সাংবাদিক) = সংবাদ।

সমাজে বিদ্বজ্জনদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। শিক্ষক সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, নামি-দামি মানুষ কিংবা বড় কোন ব্যাংকার অথবা সরকারি আমলার সঙ্গে যদি কোন কলগার্ল বা সোজা কথায় কোন পতিতা বা প্রমোদবালার সম্পর্ক হয় তাহলে তা বিরাট সংবাদ। মানুষ নামের কাঙাল। সে যত ছোটই হোক অথবা বড়ই হোক। তবে সমাজে কোন মানুষের সুনাম বেড়ে গেলে, প্রতিপত্তি, যশ, খ্যাতি বেড়ে গেলে সেই মানুষটি সদা সতর্ক থাকে যেন তাঁর নামের গায়ে কলংকের কালি না লাগে। কিন্তু কোন কলগার্লের সঙ্গে যদি সেই মানুষটি জড়িত হয়ে পড়েন তবে তিনি জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশকে আকৃষ্ট করেন এবং সঙ্গত কারণেই সংবাদ শিরোনাম হন।

একটি মানুষ + এক স্ত্রী + একটি বিবাদ + একটি মামলা = সংবাদ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব অনেকেরই থাকে। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব যদি চরমে ওঠে তাহলে মামলা মোকদ্দমা, আলাদা বসবাস, এমনকি বিয়ে বিচ্ছেদের প্রশ্ন দেখা দেয়। অতি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা তেমন একটা সাড়া জাগাতে পারে না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষের যদি সমাজে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিচয় থাকে তাহলে তা সংবাদ বলে বিবেচিত হয়। নামি হলে তো কথাই নেই। প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা তাঁর প্রথম স্বামী জাবেদ কায়সারের বিরুদ্ধে মদ্যপান, মারধরসহ নানারকম অত্যাচারের অভিযোগ এনেছিলেন। বিষয়টি কোর্টেও উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে বিয়ে বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটে যায়। তাঁর পরের বিয়ে নিয়েও সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। বৃটেনের যুবরাজ চার্লসের সঙ্গে তাঁর পত্নী ডায়নার দ্বন্দ্ব সংঘাতের চরম ও ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে সড়ক দুর্ঘটনায় ডায়নার মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ডায়না-চার্লস নিয়ে প্রতিনিয়তই সংবাদ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

একজন সাধারণ মানুষ + ৭০ বছরের একটি সাধারণ জীবন = ০

৭০/৮০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকাটা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। আমাদের দেশে যেখানে মানুষের গড় আয়ু ৪০-এর কাছে সেখানেও অজস্র সাধারণ মানুষ ৭০/৮০টি বসন্ত অবলীলায় কাটিয়ে দেন। কোন নামি মানুষ এই বয়সে মারা গেলে তা সংবাদ হয়। আর সাধারণ মানুষ হলে কেউই তাঁর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় না। অতএব তা সংবাদ নয়। কিন্তু ঘটনাটি যদি ঘটে নিম্নরূপঃ

একজন সাধারণ মানুষ = ১৩০ বছরের একটি সাধারণ জীবন, তা হলে তা সংবাদ।

অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ যদি তাঁর সারাটা জীবন কাটিয়ে দেন একেবারে সাধারণভাবে, বড় কোন ঘটনাবহুল জীবন যদি তাঁর না হয়, তারপরও তিনি সংবাদ শিরোনাম হবেন শতায়ু হবার কারণে। কিংবা শতবর্ষ পার করার পরেও যদি দু-তিন বা চারটি দশক কাটিয়ে দেন তাহলে হয়তো অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ, জীবনটা তাঁর অতি সাধারণ, অথচ দীর্ঘায়ু হবার রহস্যটি কী। হয়তো নিরুদ্বিগ্ন অতি সাধারণ জীবনযাপনই তাঁর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার মূল রহস্য।

একজন ব্যাংক ক্যাশিয়ার + একজন স্ত্রী + সাত সন্তান = ০

একজন ব্যাংক ক্যাশিয়ারের জীবন আহামরি কিছু নয়। তাঁর যদি স্ত্রী থাকে কিংবা পাঁচ সাতজন সন্তান থাকে তবে তা বাংলাদেশের মতো দেশে অতি সাধারণ ঘটনা। এরকম পারিবারিক জীবন আমাদের দেশের লক্ষ কোটি জনগণের। অতএব এ নিয়ে কোনই সংবাদ রচিত হবে না। কিন্তু যদি হয়,

একজন ব্যাংক ক্যাশিয়ার + দুই লক্ষ টাকা, তাহলে তা হবে সংবাদ।

একজন ব্যাংক ক্যাশিয়ার যদি দুই লক্ষ টাকা তছরুপ করে কিংবা ক্যাশে যদি গণনায় দু'লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ে তাহলে নিশ্চিতরূপেই তা সংবাদ। কেননা একজন সামান্য ক্যাশিয়ারের পক্ষে দু-লক্ষ টাকা দেয়া সম্ভব না। আবার দু-লক্ষ টাকা মেরে দেয়া মানে একটি সুশৃংখল ব্যবস্থায় নাড়া দেয়া। এটা একটা অন্যায়, এটা একটা অনৈতিক দিক। চাকরিবিধির পরিপন্থি। অতএব তা নিশ্চিতরূপেই সংবাদ।

একজন মানুষ + একটি গাড়ি + একটি বন্দুক + একজন দারোয়ান = সংবাদ।

কোন ঘটনায় যদি একজন মানুষ, গাড়ি, বন্দুক বা কোন প্রতিষ্ঠানের দারোয়ান জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে তা সংবাদ শিরোনাম হতে পারে। হয়তো একটি ব্যাংকের একজন দারোয়ানকে পাকড়াও করে একজন ছিনতাইকারী বা ডাকাত বা দস্যু বন্দুক ছিনিয়ে

নিয়ে ব্যাংকের টাকা পয়সা লুট করে পালিয়ে গেলো এমন একটি গাড়িতে করে যে গাড়িটিও সে চুরি করেছিল ওই ব্যাংক ডাকাতির কাজে ব্যবহার করার জন্য। এ ধরনের দস্যুতা একটা বিরাট ঘটনা এবং এর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকে বা জড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে অনেক সময় বড় অপরাধ জগৎও উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

একজন মানুষ + একটি বড় সাফল্য = সংবাদ।

একজন মহিলা + একটি দুঃসাহসিক অভিযান = সংবাদ।

উপরের দুটো ক্ষেত্রেই সংবাদ হবে। একজন মানুষ যদি কোন কাজে একটি বিরাট সাফল্য অর্জন করে তবে তা সংবাদ। যেমন কোন সাধারণ মানুষ একবারে সাধারণ পরিবেশ থেকে এসে অলিম্পিকের আসরে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করতে পারে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের একজন বন্য খরগোস শিকারি লিম্বারাম পরবর্তীতে সেদেশের শীর্ষস্থানীয় তীরন্দাজে পরিণত হয়েছিল। ঠিক একইভাবে যদি কোন একজন সাধারণ মহিলা দুঃসাহসিক কোন অভিযান ঘটিয়ে ফেলেন তবে তা অবশ্যই সংবাদ। ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার লায়লা খালেদ নামে একজন জঙ্গি মহিলা সদস্য সত্তরের দশকে একটি বিমান ছিনতাই করে রাতারাতি বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশের অনামি এথলেট বিমল চন্দ্র তরফদার ১৯৯৪ সালের সাফ গেম্‌সে একশ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড গড়ে যখন দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুততম মানবে পরিণত হলেন তখন তা ক্রীড়াঙ্গনে দারুণ হই চই ফেলে দিয়েছিলো। নিঃসন্দেহে এটা ছিল বিরাট সংবাদ।

সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদক

সহ-সম্পাদক কে

এই সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হাতিয়ারগুলো অর্থাৎ কালি, কলম ও কাগজ থেকে শুরু করে উড়োজাহাজ কিংবা রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি সবকিছুই 'সংবাদ' বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোন ঘটনাস্থল থেকে 'সংবাদ'টিকে পত্রিকা অফিস পর্যন্ত পৌঁছে দিতে ওইসব হাতিয়ার অত্যাবশ্যক। কপি ডেস্কে বা বার্তা বিভাগে যিনি বা যাঁরা বসে থাকেন তাঁদের কাছে ওই হাতিয়ারগুলো মারফত সংবাদ অসংবাদসহ অনেক লেখালেখিই আসে। এই অসংখ্য লেখালেখির সবই ছাপা হয় না। আসলে ছাপা সম্ভবও নয়। ছাপা যেতেও পারে না। এগুলোর কোনটার সবটাই কাগজে স্থান করে দিতে হয় অথবা কোনটার সবটাই বাদ দিতে হয়। আবার কোনটার কিছু কিছু অংশ বাদছাদ করে ছাপা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সংবাদ কপি ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির হাতের পেন্সিল বা বলপেনের ছোঁয়া পেয়ে বেরিয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কপিই প্রকাশিত বিষয় বা দ্রব্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাত দিয়ে এবং তাঁদের মানবীয় প্রচেষ্টার ফলে ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অসংখ্য যেসব ঘটনার কথা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্য দিয়ে সংবাদ আকারে পাঠকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তাঁদেরই বলে সহ-সম্পাদক বা সাব-এডিটর (Sub-editor)। যুক্তরাষ্ট্রে এঁদের বলা হয় কপি-এডিটর (Copy-editor) বা লিপি পাঠক বা শুধুমাত্র editor। সহ-সম্পাদককে অবর সম্পাদকও বলা হয়। কোন সংবাদ কপিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার এই কাজ বা পেশা তথা শিল্পকে যুক্তরাষ্ট্রে কপি এডিটিং এবং বৃটেনে সাব-এডিটিং বা কপি সম্পাদনা বা শুধু সম্পাদনা বলে। ভারতে এটাকে অবর সম্পাদনা বলে। আমাদের দেশের তা 'সাবিং' (Subbing) নামে বহুল পরিচিত।

সহ-সম্পাদক একজন সৃজনশীল শিল্পী

একজন সহ-সম্পাদক একজন সৃজনশীল শিল্পী। 'ডেইলি মেল'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'নেপোলিয়ান অফ দ্য প্রেস' নামে পরিচিত লর্ড নর্থক্লিফ বলেছেন, রিপোর্টাররা লেখে, সহ-সম্পাদকরা তা তৈরি করে। এ কাজে বিশেষ শ্রেণীর ও বিশেষ গুণাবলীর সাংবাদিক প্রয়োজন। যদিও বাস্তবে খুব কম লোকই সহ-সম্পাদক হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পেশায় প্রবেশ করে। কারণ এ কাজে ভালো করলে নিজ অফিসে তাঁর নাম, বাইরে

তাঁকে কেউ চেনে না। এছাড়া এ কাজে ভালো করলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে চিরকালই সেখানেই রেখে দেয়। সম্পাদনার টেবিল থেকে সে কোনদিনই আর ছাড়া পায় না।

সংবাদপত্র জগতের নেপথ্য নায়ক হচ্ছেন সহ-সম্পাদকেরা। সহ-সম্পাদকেরা সংবাদে পাণ্ডিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরে সংবাদপত্রের ভাবমূর্তি নির্মাণে কুশলী শিল্পীর ভূমিকা পালন করেন। একটি বাজে লেখাও সহ-সম্পাদকের হাতের ছোঁয়া পেয়ে খুবই সুন্দর, শোভন ও সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। তিনি শুকনো ও নীরস বিষয়কেও এমনভাবে ঢেলে সাজান এবং এমন মিষ্টি রসে নিষিক্ত করে তোলেন যে পাঠক তা থেকে রস সংগ্রহের উদগ্র বাসনা নিয়ে তাতে দু'চোখ ডুবিয়ে রাখেন। সহ-সম্পাদক হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি—স্বদেশী, বিদেশী, আর্থিক, বাণিজ্যিক কিংবা ক্রীড়া বিষয়ক যে কোন খবরের ব্যাপারেই তাঁর ওপর নির্ভর করা চলে। তাঁর শিক্ষার মান ও পেশাগত প্রশিক্ষণের কারণে তিনি জটিল বিষয় ও শব্দের গুরুগম্ভীরে ভারাক্রান্ত সংবাদবিবরণীকেও সবশ্রেণীর পাঠকের বোঝার উপযোগী ভাষায় তৈরি করে ফেলেন।

সহ-সম্পাদকের কুশলী হাতের ছোঁয়ায় মুহূর্তে বড় বড় বাক্যগুলো ছোট ছোট বাক্যে রূপ নেয়ার হাতের ছোঁয়াতেই কোন সংবাদবিবরণীর সংবাদশীর্ষ আরো উন্নত এবং বাক্য ও অনুচ্ছেদগুলো আরো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শব্দ ও বাক্যাংশগুলো আরো মার্জিত হয় এবং সংবাদ কাহিনী আরো সুখপাঠ্য হয়। তাঁর কর্মগুণেই যে সংবাদপত্রটি প্রতিদিন সকালে পাঠকের কাছে এসে পৌঁছে তা তাঁর সৃজনী কাজের সফল ও বাস্তব রূপায়ণ।

দ্বিমুখী মনের অধিকারী সহ-সম্পাদক

প্রত্যেক সাংবাদিকই ভালো সহ-সম্পাদক বা কপি সম্পাদক হতে পারেন না। প্রতিটি রিপোর্টের তিনিই প্রথম সমালোচক এবং শেষ নিয়ন্ত্রক (Last checkpost)। সুতরাং তাঁর হাত দিয়েই প্রকাশযোগ্য বিষয়টি বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন রিপোর্টের সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হলে একজন সহ-সম্পাদককে 'দ্বিমুখী মনের' (Bifocal mind) অধিকারী হতে হয়। তিনি কপির ক্ষুদ্রতর ভুলগুলো পরীক্ষা করার পর সামগ্রিক বিষয়ে দেখে থাকেন। প্রথমত তিনি তাঁর হাতের কপির সংশোধন ও মানোন্নয়ন করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি সাধারণত ব্যাকরণগত ও অক্ষরবিন্যাসজনিত (Typographical) ভুলগুলো ঠিক করেন এবং তারপর কপিতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর (Facts) মধ্যে কোন অবিন্যাস বা একটি তথ্যের সঙ্গে আরেকটি তথ্যের সামঞ্জস্যহীনতা দূর করেন। দ্বিমুখী মনকে তাই বলা যায়, একটি কাছের থেকে দেখা, অপরটি দূরের থেকে দেখা। এটা অনেকটা Bifocal Lense -এর মতো।

বাইফোকাল লেন্সের মাধ্যমে একজন যেমন কাছের থেকে পলকেই দূরে তাঁর দৃষ্টিকে নিক্ষেপ বা প্রসারিত করতে পারেন। আবার ঠিক উল্টোভাবে সহসাই তাঁর দূরের দৃষ্টিকে কাছে নিয়ে আসতে পারেন। অর্থাৎ সহ-সম্পাদককে একটি দ্বান্দ্বিক ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। দ্বিমুখী সত্তার কারণেই একজন সহ-সম্পাদকের পক্ষে মুহূর্তের মধ্যে যে কোন বিষয়ের সূক্ষ্মতর স্তর থেকে সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়। তিনি যেমন একই সঙ্গে কোন ঘটনার তথ্যগত দিকটি খোঁজ করেন আবার তার অন্তর্নিহিত বা তত্ত্বগত দিকটিও বোঝার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ একই সঙ্গে তাঁর দুটি মন কাজ করতে থাকে। বাইফোকাল মাইন্ডের একটি অর্থ যেমন করা যায় ষষ্ঠেন্দ্রীয় হিসেবে, আবার তাকে তৃতীয় নয়ন হিসেবেও বিবেচনা করা যায়।

আমরা কয়েকটি ইংরেজি বাক্য তুলে ধরে 'বাইফোকাল মাইন্ড'-এর অন্তর্নিহিত অর্থটি উপলব্ধি করতে পারি।

'Sun rises in the West'

'Dhaka is the capital of India.'

'The 15-year old Sonia Gandhi told in a meeting that the BJP does not have the capacity to rule the nation.'

তিনটি বাক্যই ব্যাকরণগত দিক দিয়ে পুরো সঠিক কিন্তু তিনটি বাক্যেই যে তথ্য দেয়া আছে তা পুরোপুরি ভুল। কারণ সূর্য কোনদিনই পশ্চিমে উদিত হয় না। অপরদিকে ঢাকা ভারতের রাজধানী নয়। তৃতীয় বাক্য থেকে আমরা বলতে পারি যে যারা ভারতের সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে কমবেশি পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন সোনিয়া গান্ধী পঞ্চাশোর্ধ। তাঁর বয়স কোনক্রমেই ১৫ নয়। এমন হতে পারে রিপোর্টারের তাড়াহুড়োর কারণে অথবা মুদ্রণ বিভ্রাটের কারণে তাঁর বয়স ১৫ লেখা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সহসম্পাদকের দায়িত্ব ছিল ১৫ টাকে ৫১ করে দেয়া।

এখন আমরা একটি ইংরেজি বাক্য এবং তার বঙ্গানুবাদ তুলে ধরে একজন সহ-সম্পাদকের বাইফোকাল মাইন্ডের ঘাটতির দিক তুলে ধরবো। বেশ কিছুদিন আগে একটি টিভি নেটওয়ার্কের রাত দশটার ইংরেজি সংবাদে ক্রিকেট খেলার একটি সংবাদ দেয়া হয়েছিল যার ইংরেজিটা ছিল মোটামুটি নিম্নরূপ:

David Houghton of Zimbabwe completed his test century today despite his broken toe in the second innings of their first test against New Ziland being

played at Wellington. He was retired hurt on 55 and forced back to the pavilion yesterday.

সেদিন রাত ৮ টার বাংলা খবরে ওই সংবাদটির যে বাংলা করা হয়েছিল তা ছিল মোটামুটি নিম্নরূপ:

জিম্বাবের ডেভিড হাউটন আজ ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠানরত প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইংনিংসে ভাঙা পায়ের পাতা নিয়ে খেলেও তাঁর শতক পূর্ণ করেছেন। গতকাল ৫৫ রান করার পর হৃদযন্ত্রের গোলযোগের জন্য তিনি প্যাভিলয়নে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেদিন সেই টিভি নেটওয়ার্কের বার্তা বিভাগে যে সহ-সম্পাদক কাজ করেছিলেন তিনি সম্ভবত 'Retired hurt' কথাটার অর্থই জানতেন না। অথবা এমনও হতে পারে ইংরেজিতে কথাটি 'Retired heart' এভাবে লেখা ছিল। তবে সার্বিকভাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল ওই শব্দ দুটোর প্রকৃত অর্থ কী তা উপলব্ধির চেষ্টা করা অথবা সংশ্লিষ্ট কাউকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, আর সেটা সম্ভব না হলে ভুল প্রচার না করে তা বর্জন করাই শ্রেয় ছিল। সাধারণ একটি ধারণা থেকেই বোঝা যায় যে হৃদযন্ত্রের গোলযোগ হওয়ার পরের দিনই একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে মাঠে নামা সম্ভব নয়।

এই প্রেক্ষাপটে বাইফোকাল মাইন্ডের জন্য প্রযোজ্য একটি প্রবচন সবসময় মনে রাখা উচিত। তা হলো—

'When a doctor makes a mistake, he can burry it but when the Sub-editor makes mistake, the problem starts'.

সহ-সম্পাদককে 'দ্বিতীয় মন'ও (Second mind) বলা হয়। কপি সম্পাদনার আঙ্গিক পত্রিকা থেকে পত্রিকান্তরে ভিন্ন হয়। একটি মহানগরীর দৈনিকের এক ডজন বা ততোধিক কপি সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক থাকেন যাঁদের সম্পাদকের পক্ষ থেকে কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়। যেমন স্থানীয় সংবাদ, সমাজ, ক্রীড়া, রাষ্ট্র, আবহাওয়া প্রভৃতি। ক্ষুদ্রতর দৈনিকের বার্তা নির্বাহীগণ নিজেরাই সংবাদদাতা ও রিপোর্টারদের প্রেরিত কপি পড়ে থাকেন। যদিও আজকাল রিপোর্টাররা নিজেই একেকজন কপি সম্পাদক। তাঁরা তাঁদের কপি নগর সম্পাদকের টেবিলে জমা দেয়ার আগে তা ভালো করে দেখে শুনেই জমা দেন। কিন্তু কপিতে 'দ্বিতীয় মনের' বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা অত্যাবশ্যক। কারণ নিজের লেখা কপিতে নিজের পক্ষে ভুলত্রুটি বের করা অনেক সময়ই অসুবিধা হয়ে পড়ে। সহ-সম্পাদকের পক্ষে এই ভুলত্রুটিগুলো বের করা খুবই সুবিধা। এই জন্য সহ-সম্পাদককে 'দ্বিতীয় মন' বলে। স্বভাবতই

রিপোর্টারকে 'প্রথম মন' বলে। এমনকি সাপ্তাহিকীগুলোতেও রিপোর্টারের প্রেরিত কপিতে 'চোখ বোলানো' একটি প্রথায় দাঁড়িয়েছে।

সহ-সম্পাদকের মূল মন্ত্র

একজন সহ-সম্পাদকের প্রতিটি পদক্ষেপ কিংবা তিনি কী বিষয় বা ধরনের কপি নাড়াচাড়া করছেন এবং তাঁর সেই সকল কাজ সকালে হোক বা বিকেলে হোক, রবিবাসরীয় অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকা হোক, ভোরের দৈনিক বা সান্ধ্য দৈনিক হোক সব কিছুর পিছনে তাঁর মূলমন্ত্র (Watchword) হিসেবে কাজ করে যথার্থতা, দ্রুততা, সতর্কতা, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, দৃঢ় প্রত্যয় ও সাধারণ জ্ঞান।

তিনি কোন সংবাদবিবরণীর যথার্থতা ও তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে দেখেন। সন্দেহ দেখা দিলেই তাঁকে সংবাদের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে দেখতে হবে। নামধাম, হিসাব, সংখ্যা সবকিছু সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য হেরফের হলেই মহাবিভ্রাট ঘটে যেতে পারে। তিনি কখনই সন্দেহজনক কোন কিছু প্রকাশ করবেন না। তবে অনেক সময় সন্দেহজনক কোন কিছুর নিরসন তিনি করবেন তাঁর প্রজ্ঞা ও সাধারণ জ্ঞান দিয়ে। একজন সহ-সম্পাদক একজন জীবন্ত ও চলমান জ্ঞানকোষ। তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি নিয়ে তিনি কোন ঘটনার সত্য মিথ্যা বা ভালো মন্দের দিকটি বিচার করেন। তাঁর সামগ্রিক গুণের নিরিখেই তিনি একটি সংবাদবিবরণীকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে পারেন। আবার কোনটিকে বর্জন করতে পারেন। আবার কোনটির আরো পরিমার্জন, পরিবর্ধনের জন্য ধরে রাখতে পারেন। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে রক্ষিত অসংখ্য তথ্যের থেকেই তিনি রিপোর্টকে সমৃদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত করতে পারেন।

সহ-সম্পাদক একজন সব্যসাচী

সহ-সম্পাদকের কাজকে একটি শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই শিল্প কাজকে নিঁপুণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য পত্রিকা সংগঠনগুলোর দক্ষ সহ-সম্পাদক প্রয়োজন। একজন প্রখ্যাত সম্পাদক বা প্রকাশক তাঁর পত্রিকার খবরের ভালো কাটতির জন্য অনেক সময়ই ভেবে গর্বিত হন যে তাঁর একদল ভালো সহ-সম্পাদক আছে। একজন সহ-সম্পাদকের নিজের মাতৃভাষায় দখল ছাড়াও অন্য একটি বিদেশী আন্তর্জাতিক ভাষায় দখল থাকতে হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ইংরেজিতে তাঁর ভালো জ্ঞান থাকা উচিত। এতে করে বিদেশী সার্ভিস কপি (যেমন- রয়টার, এএফপি, এপি প্রভৃতি) অথবা টাইম, নিউজউইক, এশিয়াউইক, সানডে প্রভৃতি সাময়িকী থেকে অনুবাদ, ভাবানুবাদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, বুঝতে সুবিধা হয়। সহ-সম্পাদক যদি ইংরেজি পত্রপত্রিকায় চাকরি করেন তাহলে ওই সমস্ত ইংরেজি লেখালেখি থেকে ছেঁটেকুটে সুন্দর একটি লেখায় দাঁড় করানো, ভালো শিরোনাম লেখা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ হয় যদি

তিনি ভালো ইংরেজি জানেন এবং সংবাদপত্রের উপযোগী ইংরেজি তথা ভাষা জানেন। এতে করে সংবাদবিবরণী বা ফিচার ঢেলে সাজাতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না।

প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং প্রবৃত্তি সম্পর্কে তাঁকে জানতে হয়। তাঁর নিজের পত্রিকা সংগঠন ও তার নীতিমালা সম্পর্কে তাঁকে ভালোভাবে অবহিত হতে হয়। তিনি সময় সম্পর্কে সচেতন থাকেন। কারণ, তাঁকে ডেডলাইনকে সামনে রেখে দ্রুতগতিতে কাজ করতে হয়। তিনি বইপত্র, খেলাধুলা, ম্যাগাজিন ও সমীক্ষাসমূহ, সরকারি প্রশাসন যন্ত্র ও তার বিভাগসমূহ, নাম, ধাম, স্থানীয় জায়গা, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক, ভূগোল, ইতিহাস, মানুষের প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে আদ্যোপান্ত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে জানবেন। তাঁকে সাহিত্য, শিল্পকলা সম্পর্কে জানতে হবে। সংবাদ বিষয়ক যে কোন জ্ঞান বা তথ্যাবলী সম্পর্কে তাঁকে জানতে হবে। অতি সাধারণ জ্ঞান থেকে শুরু করে বিশেষ জ্ঞান তাঁর থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি সর্ববিষয়ে একজন পণ্ডিত (master) হবেন।

সহ-সম্পাদকের মূল কাজ তিনটি

বহুমুখী পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং সম্পাদকের একজন বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে একজন সহ-সম্পাদক তাঁর নিজ সংবাদপত্র সংগঠনের যেকোন সংবাদ বিষয় থেকে শুরু করে সংবাদবিবরণী লেখা এবং পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা (Makeup) পর্যন্ত তদারকি করেন। কিন্তু সহ-সম্পাদকের মূল কাজ তিনটি ঃ

এক. তাঁকে দেয়া কপির তিনি ভুল শুদ্ধিকরণ ও মানোন্নয়ন করেন এবং সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্ত করেন।

দুই. তিনি সুনির্দিষ্ট সংবাদকাহিনীর যথাযথ শিরোনাম লিখে থাকেন এবং

তিন. তিনি তাঁর পত্রিকার নীতিমালা সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেন।

আমরা এখন ক্রমান্বয়ে তাঁর মূল তিনটি কাজের কথা বিশদভাবে আলোচনা করবো।

কপি শুদ্ধকরণ ও মানোন্নয়ন

যেকোন মানুষই (সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক) যা কিছু লিখুন না কেন তাতে অনেক সময়ই ভুল থাকে। এমনকি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি (বিশেষত রিপোর্টার) তাঁর লেখার মধ্যেও বানান ও ব্যাকরণের ভুল, বড় ছোট হাতের অক্ষরের সংমিশ্রণ, সাধু চলতি ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ, যতি চিহ্ন, বিরাম চিহ্নের প্রয়োগের ভুল, তথ্য (Facts) সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে ভুল থাকে। টুকটাক ভুলের জন্যই কোন বাক্যের অর্থগত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। 'দ্বিতীয় মন' বলে পরিচিত সহ-সম্পাদকের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও প্রথম কাজটি হচ্ছে সেই ভুলত্রুটিগুলো শুদ্ধ করা। রিপোর্টারকে বলা হয় প্রথম মন,

তাড়াহুড়োর মুখে অনেক সময়ই তার ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। দ্বিতীয় মনের কাজ হলো তা ঠিকঠাক করা।

প্রতিটি সংবাদপত্রেরই নিজস্ব স্টাইল থাকে। যেমন অধিকাংশ পত্রিকাই আট কলামের হয়। কোন কোন পত্রিকায় তা ছয় কলাম আবার নয় কলামও হয়। এইরকম কলাম, বড় ছোট অক্ষর, বানান, যতি চিহ্ন, সংক্ষিপ্তকরণের ধরন প্রভৃতি একেক পত্রিকায় একেক রকম। একজন সহ-সম্পাদক খেয়াল রাখবেন তাঁর পত্রিকায় কোন্‌টি প্রচলিত এবং সে হিসেবে কপি ঠিকঠাক করা সহ-সম্পাদকের কাজ।

ঘটনা বা তথ্যের ভুল হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার। রিপোর্টার তথা সংবাদ লেখকদের অনেকেই পেশাগত দিক দিয়ে পরিপক্ক থাকেন না। কেউ কেউ একবারেই নবীন। কেউ কেউ অসতর্ক। কারো মধ্যে আবেগময়তা ও ভ্রান্ত উপলব্ধি থাকে। একেবারে অস্বীকার করা যায় না কেউ কেউ অতিরঞ্জন ও ভণ্ডামিতে লিপ্ত থাকে। অবশ্য যাঁরা সাংবাদিকতা পেশার নীতিবহির্গত কাজে লিপ্ত থাকেন তাঁদের সেই কার্যকলাপ চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা আবিষ্কৃত হয়ে তাঁরা পেশা থেকে বিচ্যুত হন। যাই হোক এইসব ভুল ত্রুটি একজন সহ-সম্পাদককে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। সময়কে পরাজিত করার উত্তেজনা এবং অসংখ্য কপির দারুণ চাপ থাকা সত্ত্বেও ছোট একটি দৈনিকের প্রকাশেও প্রচুর ভুলকে স্বীকার করে নেয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে আমাদের দেশেও অন্যান্য ব্যবসা থেকে শুধুমাত্র পত্রপত্রিকার ব্যবসাতেই যথার্থতা আনার সতত প্রয়াস চালানো হয়। আর এসবের জন্য একজন সহ-সম্পাদক হচ্ছেন সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা।

কোন ঘটনা বা তথ্যে কোন সন্দেহজনক বা বিভ্রান্তিকর কিছু থাকলে তাকে শনাক্ত ও যাচাই করার জন্য সহ-সম্পাদকের কাছে চারটি হাতিয়ার খোলা থাকে।

(১) তিনি যে কোন রেফারেন্স বই ঘেঁটে দেখবেন যেমন অভিধান, হু'জ হু, বিশ্বকোষ, ইতিহাসপঞ্জি, সিটি ডাইরেক্টরি, টেলিফোন ডাইরেক্টরি, দিনপঞ্জি বা এলমানাক ও অন্যান্য। এগুলো তাঁর কপিতে আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য সহায়তাকারী।

(২) সন্দেহ হলে তিনি সংবাদগল্পটি সংবাদ লেখকের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে পারেন সেটি চেক করে দেয়ার জন্য এবং তিনি সংবাদ লেখককে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র বা কর্তৃপক্ষের কথা উল্লেখ করে দিতে বলতে পারেন।

(৩) ডেস্কের যিনি প্রধান থাকেন অর্থাৎ প্রধান সহ-সম্পাদক (Chief Sub-editor) সাধারণত সংবাদ কপি সহ-সম্পাদকদের কাছে বিতরণ করেন তা সংবাদ উপযোগী করে তৈরির জন্য। প্রধান সহ-সম্পাদকের দেয়া কোন সংবাদ কপির বিষয়বস্তু নিয়ে

তিনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এবং তা পুনরায় চেক করে পাস করে দেয়ার জন্য প্রধান সহ-সম্পাদককে বলতে পারেন।

(৪) সংবাদগল্পের সংবাদমূল্যকে নষ্ট না করেও তিনি সংবাদ লেখকের 'বিবৃতি বা বর্ণনা'কে বাদ দিয়ে দিতে পারেন। যখনই কোন কিছু সন্দেহ হয় তখনই তাকে বাদ দিয়ে দেয়াই ভালো। কারণ ভুল কোন কিছু সরবরাহ করা খুবই মারাত্মক ও ক্ষতিকারক। ভুল কোন কিছুকে চালিয়ে দেয়া সহ-সম্পাদককের কাজের রীতি ও নৈতিকতা বিরুদ্ধে।

কপি সম্পাদনায় সহ-সম্পাদকের সৃষ্টিশীল ধারণা, জ্ঞান ও মন থাকা দরকার। কোন একটি দুর্বল ঘটনা-গল্পকে লেখার শৈলী দিয়ে সুন্দর করে তোলা যেতে পারে এবং এটা একটা রোমাঞ্চকর কাজ। প্রতিটি সংবাদবিবরণীই বিদঘুটে সব সমস্যা নিয়ে হাজির হতে পারে। কপি সম্পাদক তা বিশ্লেষণ করে তা ভালো করে তুলতে পারেন। একজন কপি সম্পাদকের বিচার ক্ষমতা ও সৃষ্টিমূলক ধারণা দুইই থাকতে হবে। প্রতিটি গল্পই তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে আসতে পারে। তবু সংবাদ লেখকের লেখা শব্দাবলীকে অক্ষুণ্ন রেখেই এর মানকে উন্নত করা সম্ভব। সাধারণত সংবাদবিবরণীর প্রায়শই প্রেক্ষাপটজনিত কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না কিন্তু সংবাদগল্প থেকে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ যায় তাহলে সেটা দেখবেন সহ-সম্পাদক এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

তিনি সংবাদ লেখকের লেখা বাক্যসমূহকে পরিষ্কার, সংহত ও উপভোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পালিশ করেন এবং এতে করে বাচ্চারা থেকে শুরু করে অল্প শিক্ষিতরাও সহজে বুঝতে ও পড়তে পারে।

শিরোনাম লিখন

একটি সংবাদগল্পের ওপর যখন একজন সহ-সম্পাদকের হাতের পেন্সিল বা বলপেন ওঠানামা করে তখনই তিনি মনে মনে একটি শিরোনাম তৈরি করে ফেলেন এবং তা তিনি পত্রিকায় সরবরাহ করেন। তিনি সম্পাদনার সময়ই পুরো সংবাদগল্পটিকে স্মৃতিবদ্ধ করে ফেলেন এবং পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁকে গল্প পাঠে প্ররোচিত করতে মোটামুটি অর্ধডজন শব্দ খরচা করে ভালো শিরোনাম লিখে ফেলেন। শিরোনাম রচনা সহ-সম্পাদকের একটি অন্যতম কাজ। যথাযথ ও সঠিক শিরোনাম রচনার সামর্থের মধ্য দিয়ে একজন সহ-সম্পাদকের সত্যিকারের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিরোনাম লেখা একটি সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী কাজ। শিরোনাম হচ্ছে সংবাদের সংক্ষিপ্তসারের আরো সংক্ষিপ্ত রূপ। সংবাদের মূল কথা যেমন আমরা সংবাদশীর্ষে (Lead) স্থান দিই তেমনি সেই সংবাদশীর্ষের মূল কথাকে আরো সংক্ষিপ্তাকার করে

আমরা তা শিরোনামে স্থাপন করি। এজন্য শিরোনামকে যথার্থভাবেই Superleadও বলা হয়। স্বল্পতম শব্দে সংবাদটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাৎপর্য নিহিত থাকে। বস্তুত একজন সহ-সম্পাদক তাঁর মৌলিকতার ও প্রতিভার পরিচয় যতটা শিরোনাম নির্মাণে দিতে পারেন ততটা আর অন্য কোনটাতেই তাঁর দেয়ার অবকাশ নেই। চিত্তাকর্ষক শিরোনাম পাঠকদের মনকে অভিভূত করে। পত্রিকার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করে। তাই ভালো শিরোনাম রচনায় দক্ষ একজন সহ-সম্পাদক যেকোন পত্রিকার জন্য মূল্যবান সম্পদ।

প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই শিরোনামের জন্য ব্যবহারযোগ্য সুনির্দিষ্ট টাইপ থাকে। কম্পিউটার কম্পোজিংয়ের যুগ আসায় টাইপের ব্যবহারে আরো বৈচিত্র্য এসেছে। শিরোনামের টাইপ সঙ্গত কারণেই সংবাদের বডি বা শরীর নির্মাণে ব্যবহার্য টাইপ থেকে বড়। উল্লেখ্য, সংবাদের শরীর নির্মাণে ব্যবহার্য টাইপকে বডি টাইপ বলে। অনেক সময় অবশ্য বৈচিত্র্যের প্রয়োজনে বা গুরুত্বের খাতিরে শিরোনামের জন্য ব্যবহার্য ক্ষুদ্রাকার ধরনের টাইপও সংবাদের শরীর বা বডি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

নিউজ ডেস্কে শিরোনামের হরফের একটি বাহারি তালিকা থাকে। ওই তালিকায় সংবাদপত্রের জন্য ব্যবহার্য শিরোনামের হরফের নম্বর থাকে, নামও থাকে। হরফের নম্বর নির্মাণ করা হয় তার মাপ অনুযায়ী। নামটা নির্ধারিত হয় প্রধানত টাইপের চেহারার নিরিখে। নির্মাতার ইচ্ছানুযায়ীও টাইপের নামকরণ করা হয়। কোন্ নম্বরের টাইপ কতটা জায়গা দখল করে তাও সন্নিবেশিত থাকে ওই তালিকায়।

সহ-সম্পাদক অথবা ডেস্কের পরিচালক অর্থাৎ প্রদান সহ-সম্পাদক একটি আলাদা কাগজে শিরোনাম লিখে তা সংবাদ কপির সঙ্গে গেঁথে দেন এবং ওই শিরোনামে কোন্ ধরনের টাইপ ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে কপিটি প্রিন্টারের কাছে অর্থাৎ কম্পোজিং কক্ষে পাঠিয়ে দেন। বিভিন্ন সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম রচনা করে সহ-সম্পাদক কোন দিনের পত্রিকায় নিউজ ট্রিটমেন্টের একটা রূপরেখাও ক্রমশ তৈরি করে ফেলতে শুরু করেন।

পত্রিকার পলিসি বা নীতি অনুসরণ

একটি ভালো পত্রিকা দিনের অথবা সপ্তাহের ঘটনাবলী সততা, আন্তরিকতার সঙ্গে সুন্দর ও বুদ্ধিদীপ্তভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চায়। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সহ-সম্পাদকের কাছে বিশেষ দায়িত্বশীলতার ভার অর্পণ করা হয়। সুতরাং তাঁকে সদাসতর্ক ও ন্যায়নিষ্ঠ থাকতে হয়। উদ্ভট বা বানোয়াট খবর, সস্তা বা ফালতু খবর কিংবা খবরের ছদ্মাবরণে বিজ্ঞাপন ঢুকে পড়লো কিনা এসব ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক প্রহরী হিসেবে কাজ করতে হয়। যে সমস্ত অযৌক্তিক, উদ্ভট, তুচ্ছ, অসঙ্গত, দায়িত্বজ্ঞানহীন

অনামি, বেনামি, মারাত্মক ও কুৎসামূলক কথাবার্তা পত্রিকার জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করে তিনি সেগুলো বাদ দিয়ে দেন। যে সকল সংবাদ কাহিনীতে সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গি এসে পড়ে সেগুলোকে তিনি ছাঁটাই করে দেন। অবশ্য পত্রিকার নিজস্ব রীতি ও নীতির কারণে যদি কারো কোন নামে লেখা সংবাদবিবরণী বা কলামে সম্পাদকীয় ছোঁয়াসহই ছাপার নির্দেশ থাকে সেগুলোকে তিনি প্রকাশিত হবার পথে বাধা সৃষ্টি করেন না। তবে তিনি জানেন সত্যিকারের সংবাদ ও প্রপাগান্ডা প্রচারণার মধ্যে কিভাবে ভেদরেখা টানতে হয়। পত্রিকাটি কোন দল, মত বা আদর্শের অনুসারী হলে সহ-সম্পাদককে আন্তরিকতার সঙ্গে তা অনুসরণ করতে হয়।

তাঁর সংবাদ জ্ঞান হবে প্রখর। একাধিক সূত্র থেকে একটি ঘটনার খবর আসতে পারে। একাধিক সূত্র তাঁদের নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তাঁদের বিবরণী দিতে পারে। একজন সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব হবে একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত ঘটনাগুলোর সমন্বয় সাধন করে তা পত্রিকার নীতি অনুযায়ী সেটির আদর্শ সংবাদ কাঠামো বা বিবরণী নির্ধারণ। অবশ্য তার আগে তাকে ওই সংবাদ ঘটনার প্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে। তিনি অনাহূত বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তা পরিহার বা ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সুচিন্তিত কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই তাঁর পত্রিকার নীতি প্রতিপালিত হয়।

একজন ভালো সহ-সম্পাদক সাধারণ জ্ঞান, সততা ও সত্যনিষ্ঠার মানকে সমুন্নত রাখতে সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নেন। একটি সংবাদপত্রের নিরাপত্তা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল্যকেও তিনি সমুন্নত রাখতে প্রয়াসী হন। তিনি সম্পাদকের একজন সরাসরি প্রতিনিধি কিন্তু তিনি নিজে সম্পাদক নন।

সহ-সম্পাদকের আরো কাজ

সম্পাদকের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ প্রকাশনার যাবতীয় দায়দায়িত্ব তিনি প্রতিপালন করেন। একজন সহ-সম্পাদক প্রধান সহ-সম্পাদকের নির্দেশেই কাজ করে থাকেন। তবু সংবাদ বাছাই থেকে শুরু করে পত্রিকার পৃষ্ঠা বিন্যাস পর্যন্ত অনেক দায়িত্বই তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই পালন করেন। হয়তো পালা প্রধান তাঁকে সংবাদ কপি দেন কিন্তু সে ব্যাপারেও তিনি মতামত রাখেন কিংবা একই বিষয়ের ওপর (যেমন ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ) একাধিক কপি থেকে তিনি বাছাই করে দু-একটি কপি অনুবাদ বা ভাবানুবাদের জন্য নির্বাচিত করতে পারেন এবং কপির মূল ভাবটি কি তাও তিনি তাঁর মেধা দিয়ে শনাক্ত করে প্রধান সহ-সম্পাদক বা পালা প্রধানকে তার ওপর শিরোনাম লেখার পরামর্শ দিতে পারেন। যদিও দায়িত্ব অনুসারে তিনি নিজেই সে কর্মটি সম্পন্ন করেন।

সংবাদের কপি সংক্ষিপ্তকরণ, মানোন্নয়ন, ভুল সংশোধন কিংবা পত্রিকার নীতি অনুসরণের ব্যাপারে তাঁর দায়িত্বের কথা আগেই বলেছি। অনুবাদ, ভাবানুবাদের কথাও

এসে গেলো। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, আমাদের দেশের বাংলা পত্রপত্রিকাগুলোর সহ-সম্পাদকের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে অনুবাদ। রয়টার, এপি, এএফপি প্রভৃতি সংবাদ সংস্থার ইংরেজি কপি থেকে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকার সহ-সম্পাদকদের অনুবাদ করতে হয়। তবে একথা স্মরণযোগ্য যে, একজন সহ-সম্পাদক কখনোই অনুবাদক নন। অনুবাদক তিনি, যিনি কপির হুবহু ভাষান্তর করে থাকেন। আমাদের দেশের অনেক বার্তা সম্পাদকই তাঁর সহ-সম্পাদকদের কপি হাতে ধরিয়ে বলেন, এটা অনুবাদ করুন। কিন্তু অনুবাদ হচ্ছে একজন সহ-সম্পাদকের কাজের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। কিন্তু একজন সাংবাদিক ভাষান্তর কর্মের পাশাপাশি কোন মূলকপি থেকে সংবাদ আকারে পত্রিকার নিজস্ব স্টাইল অনুসারে এবং সংক্ষিপ্তাকারে বিবরণী তৈরি করে থাকেন। এছাড়া সহ-সম্পাদকরা ইংরেজি থেকে বাংলায় ফিচার তৈরির সময় প্রায়শই ভাবানুবাদ করে থাকেন।

চিত্র সম্পাদনা ও ক্যাপশন বা চিত্র পরিচিতি রচনাও একজন সহ সম্পাদকের অন্যতম কাজ। সকাল বিকাল বা রাত যে কোন পালাতেই একজন সহ-সম্পাদককে সংবাদ উপযোগী ও সংবাদ সহায়ক এবং সৌন্দর্যবর্ধক চিত্র সম্পাদনা (editing) করতে হয়। চিত্র সম্পাদনা করতে পারাটা তাঁর একটি যোগ্যতা ও দক্ষতার মাপকাঠি। ছবি চেনাটাই সোজা কথা নয়। সেই ছবি চিনে তা প্রকাশের জন্য নির্বাচিত করে তার একটি পরিচিতি রচনাও তাঁর একটা কাজ। বলে রাখা ভালো, সবাই সংবাদচিত্রের ভালো পরিচিতি বা ক্যাপশন লিখতে পারেন না। ভালো ক্যাপশন লেখার জন্যও একটি যোগ্যতা লাগে। ছবির মর্মার্থ বা মূল ভাব বুঝতে পারা, ছোট ছবি বড় করা, বড় ছবি ছোট করা, কোন ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া কিংবা কোন ছবির গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে আলোকিত (Highlighting) করা এবং ছবির পটভূমি ও গুরুত্ব অনুযায়ী ক্যাপশন রচনা করা সহ-সম্পাদকের অনেকগুলো কাজের অংশ।

পত্রিকার পৃষ্ঠাসজ্জা বা মেকআপ (Makeup) করাও সহ-সম্পাদকের একটি কাজ। পত্রিকার পাতায় বিশেষত প্রথম পৃষ্ঠায় কোন্ খবর কতটা জায়গা জুড়ে ছাপা হবে, তার শিরোনাম কোন্ মাপের হবে, কোন্ ছবি কতটা বড় হবে, কোন্ জায়গায় বসবে এসব বিষয়েও সহ-সম্পাদককে সিদ্ধান্ত দিতে হতে পারে। প্রত্যেক পত্রিকারই নিজস্ব আকারের ডামি শিট থাকে (যদিও তা প্রত্যেকেরই প্রায় সমান)। এই ডামি শিটে বার্তা সম্পাদক বা পালা প্রধানরা পরের দিনের জন্য সম্ভাব্য একটা নকশা অঙ্কন করে দিয়ে যান। এই নকশা অনুযায়ী যান্ত্রিক বিভাগের মেকআপ ম্যান পত্রিকাটির চূড়ান্ত সজ্জাটি করে থাকেন। কিন্তু একজন করে সহ-সম্পাদক সেই মেকআপ ম্যানকে দিকনির্দেশ করেন। বিদেশে মেকআপ সম্পাদক ভিন্ন ব্যক্তি হলেও আমাদের দেশে সহ-সম্পাদকরাই মেকআপ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আজকাল প্রুফ সংশোধন করার দায়িত্বও সহ-সম্পাদকের ওপর বর্তে যাচ্ছে। প্রুফ দেয়ার জন্য আমাদের দেশে প্রুফ রিডার বা সম্পাদনা সহকারীর পদটি থাকলেও বিদেশে এ পদটির প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে। সেখানে বার্তা বিভাগে কোন কপির কাটছাঁটের পর অনেক সময় রিপোর্টাররাই তা সংশোধন করে দেন। এরপরেও কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে তা চূড়ান্ত সংশোধন করে সহ-সম্পাদকরাই তা সরাসরি প্রেসে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে টুকটাক ভুল হলে বাকি সংশোধনের কাজটি সহ-সম্পাদকরাই করে থাকেন। একজন সহ-সম্পাদক নিজেই সংশোধনীর কাজ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রায় নির্ভুল হয়।

সহ-সম্পাদক একজন রিরাইটম্যান বা সংবাদ পুনর্লেখক

সম্পাদনার টেবিলে প্রত্যহই বিভিন্ন কপিকে নতুন করে (Recast) লেখা হয়। অধিকাংশ পত্রিকার সহ-সম্পাদকরাই এই পুনর্লেখনের কাজ করে থাকেন। বিশেষত আমাদের দেশের অধিকাংশ পত্রিকার নিজস্ব কোন পুনর্লেখক বা রিরাইটম্যান নেই। দু-একটি প্রতিষ্ঠানে অবশ্য আছে। পুনর্লেখকের কাজটি খুবই কঠিন। কোন কোন স্টাফ রিপোর্টার এবং বিশেষ করে মফস্বল সংবাদদাতাদের লেখার মধ্যে অনেক সময়ই সঠিক বাঁধন থাকে না। সেগুলো অনেক সময়ই সুগ্রথিত থাকে না কিংবা তার ভেতরকার তথ্যাবলী গুরুত্ব অনুসারেও সাজানো থাকে না। ভাষাগত জটিলতা ও অশুদ্ধতাও থাকে। তথ্যেরও অনেক সময় ঘাটতি থাকে। বিভ্রান্তিকর তথ্যও থাকে। এসব কিছুকে ত্রুটিমুক্ত করে ঢেলে সাজালে একটি দুর্বল লেখাও জোরদার হয়ে ওঠে। তা সুখপাঠ্য ও সুললিত হয়। অনেক সময় আছে কোন রিপোর্টে তথ্যের ঘাটতি থাকে, বিশেষ করে কোন ঘটনার সর্বশেষ পরিস্থিতি অনুল্লেখ থাকে। অনেকগুলো সময়ানুগও থাকে না। এসব ক্ষেত্রে পুনর্লেখক ঘটনার সর্বশেষ পরিস্থিতি দিয়ে সংবাদ বিবরণটিকে সজীব করেন। কাহিনীকে সময়পোযোগী করে গড়ে তোলেন।

অনেক রিপোর্টারই ভালো ভালো তথ্য এনে থাকেন বিশেষ করে যাঁরা অর্থনীতি, পরিবেশ বা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় কভার করেন। কিন্তু তাঁদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের মূল ভাবটিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হন না। আবার অনেকে সেই সব তথ্যাবলী এলোমেলো করে সাজান। একজন পুনর্লেখক এসব কিছু পুনর্বিন্যাস (Rejigging) করেন। তিনি মূল ভাবটিকে চিহ্নিত করে তা সংবাদশীর্ষে নিয়ে আসেন। পুরো কাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে লেখেন। কাহিনীর মধ্যে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনেন। প্রয়োজনে তিনি কাহিনীর প্রতিটি অনুচ্ছেদ বা বাক্য নতুনভাবে লিখে কাহিনীটির একটি স্বতন্ত্র ও আকর্ষণীয় চেহারা বা অবয়ব দেন। কাহিনীটি খুব বড় হলে তিনি তার বপু ছেঁটে ফেলেন আবার কাহিনীর অবয়ব ছোট হলে তা বড় করার ব্যবস্থা করেন।

পুনর্লিখনের ফলে কোন কাহিনী নতুন একটি রূপ ধারণ করলেও মৌলিক দিক দিয়ে তার কোন ক্ষতি হয় না। বরং এই প্রক্রিয়ায় কাহিনীটি নিশ্চিতরূপেই উন্নততর হয়। পুনর্লিখনের মাধ্যমে কোন কাহিনীর গঠনশৈলী উন্নত ও ঝরঝরে হয়। কাহিনীটি বা সংবাদবিবরণীটি নতুন একটি রূপ নেয়ার পাশাপাশি তা আরো বেশি তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সবের কৃতিত্ব পুনর্লেখকরূপী সহ-সম্পাদকের।

একজন সহ-সম্পাদক তাঁর পেশাগত দায়িত্বের কারণেই সংবাদমূল্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন। ভাষার ওপর তাঁর দখল থাকে। দুনিয়া সম্পর্কে এবং দুনিয়ার সর্বশেষ হাল হকিকত সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল থাকেন। ফলে তিনি একজন চমৎকার ও দক্ষ পুনর্লেখকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে জরাজীর্ণ কাহিনীতেও প্রাণপ্রাচুর্য আনতে পারেন, নীরস কাহিনীকে সজীব করে তুলতে পারেন।

দু-চারজন বাদে সহসাই কেউ পুনর্লেখক হতে পারে না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একজন সহ-সম্পাদক পুনর্লেখকের দায়িত্ব ও মর্যাদা অর্জন করেন। তাঁর স্থান বিদেশে একজন বিশেষ সংবাদদাতার সমপর্যায়ের। তাঁর বেতনও বেশি। কিন্তু আমাদের দেশের পত্রপত্রিকায় যেমন পুনর্লেখক নেই, তাঁর কাজেরও তেমন মর্যাদা নেই। এদেশে একজন সহ-সম্পাদক প্রতিনিয়ত পুনর্লেখনের কাজ করলেও তিনি সহ-সম্পাদকই। তাঁর প্রমোশনও নেই, কর্তৃপক্ষ তাঁর বেতনভাতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির দিকেও অতটা খেয়াল করেন না। তবে একথা ঠিক, আজকের সংবাদপত্রে সহ-সম্পাদকের সবচেয়ে বড় অবদান হলো পুনর্লেখন।

সহ-সম্পাদক কসাই নন

সংবাদপত্র বিভাগের দুটি অপরিহার্য বিভাগ হচ্ছে রিপোর্টিং ও বার্তা বিভাগ। এই দুই বিভাগের সংবাদসেবীরা সংবাদপত্রের এক একজন অপরিহার্য হাতিয়ার। একজন রিপোর্টার ঘামে ভিজে, রোদে পুড়ে সংবাদ উপযোগী সব কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। সেগুলোকে তাঁর নিজের মতো করে সাজিয়ে তিনি বার্তা বিভাগে পাঠান। কিন্তু তাঁর সেসব লেখা অনেক সময় সংবাদাকারে থাকে না। অনেক রিপোর্টারই তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলোকে সংবাদ লেখার রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী সাজিয়ে দেন না। সঙ্গতকারণেই সহ-সম্পাদক রিপোর্টারের লেখা সংবাদ প্রতিবেদনটি রদবদল করে ফেলেন। সকালে উঠে রিপোর্টার যখন দেখেন তাঁর লেখার অনেক কিছুই নেই তখন তিনি সংবাদ-বিরণীতে ছুরি চালানোর জন্য সহ-সম্পাদককে 'কসাই' বলে গালিগালাজ করতে ছাড়েন না। আবার সেই রিপোর্টই যদি কোনদিন সকালে উঠে দেখলেন সনামে (Byline report) তাঁর এমন একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠক সমাজে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে, অথচ সে রিপোর্টটি তিনি সেভাবে লিখেননি বা সাজাননি। একটি রিপোর্টিং ভালো হলে তাঁর সকল প্রশংসা রিপোর্টারের, সহ-সম্পাদক যে তিমিরে সেই তিমিরে।

তাঁর কোন নাম নেই, তাঁকে কেউ চেনে না। অনেকে তাঁকে সাংবাদিক বলেও স্বীকার করে নিতে চান না।

একজন রিপোর্টারের লেখা একখানি রিপোর্ট ঢিলেঢালা, তথ্যগতভাবে দুর্বল ও অবিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে মনে হয় রিপোর্টটি তার দারুণ হয়েছে। সেই রিপোর্টে সহ-সম্পাদক কলামের ছুরি চালিয়ে তা সুন্দর ও সুখপাঠ্য করে গড়ে তুললেও রিপোর্টার মনে করে 'ওই লোকটি (সহ-সম্পাদক) হাতের কলম ও পেশাগত ক্ষমতার বাহাদুরি দেখিয়েছে'। এই অভিযোগ অর্থহীন। কোন সহ-সম্পাদকই কোন রিপোর্টেরই অঙ্গহানি ঘটাতে চান না। যদি না কোন সহ-সম্পাদকের সঙ্গে কোন রিপোর্টারের পেশাগত বা ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকে।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, সংবাদপত্রের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে রিপোর্টারের চাইতে সহ-সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিচ্ছন্ন। সংবাদপত্রের অন্যান্য বিভাগ তাঁকে কাঁচামাল সরবরাহ করে। তিনি সংবাদপত্র তৈরি করেন, তৈরি পণ্যকে সাজান। এই জন্যই বলা হয়ে থাকে রিপোর্টাররা সংবাদ লেখেন, সহ-সম্পাদকরা তা তৈরি করেন (Reporters write the report, sub-editors make it)। এটাকে আরো সহজভাবে বলা চলে সহ-সম্পাদকরা হচ্ছেন পত্রিকার কারিগর আর রিপোর্টারা হচ্ছে তাঁদের কাঁচামালের যোগানদার।

সংবাদপত্র সহ-সম্পাদকদের সৃজনশীলতার ফসল। তিনি সম্পাদকের প্রতিভূ হিসেবে তাঁর মহান দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কাজের হেরফেরের মধ্যে দিয়ে একটি সংবাদপত্রের উত্থান বা পতন ঘটে থাকে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা

পৃষ্ঠাসজ্জা কী ও কেন

চমৎকার একটি পত্রিকার জন্য চারটি অত্যাবশ্যক শর্ত বা উপাদান হচ্ছে তার ভালো সংবাদ কভারেজ, ভালো সংবাদ বাছাই, ভালো সংবাদ সম্পাদনা এবং ভালো ও চিত্তাকর্ষক শিরোনাম। এছাড়া পঞ্চম আরেকটি শর্ত বা উপাদান আছে যা ছাড়া একটি পত্রিকার চমৎকারিত্ব বা উৎকর্ষ পরিপূর্ণ হয় না। সেই পঞ্চম উপাদানটি হচ্ছে সেই পত্রিকার ভালো অঙ্গসজ্জা বা মুদ্রণসজ্জা, বা নকশা (typographical design)-এটাকে আমরা সহজ অর্থে পত্রিকার মেকআপ বা পৃষ্ঠাসজ্জা বলতে পারি। মেকআপ বা পৃষ্ঠাসজ্জা হচ্ছে পত্রিকার নকশা অঙ্কনের প্রক্রিয়া। লে আউট (Lay out) ও ডামি (Dummy) হচ্ছে মেকআপ বা পৃষ্ঠাসজ্জার অংশ।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসমূহের অঙ্গসজ্জার লক্ষ্য হচ্ছে পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বা নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব বা সত্তাকে প্রতিফলিত করা। পত্রিকার ভালো নকশা পাঠককে পত্রিকা পড়তে আকৃষ্ট করে ও সাহায্য করে। ভালো নকশা পত্রিকা পাঠককে প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। অঙ্গসজ্জা হচ্ছে পত্রিকার নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব বা অন্য কথায় পত্রিকার বৈশিষ্ট্যের চাক্ষুষ প্রমাণ। আর একারণেই একজন মানুষ একনজরেই একটি পত্রিকাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের রেকর্ড বলে চিহ্নিত করতে পারে।

প্রতিদিন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে হাজার হাজার খবর আসে। এসব খবরের সবই যদি আমরা পত্রিকার পাতায় ঠাঁই দিতে চাই তাহলে প্রতিদিন হয়তো পঞ্চাশ পাতা ছাপিয়েও কূল পাওয়া যাবে না। আর সেজন্যই সীমিত জায়গার মধ্যে পৃষ্ঠাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানোটাই হচ্ছে পৃষ্ঠাসজ্জার মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, মূলত প্রথম পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জার কথা মনে রেখেই আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচনা, তবে অন্যান্য পৃষ্ঠার কথাও এতে কিঞ্চিৎ থাকবে।

পৃষ্ঠাসজ্জার উদ্দেশ্যসমূহ কী কী তা আমরা সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি।
এক. পৃষ্ঠাসজ্জা পত্রিকার পাতার শিরোনামগুলোর মূল উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে।
দুই. পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।
তিন. সংবাদের শ্রেণী (গ্রেড) নির্ণয় করে।
চার. সংবাদ কাহিনী পাঠকের মনে ধরতে সাহায্য করে।
পাঁচ. পৃষ্ঠাসজ্জা সত্য কথা বিবৃত করে এবং

ছয়. পৃষ্ঠাসজ্জা পত্রিকার পাতার অঙ্গসজ্জায় সাহায্য করে।

অর্থাৎ মেকআপ বা পৃষ্ঠাসজ্জা শিরোনামের উদ্দেশ্য সাধন থেকে শুরু করে অনেক কিছুই করে থাকে। কোন পত্রিকার জন্য পৃষ্ঠাসজ্জা অন্যতম অপরিহার্য শর্ত নয়। অর্থাৎ ভালো খবর না দিয়ে শুধু পাতার চেহারা ভালো করে সাজিয়ে কোন পত্রিকা নিজেকে বিকোতে পারবে না। একটা কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, সংবাদের জন্যই পৃষ্ঠাসজ্জা, পৃষ্ঠাসজ্জার জন্য সংবাদ নয়। প্রকৃতপক্ষে পৃষ্ঠাসজ্জার মাধ্যমে খবরের উপযোগিতা, স্পষ্টতা ও সেগুলোর মান বা শ্রেণী অনুযায়ী সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। একটা বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পত্রিকার পাতায় বিভিন্ন খবরের মান বা শ্রেণী নির্ধারণ ছাড়াও তাতে একটা ভারসাম্য ও ছন্দ নিয়ে আসা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ফুটিয়ে তোলাই পৃষ্ঠাসজ্জার লক্ষ্য। পত্রিকায় খবর, শিরোনাম, ছবি, বিজ্ঞাপন, কার্টুন সবই এক একটা ইউনিট বা একক। কিন্তু এই একেকটি ইউনিটকে আনুপাতিক হারে সাজাতে হয়। আনুপাতিক হারে সাজাতে পারলেই পত্রিকার পাতায় বৈপরীত্যের মধ্যেই একটা ভারসাম্য ও ছন্দ গড়ে ওঠে। ছন্দ ও ভারসাম্যের সৃষ্টি হলেই পত্রিকাটি পাঠোপযোগী ও রসযোগ্য হয় এবং পাঠক তা পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পাঠকের মনটাকে বুঝতে হয়, পাঠকের চিন্তাচেতনা অনুযায়ী খবর, ছবি প্রভৃতি দিতে পারলেই কেবল তার সার্থক পরিণতি।

পৃষ্ঠা সাজানোর বিভিন্ন তত্ত্ব

বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই বাম থেকে ডানে লেখা হয়। মানুষের চোখের দেখাটাও নাকি এরকম, বাম থেকে ডানে চলে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক লিপি আছে যা ডান থেকে বামে লিখতে হয়। কোনটা আবার উপরে নিচে লিখা হয়। তবে আদর্শ ব্যবস্থাটা হচ্ছে বাম থেকে ডানে লেখা। বিশেষ করে আমাদের কাছে প্রচলিত দুটো ভাষা বাংলা ও ইংরেজির লিপি বাম থেকে ডানে লেখা হয়। আর এই আদর্শ ব্যবস্থাটা মাথায় রেখেই পত্রিকার পৃষ্ঠাটিও সাজানো হয়। কিংবা অন্য কথায় বলা চলে, এভাবেই সাজানো উচিত।

আমরা নিচে কয়েকটি চিত্র (ফিগার) অঙ্কন করে দেখাবো যা থেকে পৃষ্ঠা সাজানোর কতকগুলো বিষয় জানা যাবে। আসলে সংবাদপত্রের পণ্ডিত ও গবেষকরা বিভিন্ন গবেষণা চালিয়ে এই ফিগারগুলো অঙ্কন করেছেন এবং তাঁদের মতে মানুষের চোখ সেইভাবে চলে এবং তদনুসারেই পত্রিকার পৃষ্ঠাসজ্জা বা মেকআপ করা উচিত।

পৃষ্ঠা সাজানোর ক্ষেত্রে একটি তত্ত্বের নাম জেড থিওরি বা জেড তত্ত্ব। বলা হয়ে থাকে চোখের পর্যবেক্ষণের ধারা থেকেই এই জেড থিওরির উদ্ভব হয়েছে। চিত্রটি নিম্নরূপঃ

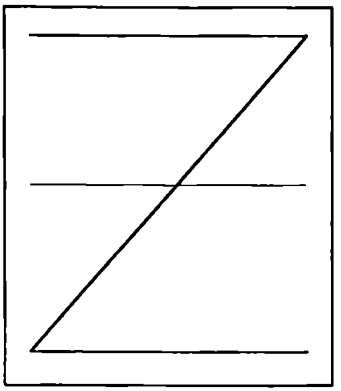

চিত্র ঃ ক

ইংরেজি বর্ণমালার শেষ বর্ণ 'জেড'-এর মতোই নাকি চোখ পত্রিকার পাতার বাম থেকে ডানে চলে যায়, তারপর আড়াআড়ি নিচে চলে আসে এবং শেষে আবারো তা পত্রিকার পাতার লোয়ার ফোল্ডের (Lawer fold) বা নিচের অংশে উপরের মতোই বাম থেকে ডানে চলে যায়। এ তত্ত্বের যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা এভাবেই পত্রিকার পাতা সাজানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

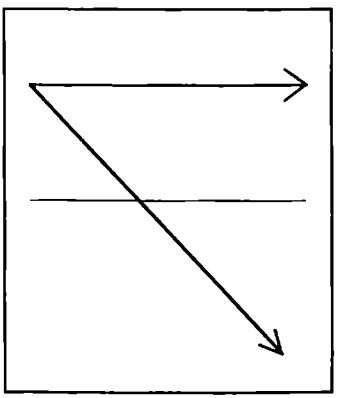

চিত্র ঃ খ

অনেকে বলে থাকেন প্রথমত চোখ বাম থেকে ডানে চলে যায়, তারপর তা আবার উপরের অংশের (Upper fold বা উপরের ভাঁজ) বাম প্রান্তে চলে যায় এবং আড়াতাড়িভাবে নিচের ভাঁজের ডান কোণার দিকে চলে আসে (চিত্র নং ঃ খ)। এ ধারার কথা বলে থাকেন যাঁরা তাঁরা তাঁদের খবরের মানক্রমিক বিন্যাস এভাবেই করতে

বলেন। তবে চোখ উপরের ভাঁজে বাম থেকে ডানে গিয়ে আবার বাম কোণায় এসে আড়াআড়ি নিচের ভাঁজের ডান কোণার দিকে চলে আসার এই তত্ত্বের সঙ্গে অনেকেই একমত নন। হ্যাঁ, একমত অনেকেই না হতে পারেন। তবে পৃষ্ঠা সাজানোর এ একটা মত বটে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, আমাদের দেশের অনেক পত্রিকাই এই তত্ত্ব অনুসারে ফার্স্ট লিড, সেকেন্ড লিড, থার্ড লিড সাজিয়ে থাকেন। চোখটা এরকম যায় বলেই হয়তো বা বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের বড় ধরনের ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রথম পাতার নিচের ভাঁজের ডান পাশে দিতে চান।

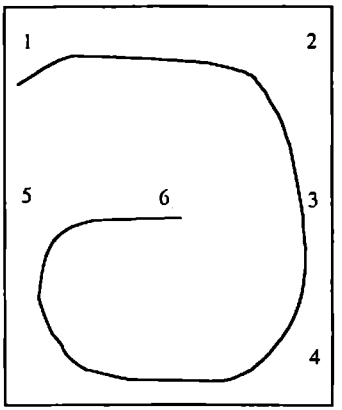

চিত্র নং ঃ গ

চিত্র নং গ-এ যে ফিগারটি দেখানো হয়েছে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সাজানোর পরিভাষায় তার নাম রিভার্স-৬ (Reverse-6) স্টাইল বা ইংরেজি উল্টো-৬ স্টাইল। এই ধারায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের মতে, মানুষের চোখ উপরের চিত্রে অঙ্কিত ইংরেজিতে উল্টো ছয়-এর এর মতো করে ঘুরপাক খায়। এ ধারার সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতদের মতে, মানুষের চোখ পত্রিকার পাতার উপরের ভাঁজের বাম কোণা থেকে ডান কোণা অবধি চলে যায় এবং তা খাড়াখাড়িভাবে নিচের ভাঁজের একদম প্রান্ত কোণায় চলে এসে বাম দিকে ধাবিত হয়। তারপর তা উপরের দিকে উঠে পত্রিকার ফোল্ড বা ভাঁজ বরাবর ডানদিকে এগিয়ে মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে শেষ হয়। অতএব এইভাবে পত্রিকার খবর বা অন্যান্য ইউনিটকে গুরুত্ব অনুসারে সাজানো হয় এবং মান নির্ধারণ বা গ্রেডেশন দেয়া হয়। এখানে বলে রাখা ভালো, গুরুত্বের অনুসারে পত্রিকার খবর বা অন্যান্য ইউনিটকে স্থান নির্ধারণের এই বিষয়টিকে Treatment বলে। এটাকে মানদণ্ডও বলা যায়। খবরের ক্ষেত্রে অবশ্য ছোট বড় টাইপ দিয়েও তার বিভিন্ন মান নির্ধারণ করা যায়। যাই হোক, উল্লিখিত তিনটি রেখাচিত্র অনুযায়ী খবরের পৃষ্ঠা সাজানোর যে পরামর্শ আমরা পেলাম

তার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য থাকলেও একটা বিষয়ে মৌলিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেছে। আর তা হলো পত্রিকার পাতা খুললেই মানুষের চোখ উপরের ভাঁজের বাম থেকে ডানে চলে যায় এবং ডান কোণা ধরেই নিচের দিকে কখনো সরাসরি, কখনো আড়াআড়ি বাম দিকে চলে আসে, চোখের এই সহজাত প্রকৃতির জন্যই পত্রিকার বার্তা সম্পাদক দিনের প্রধান সংবাদটি সাধারণত উপরের ভাঁজের বাম দিকে স্থান দেন, তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটিকে ডানের দিকে স্থান দেন, তারপর নিচের দিকে স্থান দেন অধিকতর কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলোকে। তবে সর্বক্ষেত্রেই যে বাম কোণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ স্থান পায় এমন নয়, এর ব্যতিক্রমও আছে। অর্থাৎ ডানদিকের কোণাতেও দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে স্থান করে দিয়ে পৃষ্ঠা সাজানোর রীতি রয়েছে। এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

চোখের দেখার প্রকৃতি থেকে যেমন পৃষ্ঠাসজ্জা বা মেকআপের ধরন গড়ে ওঠে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শিরোনাম গঠন বা লিখন এবং তার বিস্তার ঘটে থাকে। একটি শিরোনামকে এক কলাম বা স্তম্ভে বা সিঙ্গেল কলামে লেখা যায়। আবার সেই শিরোনামকে অবিকৃত রেখেই দুই কলামে বা স্তম্ভে বিস্তৃত করা যায়। তা তিন কলাম বা চার কলামও করা যায়। আবার তার চেয়ে বেশি করতে গেলে অবশ্য শিরোনামের শব্দ সংখ্যা অনেক সময় বাড়াতে হয়। চোখের দেখার প্রকৃতি অনুসারে আজকাল শিরোনামের বিস্তৃতি ঘটিয়ে মেকআপ করা হচ্ছে। অথচ পুরোনো আমলে পত্রিকার পাতায় সিঙ্গেল কলামেরই প্রাধান্য থাকতো। সংবাদের বিবরণী কলামের উপর থেকে ক্রমশ নিচের দিকে চলে যেতো। এতে করে যেমন সংবাদের Treatment ও Gradation করা যেতো না, আবার বারবার উপরে নিচে পড়তে গিয়ে চোখও ক্লান্ত হয়ে পড়তো। এই বিষয়টিকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। অর্থাৎ পৃষ্ঠাসজ্জার পদ্ধতি মূলত দুই প্রকার।

এক. Vertical Makeup বা উল্লম্ব পৃষ্ঠাসজ্জা এবং
দুই. Horizontal Makeup বা আনুভূমিক পৃষ্ঠাসজ্জা

উল্লম্ব পদ্ধতির পৃষ্ঠাসজ্জার বৈশিষ্ট্য

এক. এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় সাধারণত এক-কলাম বিশিষ্ট শিরোনামের প্রাধান্য থাকে। এছাড়া মূল শিরোনামে ডেকের প্রাধান্য থাকে।

দুই. এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা খুবই অনমনীয়, ফরম্যাট অনুযায়ী সংবাদ সন্নিবেশন করে পৃষ্ঠাসজ্জা করা হয় বলে এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা খুবই নিরস ও বৈচিত্র্যহীন। সংবাদ

অনুযায়ী ফরম্যাট তৈরি না করে ফরম্যাট অনুযায়ী সংবাদ সন্নিবেশনের এই বিষয়টি হচ্ছে উল্লম্ব পৃষ্ঠাসজ্জার সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা। ফরম্যাট অনুযায়ী সংবাদ বপু নির্মাণ বা সন্নিবেশনের ফলে তা সম্পাদকীয়ের মতো মনে হয়।

তিন. পড়ার ক্ষেত্রে যে একটা স্বাভাবিক নিয়ম রয়েছে অর্থাৎ চোখ বাম থেকে ডানে চলে তাকে মেনে চলা হয় না বলে পাঠকের চোখ ক্লান্ত হয়, সে বিরক্ত হয়। পঠনে তাঁর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বাঁধার সৃষ্টি হয়।

চার. বিস্তৃত শিরোনাম (Spread-head) অর্থাৎ একাধিক কলামের শিরোনাম (Multi-column head) ব্যবহার হয় না বলে পাতাকে খুব কৃশকায় দেখায়।

পাঁচ. সংবাদের শিরোনামগুলো অধিকাংশই এক কলাম বিশিষ্ট হওয়াতে সংবাদের গুণগত পার্থক্য নির্ধারণ অর্থাৎ কোন গ্রেডেশন এতে করা যায় না।

ছয়. উল্লম্ব পৃষ্ঠাসজ্জায় সারা পৃষ্ঠায় কোথাও গ্রহণযোগ্য ফাঁকা জায়গা (Air বা White space) এখানে থাকে না।

সাত. এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় উপরের ভাঁজ (Upper fold) ভারি থাকে। নিচের ভাঁজ (Lower fold) হালকা থাকে। উপরের ভাঁজের তুলনায় নিচের ভাঁজ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তেমন প্রাধান্য পায় না।

আট. এ ধরনের পৃষ্ঠায় প্রচুর জ্যাম্প হেড চলে। কারণ প্রথম পাতাকে Show Window হিসেবে বিবেচনা করে তাতে যত বেশি পারা যায় খবরকে স্থান করে দিয়ে পেছনের কিংবা ভেতরের কোন পাতায় জাম্প দিয়ে দেয়া হয়।

আনুভূমিক পৃষ্ঠাসজ্জার বৈশিষ্ট্য

এক. এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জার মূল সুবিধা হচ্ছে এর সহজ পঠনযোগ্যতা। আমরা ছোটবেলা থেকেই বাম থেকে ডানে পড়তে অভ্যস্ত। এজন্যে এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় সংবাদবিবরণী পড়তে খুব সুবিধা।

দুই. এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় শিরোনামের বিস্তৃতির (Spread head) সুবিধা থাকে। স্বভাবতই বড় ধরনের শিরোনাম ব্যবহৃত হয়। এটা দেখতে ও পড়তে সুবিধা।

তিন. বড় ধরনের শিরোনাম ব্যবহৃত হলেও আরো কিছু বাহারি শিরোনাম এতে ব্যবহৃত হয়। এতে সংবাদের গ্রেডেশন ও ডিসপ্লে করা সহজ হয়।

চার. বিস্তৃত শিরোনাম ব্যবহার করার ফলে পাতায় বেশ কিছু প্যানেল বা আয়তাকার ক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে। তবে পৃষ্ঠার একঘেয়েমী ভাব দূর করা এবং পাশাপাশি দুটো বড় শিরোনামের সংবাদবিবরণীকে আপেক্ষিকভাবে পৃথক দেখানোর জন্যে মাঝে মাঝে সিঙ্গেল কলামের শিরোনাম ব্যবহৃত হয়।

পাঁচ. এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা (Air বা White space) থাকে। এটা পাঠককে পড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আয়েশ ও স্বস্তি দেয়।

ছয়. মনস্তাত্ত্বিক কারণেই পাঠক সাধারণত একটি খবরের পুরো অংশ পড়তে একবার এপাতা আরেকবার ওপাতায় যেতে চায় না। আর সেজন্যে আনুভূমিক পৃষ্ঠাসজ্জায় সাধারণত জাম্প দেয়া হয় না। যে পাতায় খবর দেয়া হয় সে পাতাতেই তার শেষ। ফলে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিবরণীগুলোই প্রথম পাতায় স্থান পায়। কিন্তু এর একটি অসুবিধা রয়েছে। প্রথম পাতায় যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক ভালো ভালো খবর না দেয়া যায় তাহলে তা প্রথম পাতার ন্যায় দেখতে আরো পাতায় পরিবেশন করা যেতে পারে। কিন্তু পত্রিকার পাতার সংখ্যা যদি বাড়ানো না যায় তাহলে সেটা সম্ভব নয়।

ভার্টিকাল বা উল্লম্ব পদ্ধতির ধরনটা হচ্ছে যে খবরের শিরোনাম ও বিবরণী (Matter) সাধারণত সীমিত জায়গার মধ্যে স্থান দেয়া হয় এবং তা ক্রমশ নিচের দিকে চলে যায়। অর্থাৎ চোখ বামে ডানে না গিয়ে উপরের থেকে ক্রমশ নিচে চলে যায়। এতে করে কোন সংবাদকে আরেকটি সংবাদ থেকে যেমন আলাদা করে বা গুরুত্বানুসারে বোঝানো যায় না, আবার পত্রিকার পাতায় আজকে কোন্‌টা প্রধান খবর তাও বোঝা যায় না। এটা না বোঝার আরো কারণ হলো, সীমিত জায়গায় অর্থাৎ এক বা দুই কলামে শিরোনাম লিখলে তার চেহারাটা কৃশকায় দেখায়। এছাড়া চোখের ওপরে চাপতো আছেই উপরে নিচে পড়তে গিয়ে। আগেকার দিনে প্রায়শই এমনভাবেই পৃষ্ঠা সাজানো হতো। এতে করে বিভিন্ন খবরের আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝানো যেতো না বলে এবং চোখকে স্বস্তি দেয়ার জন্য আনুভূমিক বা হরাইজন্টাল মেকআপের উদ্ভব হয়েছে।

দিনের কোন ঘটনার সংবাদকে যদি অন্য সব সংবাদ থেকে বড় করে দেখাতে চাই তাহলে বড় বড় শিরোনামে এবং চার পাঁচ কলাম জুড়েই তা সম্ভব। ব্যানার বা ফলাও শিরোনামতো কমপক্ষে ছয় থেকে শুরু করে আট কলাম জুড়েই হয়। উল্লেখ্য, ১৮৯০ সালের দিকে সর্বপ্রথম পত্রপত্রিকায় ব্যানার শিরোনামের প্রচলন শুরু হয়। ব্যানার শিরোনামের গুরুত্ব ও সুবিধা অনুধাবন করেই আনুভূমিক পৃষ্ঠাসজ্জার গুরুত্বটিও অনুধাবন করা গেছে। পত্রিকার পাতার উপর ভাঁজেই চার, পাঁচ বা ছয় কলাম জুড়ে

শিরোনাম দিয়ে যদি কোন খবর লেখা হয় তবে বোঝা যাবে ওই খবরটিই সেদিনের সেরা সংবাদ। হয়তো দ্বিতীয় সেরা সংবাদটি তার নিচে স্থান পাচ্ছে। তার শিরোনামের বিস্তৃতি হয়তো দুই থেকে তিন কলাম, এরকম করে গুরুত্বানুসারে ছোট বড় হতে পারে। অবশ্য সমান বিস্তৃতির দুটো শিরোনামের দুটো খবরের কম বেশি গুরুত্বকেও তুলে ধরা যায় একটি মোটা টাইপের হরফ দিয়ে অপরটিতে পাতলা টাইপের হরফ দিয়ে। অবশ্য আজকাল যে উপরের ভাঁজেই কেবল বড় বড় সংবাদ থাকে এমন নয়। আজকাল নিচের ভাঁজকেও ভারি করার চেষ্টা চলছে। তবে সেটা যে কেবল জোর করে ভারি করার চেষ্টা তা নয়। কোন দীর্ঘ কিন্তু আকর্ষণীয় খবরকে আলাদা করে গুরুত্বারোপ করার জন্য এবং পৃষ্ঠাসজ্জার সামগ্রিক স্বার্থে নিচের ভাঁজেও এক লাইনে পাঁচ ছয় কলাম শিরোনামের বিস্তৃতিসহ সংবাদ ছাপা হয়ে থাকে। এটাকে বলে Bottom Lead। এটাকে Anchor বা নোঙরও বলে। উল্লম্ব পদ্ধতির পৃষ্ঠাসজ্জায় Top heavy অর্থাৎ পৃষ্ঠার উপরের ভাঁজটিতে ভারি করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এখন অবশ্য নিচের ভাঁজকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। যাই হোক আনুভূমিক পৃষ্ঠাসজ্জার মাধ্যমে যেমন শিরোনামের বিস্তৃতি ঘটানো হয়, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংবাদের শরীর বা বিবরণী এক কলাম বা স্তম্ভে কম্পোজ না করে ডবল কলাম, তিন কলাম, চার পাঁচ ছয় কলামেও কম্পোজ করা হয়। এতে দেখতেও যেমন ভালো লাগে, বৈচিত্র্যমণ্ডিতও হয়, পড়তেও সুবিধা। এছাড়া আজকাল বড় কোন ঘটনার - যাকে আমরা Lead news বলি - সংবাদবিবরণী অনেক সময় এক পয়েন্ট বাড়িয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ বডি টাইপ বা সংবাদের শরীর যদি সাধারণত নির্মিত হয় ১০ পয়েন্টে, বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে তা ১১ পয়েন্ট করা যেতে পারে।

পৃষ্ঠাসজ্জা নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও সাধারণত প্রথম পাতার উপরের ভাঁজেই (Upper fold) দিনের সেরা সংবাদগুলোকে ঠাঁই দেয়া হয়। একজন বার্তা সম্পাদক পত্রিকার পাতার উপরের ভাঁজেই দিনের সেরা সংবাদগুলোকে স্থান দেন। তিনি সংবাদের ডামি করার সময় ডামির কেন্দ্রটিকে চোখের আন্দাজমতো ধরে দিয়ে উপরের অংশে সেরা সংবাদগুলোকে ঠাঁই দেন। তাঁর চোখের দেখার এই কেন্দ্রবিন্দুটি সাধারণত জ্যামিতিক কেন্দ্রবিন্দু বা সঠিক কেন্দ্রবিন্দুর চেয়ে একটু উপরেই হয়। এই কেন্দ্রবিন্দুকে কেন্দ্র করে যেমন বার্তা সম্পাদক উপরের অংশে সেরা সংবাদের ঠাঁই দেন আবার তেমনি ছবিগুলো যাতে ভাঁজের মাঝে না পড়ে যায় সেদিকেও খেয়াল রাখেন কিংবা ভাঁজের মাঝ বরাবর এমন কোন শিরোনাম বসান না যার ডেক ও ব্যাংক ভাঁজের উপরে নিচে পড়ে যায়। নিচে আমরা দুটো চিত্র অঙ্কন করে বিষয়টি অনুধাবনে সাহায্য করবো।

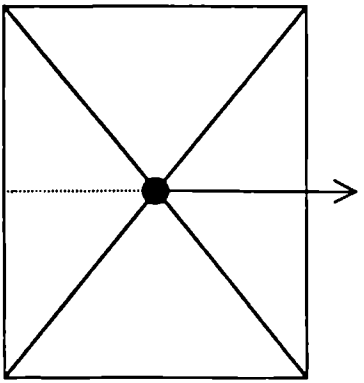

জ্যামিতিক কেন্দ্র বা
Geometrical centre

চিত্র নং ঃ ক

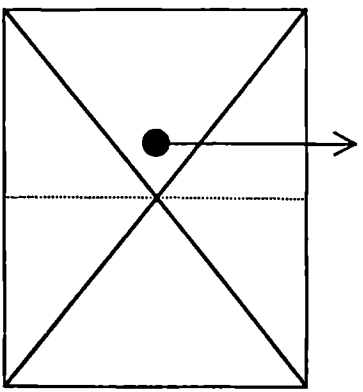

দৃষ্টিকেন্দ্র বা Optical centre

চিত্র নং ঃ খ

একটি পত্রিকার পৃষ্ঠাসজ্জা করার জন্য ডামির মাঝে যদি আড়াআড়ি করে রেখা টানা যায় এবং যে বিন্দুতে দুটি রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, সেটাই জ্যামিতিক কেন্দ্রবিন্দু বা প্রকৃত কেন্দ্র বা Geometrical Centre এবং এই বিন্দু বরাবর যদি সমান্তরাল রেখা টানা যায় তবে সেটা পত্রিকাকে দুটো ভাঁজে পরিণত করে। বার্তা সম্পাদক এই কেন্দ্রবিন্দুকে সামনে রেখেই তাঁর উপরের ভাঁজ ও নিচের ভাঁজের পৃষ্ঠাসজ্জা করে থাকেন। কিন্তু তিনি কখনই প্রত্যহ স্কেল নিয়ে ওই জ্যামিতিক কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণে প্রবৃত্ত হন না। চোখের আন্দাজেই এটা সারেন। এই চোখের আন্দাজে সারতে গিয়ে যাতে সংবাদপত্রের ইউনিটগুলোর (যেমন ছবি, শিরোনাম প্রভৃতি) Treatment ভাঁজের মাঝখানে না পড়ে

যায় সেজন্য তাঁর চোখের দৃষ্টি মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটু উপরের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। এই চোখের আন্দাজে নির্ধারিত হয় বলেই ওই কেন্দ্রবিন্দুটির নাম দৃষ্টিকেন্দ্র বা Optical centre। এ কেন্দ্রবিন্দুর সাহায্যেই বার্তা সম্পাদক পত্রিকার পাতার চারটি অংশের মাধ্যমে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ডামি সাজানোর ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অবশ্য অভিজ্ঞ বার্তা সম্পাদকের কাছে বিষয়টি জলের মতো পরিষ্কার। Respecting the fold বলে একটা কথা আছে। অর্থাৎ ভাঁজের মাঝখানে কখনেই কোন শিরোনাম বা ছবি দেয়া যাবে না। ভাঁজের ওপরে নিচে কোন শিরোনাম বা ছবি দিলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়, বিরক্তি আসে। শিরোনামের পুরো অংশ দেখতে না পারলে পত্রিকার বিক্রয়মূল্য (Sales Value) কমে যায়। ছবির মাঝখানে ভাঁজ পড়লেও তার সৌন্দর্যমূল্য ও বিক্রয়মূল্য কমে যেতে পারে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জার প্রকারভেদ

আজকাল পৃষ্ঠাসজ্জার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পৃষ্ঠাসজ্জায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগেকার উল্লম্ব পৃষ্ঠাসজ্জার বদলে আজকাল আনুভূমিক পৃষ্ঠাসজ্জার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে, উল্লম্ব পৃষ্ঠাসজ্জাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করে একটা নতুন ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা করা হয়েছে। আর এই দুইয়ের সমন্বয়েই বলা যায় বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা গড়ে উঠেছে। আমরা সাধারণত যেসব পৃষ্ঠাসজ্জা দেখতে পাচ্ছি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

এক. ভারসাম্যপূর্ণ বা সঠিক ভারসাম্য বা প্রচলিত ভারসাম্য বা সাদৃশ্যপূর্ণ পৃষ্ঠাসজ্জা (Balance or Exact balance or Formal balance or Symmetrical balance makeup)

দুই. বৈপরীত্য ও ভারসাম্য পৃষ্ঠাসজ্জা বা অপ্রচলিত ভারসাম্য বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ভারসাম্য (Contrast and balance makeup or Informal balance or Isymmetrical balance makeup).

তিন. উদ্দীপ্ত পৃষ্ঠাসজ্জা (Brace makeup)

চার. সার্কাস বা উল্টোপাল্টা পৃষ্ঠাসজ্জা (Circus makeup)

পাঁচ. ব্রোকন বা মিক্সড বা মিশ্র পৃষ্ঠাসজ্জা (Broken or Mixed makeup)

সঠিক বা সুষম ভারসাম্যপূর্ণ পৃষ্ঠাসজ্জা ঃ এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় সংবাদপত্রের বিভিন্ন ইউনিটের একটি পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সমান করে সজ্জা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় পুরো পাতাতেই সংবাদ, ছবি, শিরোনাম বা বক্স প্রতিটিরই সুষম বিন্যাস করা হয়। পুরোনো পত্রপত্রিকায় এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জার দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাবো যে যদি কোন পাতার বাম দিকে দু'কলামের একটি সংবাদ দেয়া হয়েছে তাহলে ডানদিকেও একই ধরনের শিরোনাম দেয়া হয়েছে। এক পাশে হয়তো তিন কলামের একটি খবর গেছে, আরেক পাশেও তিন কলামের আরেকটি খবর গেছে। আবার হয়তো দেখা গেলো একপাশে একটি ছবি গেছে, ঠিক অপর পাশেও সম আকারের আরেকটি ছবি দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় এক ধরনের সংযম ও গাম্ভীর্য থাকলেও এই পৃষ্ঠাসজ্জার সমস্যা এই যে পরিকল্পনায় সৃজনশীলতার অভাব থাকলে তা একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। এজন্য এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা যেসব সংবাদপত্র করে থাকে যারা সুষম তথা সঠিক ভারসাম্যকে বজায় রেখেই একেকদিন একেক রকম রদবদল করে পৃষ্ঠা সাজান, বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেন। এমন হতে পারে উপরের ভাঁজে দু'পাশে দু'কলাম করে দুটো সংবাদ শিরোনাম। নিচের ভাঁজে দু'পাশে তিন কলাম করে দুটো সংবাদ। এর মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনার জন্য হয়তো উপরের ভাঁজের নিচের দিকে মাঝ বরাবর একটি তিন কলামের সংবাদ দেয়া হলো। নামি পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইম্‌সও একসময় সুষম ভারসাম্যপূর্ণ পৃষ্ঠাসজ্জার মাধ্যমে সাজানো হতো। ভারতেও এরকম দু'একটি পত্রিকা লক্ষ করা গেছে। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বরাবরই সংবাদ কভারেজ ও পরিবেশনে এক ধরনের গাম্ভীর্য, সংযম ও সিরিয়াসনেস বজায় রাখা হয়।

বৈপরীত্য ও ভারসাম্য পৃষ্ঠাসজ্জা: নামেই বোঝা যায় এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায়ও ভারসাম্য থাকে তবে তা সুষম নয়; বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে বৈপরীত্যের মাধ্যমেই এক ধরনের ভারসাম্য এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। নির্ভেজাল ভারসাম্যে যে একঘেয়েমিতা আছে তা ভেঙেও একধরনের ভারসাম্য করা যায়, তবে তা বিপ্রতীপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। সুষম ভারসাম্যে যেমন পৃষ্ঠার একদিকে যে কয় কলামের শিরোনাম দেয়া হয় সমপরিমাণের কলাম দিয়েই হয়তো আরেক পাশে আরেকটি সংবাদ দেয়া হলো, অথবা এক পাশে যে আকারের ছবি দেয়া হলো অন্য পাশে হয়তো সমান আকারেরই আরেকটি ছবি দিয়ে নির্ভেজাল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হলো। কিন্তু বিপ্রতীপ ভারসাম্যের ধর্ম হচ্ছে একপাশে ভারি হলে আরেক পাশে হালকা। তার নিচে হয়তো আবার ভারি, তার উল্টো পাশে হালকা।

এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় এমন হতে পারে যে পৃষ্ঠার বাম পাশে তিন কলামের শিরোনামসহ একটি সংবাদ দিয়ে হয়তো সেদিনের শীর্ষ সংবাদ (Leadnews) তৈরি হলো। তার পাশে হয়তো একটি তিন কলামের ছবি দেয়া হলো। তার ডান পাশে হয়তো ছোট পয়েন্টের টাইপে ডবল কলামের একটি শিরোনামসহ একটি সংবাদ ছাপা হলো। ডানপাশে এই একটু হালকা হলো বলে হয়তো তার নিচে একটা ভালো ছবি ছাপা হলো। হয়তো তার বাম পাশে আরেকটি ডবল কলামের সংবাদ ছাপা হলো। আবার নিচের ভাঁজে ওপরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য পাঁচ থেকে ছয় কলামের একটা বটম লিড (Bottom Lead) দেয়া হলো। একপাশে হয়তো একটা বিজ্ঞাপন গেলো তো আরেক পাশে তিন কলামের সংবাদ গেলো। প্রকৃতপক্ষে পৃষ্ঠার পুরোটা জুড়ে কোথাও হালকা, কোথাও ভারি এবং শিরোনামের ছোট বড় ব্যবহার কিংবা বিভিন্ন আকারের ছবি অথবা বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন ব্যবহার করে বিরপীতধর্মী এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় সবসময়ই পাতায় একটা নতুনত্ব আনা যায়। এতে সবসময়ই একটা বৈচিত্র্য থাকে, পাঠক দেখে সবসময়ই তৃপ্তি পায়। বিপরীতধর্মী ভারসাম্যের এই পৃষ্ঠাসজ্জা আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রতিনিয়তই হয়ে থাকে। এ ধরনের পৃষ্ঠায় সংবাদের গুরুত্ব ও শ্রেণী নির্ধারণ বা গ্রেডেশন করা যায়। এ ধরনের ভারসাম্যে সত্যিকারের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয় বলে একে সুপার ব্যালান্সও (Super Balance) বলে।

উদ্দীপ্ত পৃষ্ঠাসজ্জা: এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা সাধারণত সর্বত্র দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে সাধারণত এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা দেখা যায়। এর কারণ হলো ওই সব শহরের সংবাদপত্র বিক্রেতারা খোলা তাকে (Shelf) খবরের কাগজ এমনভাবে ভাঁজ করে রাখে যে তাতে কেবল সংবাদপত্রের ওপরের ভাঁজের ডানদিকে কোণার অংশই দৃশ্যমান হয়। তাই দিনের প্রধান ও সেরা সংবাদগুলো ওপরের ভাঁজের ডানদিকের কোণার অংশেই বসানো হয়। সাধারণত তিন কলামের একটি সংবাদ (দুই বা চার কলামও হতে পারে) ডানদিকে বসিয়ে তা পাতার অষ্টম কলাম দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে আনা হয়। পত্রিকাটির অন্যান্য অংশের শিরোনামগুলো এমনভাবে দেয়া হয় যে দর্শকের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই ডানদিকের দিকে ধাবিত হয়। স্বভাবতই সেটা হয়ে যায় ওই পৃষ্ঠাটির কেন্দ্রবিন্দু। পত্রিকাটিকে চার ভাঁজ করার পর যে সমকোণী ত্রিভুজ গড়ে ওঠে সেই ত্রিভুজের অতিভুজ বা দেয়ালের দিক একটি ধনুর্বন্ধনীর (Brace) একটা চেহারা বা উদ্দীপ্ত ভাব ফুটে ওঠে, তার জন্যই এই পৃষ্ঠাসজ্জাকে উদ্দীপ্ত বা ব্রেস পৃষ্ঠাসজ্জা বলা হয়। কোন দিনে সংঘটিত সর্বগ্রাসী সংবাদই এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জার জন্য উপযুক্ত। কিন্তু সমগুরুত্বসম্পন্ন একাধিক ঘটনা যদি একই দিনে ঘটে যায় তাহলে ওইটুকু জায়গায় স্থান দেয়া বা তার গ্রেডেশন করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

ওপরের ভাঁজের ডান পাশে ভারি করে পৃষ্ঠাসজ্জার এই প্রবণতা সাধারণত অনুসরণ করা হয় না। কারণ এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন কম থাকে। এভাবে সাজানো কঠিনও বটে। আমাদের দেশে সাধারণত দু-একটি পত্রিকায় প্রায় এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা অনুসরণ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দৈনিক জনকণ্ঠ প্রায় প্রতিদিন উপরের ভাঁজে একটি ব্যানারের মতো শিরোনাম বসিয়ে দেয় এবং এর বিস্তৃতি ঘটে প্রায় ষষ্ঠ কলামে।

পৃষ্ঠাসজ্জার ওই ধরনটিকে কখনো কখনো ফোকাসমেকআপ বা কেন্দ্রবিন্দু পৃষ্ঠাসজ্জা বলা হয়। যেহেতু এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় দিনের সেরা খবর পত্রিকার পাতার ওপরের ভাঁজের ডানদিকের অংশের বাম কোণা থেকে ডান কোণার দিকে উঠে গিয়ে সাধারণত অষ্টম কলাম দিয়ে নিচে নেমে আসে তাই সংশ্লিষ্ট সংবাদ কাহিনীটি ওপরের ভাঁজের ডানদিকের অংশের ডানপ্রান্তে বসে দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। স্বভাবতই একে কেন্দ্রবিন্দু পৃষ্ঠাসজ্জা বলা হয়। শুধুমাত্র ডানপাশের এই ভারিক্কির জন্য একে ফলাও পৃষ্ঠাসজ্জাও বলা হয়।

সার্কাস বা উল্টোপাল্টা পৃষ্ঠাসজ্জা ঃ পত্রিকার পাতা সাজানোর মধ্যে একটি রুচিশীলিতা ও নান্দনিক দিক রয়েছে। কিন্তু সার্কাস মেকআপ বা উল্টোপাল্টা পৃষ্ঠাসজ্জায় এই রুচি বা নান্দনিকতার কোন বালাই নেই। এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় সংবাদের আপেক্ষিকতা বা গুরুত্ব থাকে না। বড় বড় ঘন কালো অক্ষরে বড় বড় শিরোনামে সংবাদগুলো পাতার যেখানে সেখানে এমনভাবে বসানো থাকে যে পাঠক কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা পড়বেন সে ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় সংবাদগুলোর গ্রেডেশনও বোঝা যায় না। ফলে পাঠক কোন্ খবরটা ফেলে কোন্‌টা পড়বেন তা নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় ব্যবহৃত শিরোনামগুলোর ভাষাও অনেক ক্ষেত্রেই অশালীন, কদর্য ও অতিনাটকীয়তায় ভরা থাকে। এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা সাধারণত চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী (Sensational) বা হলুদ (Yellow) সাংবাদিকতার জন্য খুবই উপযোগী হয়ে থাকে। অতিরঞ্জিত খবরাখবরই এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জার মাধ্যমে স্থান করে দেয়া যায়। এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় সাধারণত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সারা পৃষ্ঠা জুড়ে এলোমেলো বা উল্টোপাল্টাভাবে শিরোনামগুলো বসানো হয়। এমনও দেখা যায়, একই পৃষ্ঠাতেই একই দিনে গোটা তিনেক ব্যানার শিরোনাম করা হয়েছে। উল্টোপাল্টাভাবে পৃষ্ঠা সাজানোর এই ধরনকে অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক খোন্দকার আলী আশরাফ 'আউলা ঝাউলা' পৃষ্ঠাসজ্জা বলে নামকরণ করেছেন।

ব্রোকন্ বা মিক্সড বা মিশ্র পৃষ্ঠাসজ্জা: এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা সারা পাতা জুড়ে অসংখ্য আকার ও আকৃতির শিরোনাম ব্যবহার এবং প্রতিটি কলামের একাধিক স্থানে ভাঙা হয় বলে একে ব্রোকন্ বা মিক্সড পৃষ্ঠাসজ্জা বলা হয়। এ ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জায় ভারসাম্যের দিকে মোটেই লক্ষ রাখা হয় না। পৃষ্ঠা সাজানোর ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা থাকে। ফলে পাতা জুড়ে অসংখ্য আকার আকৃতির শিরোনামে অসংখ্য খবরকে স্থান করে দেয়া হয়। কলাম মাঝে মাঝে ভেঙে ফেলা হয়। সুনির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে ভেঙেচুরে পৃষ্ঠা সাজানোর ফলে তার সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হয় বটে তবে তা সার্কাস পৃষ্ঠাসজ্জার মতো পুরোপুরি উল্টোপাল্টা করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্রোকন্ মেকআপের চূড়ান্ত রূপটিই হচ্ছে সার্কাস মেকআপ। অসংখ্য আকার আকৃতির শিরোনাম ব্যবহার ও কলাম অজস্র জায়গায় ভেঙে ফেললেও এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জাকেও মনোরম ও আকৃষ্ট করে তোলা যায়। অবশ্য তার জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সাথে সাথে বার্তা সম্পাদকের সৃজনশীলতা।

এতো গেলো পৃষ্ঠাসজ্জার কতকগুলো সুপরিচিত ও স্বল্প পরিচিত পদ্ধতি। অবশ্য উল্লিখিত পাঁচ পদ্ধতির পৃষ্ঠাসজ্জাই মূলত উল্লম্ব ধারার পৃষ্ঠাসজ্জার অন্তর্ভুক্ত। যদিও বৈপরীত্য ও ভারসাম্য পদ্ধতির পৃষ্ঠাসজ্জা আনুভূমিক ধারায়ও খুব সহজেই প্রয়োগ করা যায়। এছাড়াও বর্তমান ধারার পৃষ্ঠাসজ্জায় প্রচলিত নিয়মগুলোর সঙ্গে ফাংশনাল (কার্যোপযোগী) পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্যানেল পৃষ্ঠাসজ্জার সংমিশ্রণ ঘটানো হচ্ছে। এতে একটা নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য পাওয়া যাচ্ছে। ফাংশনাল ও প্যানেল বা মডিউলার ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জা হচ্ছে আনুভূমিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়াও বেশ কিছুদিন যাবৎ স্ট্রিমলাইন (Streamline) নামে এক ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জার ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই ধরনের পৃষ্ঠাসজ্জার উদ্দেশ্য শুধু প্রথম নয় বরং গোটা সংবাদপত্রই আরো বেশি আকর্ষণীয় ও সুপাঠ্য করে তোলা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে পত্রিকার সব পাতাতেই ব্যবহৃত হরফ ও মেকআপ আরো গতিশীল এবং আধুনিক করে তোলা হয়। কোন কোন সময় বড় বড় টাইপ ব্যবহার করা হয়। সংবাদশীর্ষাংশটুকুও অনেক সময় বড় টাইপে সাজানো হয়। পত্রিকাকে আরো পাঠযোগ্য করে তোলার জন্য আজকাল আমাদের দেশে প্রথম পাতার ন্যায় শেষের পাতাকেও এমনভাবে সাজানো হয় যে অনেক সময় বোঝাই যায় না আমরা প্রথম পাতা পড়ছি না শেষের পাতা পড়ছি। আমাদের দেশের নতুন নতুন কিছু পত্রিকা ওই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করছে। 'আজকের কাগজ' হচ্ছে এদের পথিকৃৎ। 'ভোরের কাগজ'-এও এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে। 'প্রথম আলো' কিংবা 'যুগান্তর' এবং ইংরেজি 'ডেইলি স্টারের' সবগুলো পাতাই এককভাবে সাজানোর প্রয়াস লক্ষণীয়।

সাধারণত দেখা যায় প্রথম পাতায় দিনের সেরাগুলোতো বটেই, এছাড়াও অজস্র খবর স্থান দিয়ে তার জাম্প নিয়ে যাওয়া হয় শেষের পাতায়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রথম পাতার খবরের জাম্প দিলে পাঠকরা প্রায়শই বিরক্ত হয়ে পড়ে। আজকাল তাই প্রায়শই জাম্প পরিহারের চেষ্টা চলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম পাতায় যে সংবাদবিবরণীর শুরু তা প্রথম পাতাতেই শেষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পাতাতেই হাজারো সংবাদ ঠেসে দেয়ার পুরোনো ধারা পাল্টে যাচ্ছে। বরং শেষের পাতায় অনেক সিঙ্গেল কলাম, ডবল কলাম থেকে শুরু করে চার পাঁচ ছয় কলামের খবর যাচ্ছে। এ শুধু শেষের পাতা নয়, অন্যান্য পাতাতেও এই পদ্ধতির চর্চা করা হচ্ছে। এতে করে প্রত্যেকটি পাতাই এক একটি সুসজ্জিত পাতায় রূপ নিচ্ছে খবরের বিষয় ও খবরের গুণে মানে। অনেক সময় মনেই হয় না, আমরা প্রথম না শেষের পাতা পড়ছি, নাকি ভেতরের পাতা পড়ছি। পত্রিকায় এই নয়া ধারা আমাদের দেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই এখন অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। এতে পাঠক বাড়ছে, পাঠক বাড়ানো ও ধরে রাখার জন্য প্রতিযোগিতা চলছে, এতে পত্রিকার বিষয় ও উপস্থাপনার গুণ বাড়ছে। সচেতন পাঠক বাজে জিনিস চায় না, সুস্থ ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় যারা টিকতে পারছে না স্বভাবতই তাদের পাঠক পড়ে যাচ্ছে। শুধু সাজানোর জন্য সাজানো নয়, ভালো জিনিস দিয়ে সাজানো পৃষ্ঠাসজ্জার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

পৃষ্ঠাসজ্জা হবে নমনীয়ঃ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা বা মেকআপকে অবশ্যই নমনীয় বা পরিবর্তনযোগ্য হতে হবে। পত্রিকা ছাপা হবার কিছু আগেও যখন পেস্টিং চলছে, প্লেট যখনও তৈরি হয়নি, তখনও কিন্তু পৃষ্ঠাসজ্জায় পরিবর্তন হতে পারে। এর একমাত্র কারণ সেই চরম মূহূর্তেও এ বিশ্বে একটা মহাঘটনা ঘটে যেতে পারে, কিংবা মহাঘটনা নাই ঘটুক জাতীয় জীবনে হয়তো তার কোন বিরাট গুরুত্ব আছে। সংবাদপত্র অফিসে কখন কী খবর আসে তার ঠিক নেই। ফলে পৃষ্ঠাসজ্জায় নমনীয়তা না রাখলে শেষ মূহূর্তের অতি গুরুত্বপূর্ণ খবরকে জায়গা করে দিতে পারবে না কোন পত্রিকা, পরের দিন দেখা যাবে যে পাঠক সেই পত্রিকা নিচ্ছে না। পত্রিকার প্লেট হবার আগেই হয়তো কোন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা সরকার পরিবর্তন কিংবা কোন রাষ্ট্রীয় নেতার মৃত্যু হলো। তখন পৃষ্ঠাসজ্জায় সামান্য পরিবর্তন করে সেই খুবই তাজা সংবাদটিকে জায়গা করে দেয়া যায়।

বার্তা সম্পাদক পরের দিনের জন্য যে পৃষ্ঠাটি সাজিয়ে দিয়ে গেলেন, তাতে নমনীয়তা না থাকলে মেকআপ সম্পাদক বা মেকআপম্যানের পক্ষে প্রয়োজনে কোন রদবদল করা অসুবিধা হয়ে পড়ে। আজকালতো বড় খেলাধুলার আসর (যেমন বিশ্বকাপ ফুটবল) কিংবা মধ্যরাত কাবার করা সংসদের অধিবেশন প্রভৃতির ক্ষেত্রে পত্রিকার নগর সংস্করণ

বের করা হচ্ছে। এই নগর সংস্করণ বের করতে গিয়ে পৃষ্ঠা- জায় কিছু পরিবর্তন করে দ্বিতীয় আরেকটি প্লেট করতে হয়। বার্তা সম্পাদকের সাঙ নো পৃষ্ঠায় নমনীয়তা না থাকলে কিন্তু নগর সংস্করণের জন্য পৃষ্ঠাসজ্জায় পরিবর্তন াধন করা মুশকিল হয়ে পড়ে। বার্তা সম্পাদক পৃষ্ঠাসজ্জায় নমনীয়তা রাখেন বলেই মেকআপ সম্পাদক পৃষ্ঠা নতুন করে সাজাতে পারেন। তবে নতুন করে সাজাতে গি য় পৃষ্ঠার সাজটি কতখানি ভালো হবে সেটা অনেকটাই নির্ভর করে মেকআপ সম্পা কের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ওপর। তবে একথা ঠিক যে এমন সময় অসময়ে এমন কি ছু খবর এসে পড়ে তখন তাকে জায়গা করে দিয়ে পৃষ্ঠা নতুন করে সাজাতে প্রায়শঃ বেশ মুশকিলে পড়ে যান মেকআপ সম্পাদক। শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়োর মুখে এ ধর নর খবরের প্রায়শই ভালো ট্রিটমেন্ট দেয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু পৃষ্ঠাসজ্জায় নমনীয়তা থ কলে সেই সংবাদের ভালো ট্রিটমেন্ট বা যোগ্য মর্যাদা বা জায়গা করে দেয়া যায়। ব া সম্পাদক পৃষ্ঠাসজ্জার যে ডামি করে দিয়ে যান তাতে পত্রিকার সব ইউনিট অর্থা ছবি, খবর, শিরোনাম বা বিজ্ঞাপনের একটা সুষম ও পরিবর্তনযোগ্য ট্রিটমেন্ট দিয়ে যান, তারপরেও পৃষ্ঠাসজ্জা সম্পাদকের তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও চিন্তাচেতনার কারণেই পৃষ্ঠাসাজে একটা পরিবর্তন আসতে পারে— যেটা পাঠকরা বুঝতেই পারবে না যে এ নে একটা পরিবর্তন সাধন হয়েছে।

তারপরেও হয় না। অনেক চেষ্টা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তের আসা খবরের সঠিক ট্রিটমেন্ট হয় না। এর জন্যে পৃষ্ঠাসজ্জা সম্পাদক সংশ্লিষ্টজনেরা যে দায়ী তা নয়। রাত যত গড়িয়ে যায় ততই পত্রিকার মেল ধরার ডে লাইন এগিয়ে আসে, এছাড়া যান্ত্রিক ব্যাপার স্যাপারতো আছেই। উপরন্তু চাপের মুখে শেষ বেলার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা এসেও হা র হতে পারে, ফলে অনেক সময়ই বিলম্বে প্রাপ্ত খবরের সঠিক ট্রিটমেন্ট হয় না। পরে র দিন পাঠকগণ সংশ্লিষ্ট সেই খবরের যথাযথহীন টিটমেন্টে ক্ষুব্ধ হতে পারেন। তারা স্রেফ ভালোটাই চান, অন্তর্নিহিত অনেক কিছুই জানতে চান না। কিন্তু তাঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ পাঠক আপনার পত্রিকা পড়লেই কেবল আপনার পত্রি কা বাঁচবে, আপনি বাঁচবেন। অতএব শেষ মূহূর্তের খবরও যাতে শত অসুবিধার ম ধ্যে সঠিক ট্রিটমেন্ট পায় বা প্রকাশযোগ্য হয় সে দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পত্রিকা কর্তৃপক্ষের। পাঠকগণ যাতে বঞ্চিত না হন তার জন্য অবশ্য অনেক চেষ্টাচরিত্র করা হচ্ছে। তবে মূল কথা একটাই— শেষ মূহূর্তে পত্রিকার পৃষ্ঠাসজ্জায় প্রয়োজনের খাতিরে পরিবর্ত ন আনতে হলে পৃষ্ঠাসজ্জার মূল ডামিতেই যথেষ্ট নমনীয়তা ও পরিবর্তনযোগ্যতা থ কতে হবে। জটিল পৃষ্ঠাসজ্জা ছাপাখানার সময় নষ্ট করে এবং আকস্মিক পরিবর্ত ন বাধার সৃষ্টি করে। সংবাদ সবসময় গতিশীল। অতএব এর উপস্থাপনেও গতিশীল া রাখতেই হবে।

প্রথম পাতার পৃষ্ঠাসজ্জা

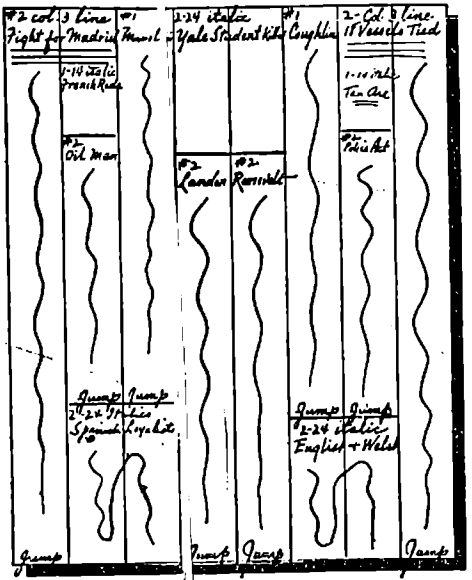

ভারসাম্য
পৃষ্ঠাসজ্জার ডামী

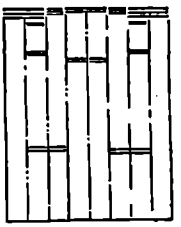

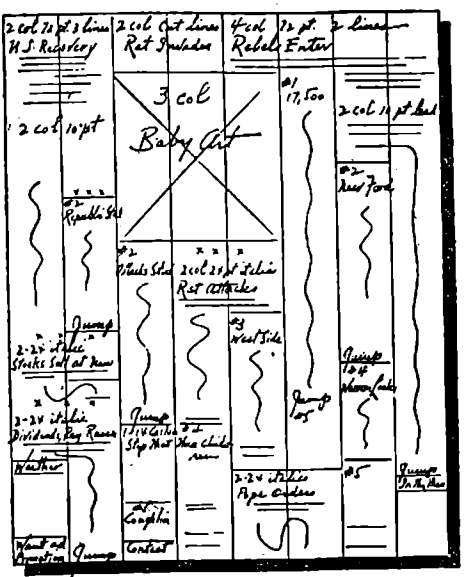

ব্রোকন বা
মিশ্র পৃষ্ঠাসজ্জার ডামী

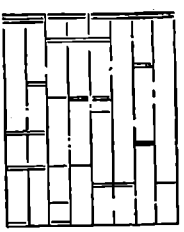

সূত্রঃ নিউ সাংে অফ জার্নালিজম; জর্জ ফক্স মট ও অন্যান্য

সংবাদপত্রের ছবি

ছবি কেন ব্যবহার করি

মানুষ যখন লিখতে শিখেছে তখন থেকেই তাঁর লিখিত ইতিহাসের শুরু। অর্থাৎ সেই পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর আগেকার কথা। তার আগে কি মানুষের জীবন স্থবির ছিল? কিছুই কি তার এতটুকু লেখা হয়নি? না, হয়েছে। লিপির উদ্ভাবনের আগে মানুষ ছবির সাহায্যে তাঁর কথা ব্যক্ত করেছে, যোগাযোগ সাধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ছবি দিয়েই মানুষের সাংবাদিকতার শুরু। আদি প্রস্তর কিংবা তারো আগে বর্বর যুগের মানুষও গুহার দেয়ালে চিত্র এঁকে তাঁর সারাদিনের কর্মকাণ্ডের কথা জানাতে চেয়েছে। আদি গুহাবাসী মানুষের হাতে আঁকা সব গুহাচিত্র তাঁর দৈনন্দিন জীবনের এক প্রতিরূপ। সেই প্রাচীনতম আবিষ্কার ছবির ব্যবহার আজকের সাংবাদিকতায় এক অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষ হাজারো কথা বলে একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থ নাও বোঝাতে পারে। কিন্তু একটি মাত্র ছবিই সেই একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থকে সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারে। আজকে আধুনিকতম যুগে আমরা খবরের কাগজে, বইতে, অন্যান্য পত্রপত্রিকায়, সাময়িকীতে, জার্নালে, ছায়াছবিতে, টিভিতে প্রতিনিয়ত ছবির মুখোমুখি হচ্ছি। সেসব ছবিই হাজারো কথামালার সংক্ষিপ্ত অথচ কার্যকর বদলি রূপ।

আমরা প্রতিদিন যে অজস্র সংবাদপত্র পড়ে থাকি— সেটা দৈনিক, সাপ্তাহিক যাই হোক না কেন সেসব সংবাদপত্রের সংবাদ, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বিষয় ছাড়াও পাতার একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে ছবি বা ফটোগ্রাফ। সংবাদপত্রের একাধিক ইউনিটের মধ্যে ছবি বা আলোকচিত্র একটি অন্যতম ও অপরিহার্য বিষয় (item)। সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জার জন্য যেসব মুদ্রণযোগ্য হাতিয়ার (Typographical devices) ব্যবহার করা হয়, সেই হাতিয়ারসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ছবি। আধুনিক সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জা বা পৃষ্ঠাসজ্জার জন্য ছবি একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

প্রশ্ন হতে পারে সংবাদপত্রে আমরা কেন ছবি ব্যবহার করি ? আগেই বলেছি, ছবি হাজারো কথা বলে। উনিশশ' চুয়ান্ন সালে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে সংসদের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে পিটিয়ে মেরে ফেলার পরে তাঁর হত্যাকাণ্ডের জন্য অনেকেই অনেককে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু সেই সময় সংসদের ভিতর হট্টগোলের মাঝে গৃহীত দুয়েকটি ছবি সেই বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে। আসলে ছবি কোন ঘটনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের মাপকাঠি। যদিও আজকের উচ্চ প্রযুক্তির যুগে

সুপারইম্পোজের মাধ্যমে নকল ছবিও চমৎকার সাজিয়ে দেয়া হচ্ছে। ছবি হচ্ছে কোন ঘটনার পরিচিতি। ছবি ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতাকে বাড়ায়। ছবি কোন ঘটনার বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করে। দর্শক কোন ছবির সঙ্গে একাত্মতাবোধ করে। কোন মহিলার ছবি দেখে হয়তো আমরা আপন মনেই বলে উঠি— 'আরে ওই মহিলাকেতো আমি চিনি' কিংবা কোন ভয়াল দর্শন লোকের ছবি দেখে হয়তো বলে উঠি—'আরে ওই লোকটাতো একটা খুনি।'

সংবাদপত্রের ছবি পত্রিকা পাঠক তথা দর্শকের চোখ ও মনকে স্বস্তি দেয়। ছবি সংবাদপত্রে অজস্র সংবাদ, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য লেখার একঘেয়েমি দূর করে। পাঠকের পত্রিকা পাঠে উৎফুল্লতা যোগায়।

এত কিছুর পরেও সংবাদপত্রে এমন কিছু ছবি দেয়া হয় যার সঙ্গে সংবাদ গল্পের কোন সম্পর্ক নেই। সে ছবিগুলো মূলত পত্রিকার পাতার শোভাবর্ধন করে। শুধুমাত্র সৌন্দর্যবর্ধক ছবিগলোর ক্যাপশন বা পরিচিতি হতে পারে— 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' যে ছবিতে রয়েছে ফুলে ফুলে শোভিত কতকগুলো গাছপালার ছবি। কিংবা 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' পরিচিতি সম্বলিত কোন মেঘের দৃশ্যের ছবি। অথবা এমন ফুলেল ছবি হতে পারে, যার পরিচিতি 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল।' এইসব ছবির সত্যিকারের কোন সংবাদমূল্য নেই, তবু দেয়া হয়। আর এটা করা হয় নিছক শিল্প সৌন্দর্যবোধের কারণে, মনস্তাত্ত্বিক খোরাকের কারণে, একান্তই নান্দনিকতার প্রয়োজনে। তবে এ ধরনের ছবি দিয়ে আমরা বাংলার ষড়ঋতুর বিভিন্ন মওসুমের আগমন বার্তাকে ঘোষণা করি। মানুষকে তার সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করি। শুধু এগুলোই নয়। আমরা এমন কিছু ছবি ব্যবহার করি যা কোন সংবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছবি নয়, কিন্তু সে ছবি জীবনের গভীরের ছবি। যেমন কোন স্কুলের সামনে কোন শিশু বুট পালিশওয়ালার বুট পালিশের ছবি। অথবা কোন কিশোরী মেয়ের ঘর্মাক্ত কলেবরে খোয়াভাঙার দৃশ্য। আজকাল প্রথম পৃষ্ঠায় বড় আকারের কার্টুনেরও ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে এবং তা যুক্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই হচ্ছে।

সংবাদপত্রের ছবি চেনার উপায়

সংবাদগল্পের কারণেই হোক কিংবা সৌন্দর্যবোধের কারণেই হোক, সংবাদপত্রের ছবি ছাপানোর ব্যাপারে কতকগুলো দিক খেয়াল রাখতে হয়। সংবাদপত্রের ছবি বা চিত্রসম্পাদকের কাছে প্রতিদিন প্রচুর ছবি আসে। সে ছবি আসে স্টাফ ফটোজার্নালিস্টদের কাছ থেকে অথবা প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায় ইন্টারনেটের মারফত। আমাদের দেশে অবশ্য বার্তা সম্পাদকই সংবাদপত্রের ছবিগুলো বাছাই করে থাকেন।

তবে বিদেশী পত্রিকাগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ছবি সম্পাদকই পত্রিকায় প্রকাশের যোগ্য ছবিগুলো বাছাই করে থাকেন। যাই হোক যে ছবিগুলো প্রতিদিন আসছে তার সবগুলোই কিন্তু ছাপা হয় না। আসলে তার কতকগুলো ছাপার যোগ্যও নয়। আবার কতকগুলোকে কেটেকুটে ছেঁটেছুটে প্রকাশযোগ্য করা হয়।

আমাদের প্রথমেই বিবেচনায় নিতে হবে যে ছবিটির প্রিন্ট প্রকাশের যোগ্য কিনা। কারণ ছবিতে সাদা কালোর পরিমাণ (Shed বা Tone) অত্যন্ত বাজেভাবে আসতে পারে। তারপরে বিবেচনা করতে হবে, যে ছবিটা আমি ছাপতে যাচ্ছি কিংবা যে ছবিটা আমার হাতের কাছে আছে তার সংবাদমূল্য বা সৌন্দর্যমূল্য আছে কিনা।

ছবি বাছাই করার জন্য প্রয়োগ করতে হবে সাধারণ বিবেকবুদ্ধি (Commonsense)। প্রয়োজন তীক্ষ্ণ চিন্তা ও কল্পনাশক্তি। ছবি চেনার জন্য আমাদের অবশ্যই ন্যূনতম একটা জ্ঞান থাকতে হবে। প্রয়োজন মননশীলতার। এসোসিয়েটেড প্রেস অফ আমেরিকার (এপি) এক সময়ের সংবাদচিত্র সম্পাদক ডিক স্ট্রোবেল বলেছেন, সেই ছবি হচ্ছে ভালো ছবি যে ছবি প্রথমত কোন সংবাদগল্পকে বিবৃত করে। দ্বিতীয়ত কোন বক্তব্য বা গতিশীলতার (Action) কথা প্রকাশ করে। এরকম একটা ছবি আমরা কল্পনায় আনতে পারি। যেমন, জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর লাইব্রেরিতে বসে আছেন। কিংবা নির্বাচনে সদ্য বিজয়ী একজন হাস্যোজ্জ্বল প্রেসিডেন্ট হাত নেড়ে জনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

ছবির মূল বিষয়টিই হচ্ছে এর আকর্ষণ কেন্দ্র বা Centre of interest বা Focus point। যেমন করে সংবাদশীর্ষ হচ্ছে কোন সংবাদ বিবরণীর মূল, Centre of interestও হচ্ছে কোন ছবির মূল বা কেন্দ্রবিন্দু। একজন বার্তা সম্পাদক যেমন একাধিক সংবাদ কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীগুলোকে বাছাই করে দ্রুত সেগুলোর মধ্যে সংবাদশীর্ষকে চিহ্নিত করেন এবং তার ওপর শিরোনাম লেখেন, তেমনি একজন চিত্রসম্পাদকও তাঁর ছবির Centre of interest কে চিহ্নিত করেন। যেমন ফুটবলের সুপারস্টার ম্যারাডোনার বাঁ পায়ের সাহায্যে কোন গোল করার দৃশ্য। তাঁর পায়ের এমন কোন জায়গায় এমন একটা ভাঁজ রয়েছে বা পুরো শরীরের মধ্যে একটি ভঙ্গি রয়েছে যাকে চিহ্নিত করা খুবই জরুরি। আর সে জিনিসটাই একটি ছবির মূল কথাকে বিবৃত করে। কিন্তু একজন অনভিজ্ঞ চিত্র সম্পাদক হয়তো ম্যারাডোনার পায়ের অংশকে বাদ দিয়ে শুধু ওপরের অংশকে দিয়ে দিতে পারে। এতে কিন্তু ছবিটির গুরুত্ব বা Centre of interest একদম নষ্ট হয়ে যাবে।

ছবিকে দেখার জন্য আরো কতগুলো দিক দেখতে হবে। যেমন ছবির মধ্যে তীক্ষ্ণ বিচ্ছুরণ বা Sharp focus আছে কিনা। ছবিটির চারপাশ (outline) পরিষ্কার আছে কিনা কিংবা তা তীক্ষ্ণ কিনা। ছবির চারপাশ পরিষ্কার এবং সাদা কালোর বৈপরীত্য থাকলে ছবি খুব ঝকঝকে হয়, ফুটে উঠে।

দেখতে হবে ছবিতে বিস্তারিত খুঁটিনাটি (Good details) ও টুকটাক সহায়ক উপাদান আছে কিনা। ছবির মধ্যে অনেক ছোটখাটো ও আপাতদৃশ্য তুচ্ছ কতকগুলো দিক খেয়াল রাখতে হয়। যেমন, চোখ কিংবা চোখের তারা, কপালের ভাঁজ, মুখের তিল প্রভৃতি স্পষ্ট কিনা। কিংবা জামার বোতাম স্পষ্ট কিনা।

ভালো করে বুঝতে হবে ছবিতে বৈপরীত্যের সুর বা মাত্রা সঠিকভাবে আছে কিনা। ছবির বৈপরীত্য তিন ধরনের হয়। এগুলো হলো:
এক. আয়তনের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য (Contrast in size)
দুই. গঠনের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য (Contrast in shape)
তিন. রঙের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য (Contrast in color or tone)

ছবির আয়তন ও গঠন এমন হবে না যা দৃষ্টিকটু বা বিসদৃশ্য। যদিও ছবিকে চিত্রসম্পাদক কাটাকুটির মাধ্যমে তাকে গ্রহণযোগ্য একটি আয়তন ও গঠন দেন। সাধারণত ছবি আয়তাকার হয়ে থাকে। গঠনের দিক দিয়ে তা বিশাল বা ক্ষুদ্রাকার হবে না। ছবি পুরোপুরি বর্গাকার হলে তা দেখতে বিশ্রী লাগে। আবার কোন ক্রিকেট বোলারের বোলিং অ্যাকশনের ছবি ওপরে-নিচে লম্বা না হলে ভালো লাগে না। আবার এমন হতে পারে মধ্যযুগের একজন সম্রাট বা মহারাজার চারকোণো ছবি না ছেপে ডিম্বাকৃতির ছবি ছাপা হলো। ছবি তোলার সময় চিত্রসাংবাদিক সংশ্লিষ্ট সংবাদ ঘটনার গুরুত্বকে মনের মধ্যে রেখে সেই অনুসারেই ছবি তোলেন এবং প্রিন্ট দেয়ার সময় যথাযথ আয়তন ও গঠন অনুযায়ীই তা দেন। চিত্রসম্পাদক পরে তাঁর চাহিদানুযায়ী তা ছোট বড় করে দেন।

গঠন ও আয়তনের মতো ছবির মধ্যে রঙের (বিশেষত সাদা-কালো ছবির ডট) ভারসাম্য রক্ষিত আছে কিনা তাও দেখতে হবে। সাদা-কালোর প্রয়োগ কোথাও হালকা, কোথাও ভারি হলেই কেবল তার মধ্যে বৈপরীত্য ফুটে ওঠে। ডটের মাধ্যমে সাদা কালোর এই বৈপরীত্য সৃষ্টি করে ছবির মধ্যে একটি মনোরম ভাব (Pleasing effect) তৈরি করা যায়। সাদা-কালোর ব্যবহার করে ছবির গভীরতার (Depth) মধ্যে বৈচিত্র্য আনা যায়।

ছবির স্ক্রিন

স্ক্রিন ব্যবহারের মাধ্যমে ছবির মধ্যে সাদা-কালোর একটা শেড (Shade) বা আভা ফুটিয়ে তোলা যায়। এই শেড বা আভা বা বিন্দুর বৈপরীত্যই হচ্ছে হাফটোন (Halftone)। ছবিতে স্ক্রিন ব্যবহারের একটা মাত্রা আছে। তবে এক্ষেত্রে কোন্ কাগজে ছবিটি ছাপা হবে তার ওপরেই তা নির্ভর করে। অবশ্য এটা মনে রাখা প্রয়োজন ছবিতে স্ক্রিন ব্যবহার করলে ছবির ডিটেল (Detail) পরিস্ফুট হয়। প্রকৃতপক্ষে যে পদ্ধতিতে বিশেষত খবরের কাগজ ও সাময়িকীগুলোর জন্য ছবি (ফটোগ্রাফ) বা হাতে আঁকা ছবি ও স্কেচকে পুনরুৎপাদিত করা হয় তার একটির নাম হাফটোন এবং অপরটির নাম লাইন। এই হাফটোনের বৈশিষ্ট্যই হলো তার স্ক্রিন। হাফটোন পদ্ধতিতে অত্যন্ত ঘন সন্নিবদ্ধ হালকা ও গাঢ় হাজার হাজার বিন্দু বা ফোঁটা (Dot) ছবির প্রতিমূর্তি (Reporoduction) তৈরি করে। খবরের কাগজে ছাপা যে কোন ছবির ওপর একটি ম্যাগনিফাইং কাচ ধরলেই ওই হাজারো ছোট ছোট বিন্দু বড় আকারে দেখা যায়। উল্লেখ্য, প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গায় আনুমানিক ৪ হাজার ২শ বিন্দু বা ফোটা থাকতে পারে। তবে এর কমবেশি হতে পারে। আগেই বলেছি যে যত বেশি স্ক্রিন থাকে ততই ছবির ডিটেল পরিস্ফুট হয়। খবরের কাগজ নিউজপ্রিন্টের ওপর ছাপা হয় তাই তাতে ৫৫ স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়। বই বা সুভ্যেনিরে আর্ট পেপার ব্যবহার করা হলে ৮০ থেকে ৯০ স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়। বহু রঙা কোন শিল্পকর্ম ছাপতে গেলে ১৩৩ থেকে ১৫৫ স্ক্রিনও ব্যবহৃত হয়। মুদ্রণ ব্যবস্থার অফসেট পদ্ধতিতে ১৫০ স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়। যে পরিমাণ স্ক্রিন ব্যবহার করা হবে সেই পরিমাণের একটি কাচের স্ক্রিন (বিশেষভাবে নির্মিত ডট দেয়া একটি কাচের পর্দা) ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়।

ছবি পুনরুৎপাদনের আরেকটি পদ্ধতি 'লাইন' পদ্ধতিতে কোন ডট বা টোন থাকে না। মানচিত্র, কার্টুন বা বিভিন্ন ধরনের কালিতে আঁকা স্কেচ ইত্যাদির ব্লক বা ছাপ সৃষ্টির জন্যে খবরের কাগজ ও সাময়িকীগুলো লাইন পদ্ধতি ব্যবহার করে। সাধারণত ইলাস্ট্রেশন, নামফলক, ক্যাপশন প্রভৃতি লাইন ব্লকে ছাপা হয়।

সংবাদপত্রের ছবি

সংবাদপত্রের জন্য যে ছবি ব্যবহার করা হয়, তার অধিকাংশই হয় বেশ বড় ও তীক্ষ্ণ বা ব্যগ্রতাপূর্ণ (Sharp)। বড় আকারে সেগুলোকে প্রিন্ট করা হয়— এই মাপটা সাধারণত হয় ৮″ × ১০″ আকারের। এই ছবি সাধারণত মসৃণ ও উজ্জ্বল কাগজের (Glossy paper) ওপর নেয়া হয়ে থাকে। কারণ নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছবি ছাপানোর (Reporoduction) পর ছবির অনেক খুঁটিনাটি (Detail) জিনিস হারিয়ে যায়। ছবির

হালকা শেড বা আভা নষ্ট হয়ে যায়। ছবি ঝাপসা (Hesi) হয়। সেই জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য ছবি ম্যাট পেপারের (Mat paper) বদলে গ্লসি পেপারে ছাপা হলেই ভালো। আসলে খবরের কাগজে ছবি পুনরুৎপাদিত হবার পর অধিকাংশ ছবিই তার মৌলিক গুণাবলী হারিয়ে ফেলে। তাই ছবি বাছাই করার জন্য প্রথম শর্তই হচ্ছে ভালো মানসম্পন্ন ছবি (Excellent photograph)।

ছবির কাটছাঁট বা কেন্দ্রবিন্দু বের করার পদ্ধতি

যেসব ছবি চিত্রসম্পাদকের টেবিলে আসে সেগুলোর সংবাদ ও সৌন্দর্যমূল্য বাছাই করার পর সম্পাদকের দায়িত্ব থাকে সীমিত জায়গার মধ্যে কোন ছবিকে কিভাবে প্রতিস্থাপিত করা যায়। ছবিকে কেটেকুটে তার Centre of interest বা মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু বের করতে হয়। আর যে পদ্ধতিতে কোন ছবিকে পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য করার লক্ষ্যে ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশকে কাটছাঁট করে মূল ছবি থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয় সেটাকে বলে ক্রপিং (Cropping)। ছবির মূল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশটি (Centre of interest) ক্রপিংয়ের মাধ্যমে নির্ণয় করার জন্য দুটো এল-টাইপ (L-type) যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রটি কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি। কার্ডবোর্ডের এই যন্ত্র দুটোর প্রত্যেকটি প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা, প্রস্থে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি ও দুই ইঞ্চি চওড়া। প্রয়োজনে এটি মোটা কাগজ দিয়ে তৈরি করেও কাজ চালানো যেতে পারে। এই যন্ত্রটি একটি ছবির ওপর ফেলে সরিয়ে নড়িয়ে মূলত আয়তাকার (প্রয়োজনে লম্বাটে) জায়গা বাছাই করা হয় এবং সেটাই হচ্ছে ছবির মূল অংশ বা Centre of interest। ছবির মূল হচ্ছে সেটি যেটি বক্তব্যধর্মী, গতিশীল, সাদাকালো বা রঙের দিক থেকে সুদৃশ্যপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ।

উল্লেখ্য, খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ছবি বড় করা (Enlarge) উচিত নয়। এনলার্জ করলে ছবি ফেটে যায় বা ঝাপসা (Hesi) হয়ে যায়। এর চেয়ে ছোট করলেই (Reduction) বরং ছবি ভালো থাকে। তবে কোন ছবি কালো থাকলে অর্থাৎ ডটের পরিমাণ বেশি থাকলে তা এনলার্জ করলে ভালো হয়। আবার কোন ছবিতে যদি ডট বা ফোঁটা কম বা হালকা থাকে তাকে ছোট করলে তার ফল (Effect) ভালো আসে। তবে সর্বোপরি চিত্রসম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের ওপরই নির্ভর করে তিনি ছবি ছোট কিংবা বড় করবেন কিনা। এছাড়া ছবি খুব প্রয়োজন না হলে তাকে রিটাচিং করতে নেই।

সুন্দর ছবি ও আলোর ব্যবহার

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ছবি তুলতে ফ্লাশ (Flush) ব্যবহার না করে সূর্যালোকের সাহায্যে তোলাই ভালো। অন্তত দিনের বেলা যদি Flush ব্যবহার না করলেও চলে তবে তাই করা উচিত। এতে ছবি স্পষ্ট হয়। যেমন একজন অতিবৃদ্ধের মুখের

বলিরেখাসমূহকে স্পষ্ট ও কেন্দ্রবদ্ধ করে তোলার জন্য সূর্যালোকই ভালো। যে ব্যক্তিত্ব বা বিষয়টি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ হতে যাচ্ছে সেই ব্যক্তিত্ব বা বিষয়ের একাধিক ছবি নিন। বিভিন্ন কৌণিক (Angle) দিক থেকে ছবি নিন। অর্থাৎ সামনের থেকে, পাশের থেকে। আবার তার মানসিক অবস্থান বুঝেও ছবি নিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি খুব চিন্তান্বিত কিনা। তিনি খুব হাসছেন কিনা, তিনি খুব গম্ভীর কিনা তিনি কোন কাজে ব্যস্ত কিনা। যেমন একজন ঔপন্যাসিক লিখছেন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন অথবা কোন মহিলা ইকেবানা প্রদর্শনীতে ফুল সাজাচ্ছেন।

যে ব্যক্তিত্ব বা বিষয় সম্পর্কে একজন সংবাদ আলোকচিত্রী ছবি তুলতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাঁর আগাম একটা ধারণা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য চিত্রসম্পাদক তাঁকে আগে থেকেই পরামর্শ দিয়ে দিতে পারেন। কারণ একজন চিত্রসাংবাদিক যে চিন্তাভাবনা মাথায় নিয়ে ছবি তুলে এনেছেন তার সঙ্গে মিল নাও হতে পারে। তবে একজন চিত্রসাংবাদিককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পাঠক দর্শক সবসময়ই 'সুন্দর' ছবি দেখার অপেক্ষায় থাকেন। সেই 'সুন্দর' ছবি যেমন কোন ভালো দিনের চমৎকার একটা নিসর্গের ছবি কিংবা কোন নিষ্পাপ ফুলেল একখানি শিশুর ছবি। আবার তা জগন্নাথ হল ট্রাজেডির মতো কোন মর্মন্তুদ ঘটনার ছবিও হতে পারে। যেমন— কোন শোকাবহ ঘটনার একটা সুন্দর ছবি আপনি তুললেন, যে ছবিটা পাঠকচিত্তে দারুণ নাড়া দিতে পারে। কিন্তু প্রিন্ট করার পর দেখলেন রোদন ভরা অনেকগুলো মানুষের মাঝে সহাস্য একখানি মুখ। ওই সহাস্য মুখখানাই আপনার সেই 'সুন্দর' ছবির বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। ক্লিনটন নির্বাচনে জিতছেন, তাঁর একখানি সহাস্য মুখ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বেনজীর ভুট্টো যখন নির্বাচনে হারছেন তখন তাঁর একখানা সহাস্য মুখ কেউই আশা করবে না। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের ছবি এক একটি শিল্পকর্ম হিসেবে প্রতিভাত হবে। ছবি হবে জীবনমুখী। ছবি হবে সংবাদপত্রের কোন দিনের ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুখের দিনে যেমন প্রকৃতিকে খুবই সুন্দর লাগে সেই প্রকৃতিই আবার ভয়ালরূপে দেখা দেয়। কিন্তু দিন ও সময় অনুযায়ী যদি আমরা ছবি বাছাই করতে না পারি তাহলে পরের দিন সংবাদপত্রটি মার খাবে।

ছবির ক্যাপশন লিখন

সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন আলোকচিত্রের পরিচিতিকেই ক্যাপশন (Caption) বলে। কোন নকশা ও ছকের পরিচিতিকেও ক্যাপশন বলে। অবশ্য মানচিত্র, চার্ট, রেখাচিত্র, ফিগার, স্থিরচিত্র প্রভৃতি স্থির দৃশ্য-সহযোগীকে (Visual aid) টিভির ভাষায় ক্যাপশন

বলে। চিত্রগ্রাহকের তোলা ছবিটি কোন্ বিষয় বা ব্যক্তিসংক্রান্ত ক্যাপশন দ্বারাই তা বুঝিয়ে দিতে হয়। অবশ্য একটা রেওয়াজ আছে যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনীতিবিদ বা রাষ্ট্রনায়কদের ছবি ব্যবহারের সময় তাঁর নাম পরিচিতি দেয়া হয় না। যেহেতু তাঁরা নামি দামি ব্যক্তি। নিজ গুণে পরিচিত। ক্যাপশন ছাড়াইতো তাঁদের চেনা যায়। কিন্তু একটা বিষয় স্মরণযোগ্য যে, আপনি ও আপনার মতো কিছু লোক হয়তো ওই নামি দামি ব্যক্তিদের চিনে থাকতে পারেন কিন্তু দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর অনেকেই হয়তো চেনে না। অতএব অপরিচিত হলে তো কথাই নেই। পরিচিত ব্যক্তির বেলাতেও পরিচিতি বা ক্যাপশন দিতে হবে।

স্রেফ একটা পরিচিতি দেয়াই ক্যাপশন লেখার মূল কথা নয়। একটা ক্যাপশন যতদূর সম্ভব চিত্তাকর্ষক করে লেখা উচিত। অনেক সময় একটি চমকপ্রদ ক্যাপশনও একটি সাধারণ ছবিকে আকর্ষণীয় ও অর্থবহ করে তোলে। বার্তা বিভাগের সহ-সম্পাদক যদি খুবই চাতুর্যের সঙ্গে প্রয়োগসম্মত শব্দ ব্যবহার করে একটি ক্যাপশন লিখেন তাহলে প্রতিটি ছবিকেই প্রাণবন্ত, আবেগপূর্ণ ও আগ্রহোদ্দীপক করে তোলা যায়। দুর্বল ক্যাপশনের জন্য সবল ছবিও মাঠে মারা যায়, আর দুর্বল ছবির তো কথাই নেই।

ছবির ক্যাপশন লেখার আগে ছবিটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করুন। ছবির ভাব ও মেজাজ ফুটিয়ে তুলেছে এমন কোন উপাদান খুঁজে পান কিনা তা লক্ষ করুন। একটি ছবিকে কখনই সাদা চোখে দেখবেন না। ছবির গভীরতাকে বোঝার চেষ্টা করুন। সাধারণ চোখে যা বোঝা যায় না, তার চেয়ে ব্যতিক্রম কোন কিছু পেলে সে বিষয়টির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেভাবে ক্যাপশন লেখার চেষ্টা করুন। ছবিতে দৃশ্যত যা ব্যক্ত হয়েছে ক্যাপশনে তা না লিখে একটু ঘুরিয়ে লিখুন এবং পাঠককে চিন্তার একটি নতুন দিগন্তে নিয়ে যান। যেমন, বসনিয়া থেকে হাজার হাজার মুসলিম উদ্বাস্তু চলে যাচ্ছে অন্য দেশে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সারিতে দেখা গেলো একটি বালিকা তার পোষা একটি বাচ্চা কুকুরকে বুকে আঁকড়িয়ে পথ চলছে। এ ধরনের চিত্রে ক্যাপশনটা হয়তো এইভাবে লিখবেন, *মানুষের হিংসায় টুসি নামের এই মেয়েটি আজ উদ্বাস্তু হলেও পোষা কুকুর ছানাটির প্রতি মমত্ববোধ তার এতটুকু কমেনি ...।*

ক্যাপশনে সাধারণত কম শব্দই ব্যবহার করা হয় যদি না তা সংবাদের মতো ব্যবহৃত হয়। কোন ছবি যদি কোন সংবাদ কাহিনীর সঙ্গে ছাপা হয় সেক্ষেত্রে ক্যাপশনের দৈর্ঘ্য খুবই ছোট হতে পারে। আবার যদি কোন ছবি কোন সংবাদ ঘটনার সঙ্গে না থাকে তবে তার বিস্তৃতি একটু বড় হলেও সংবাদের মতো বড় হবে না। তবে ফটোফিচার যদি হয় তাহলে ক্যাপশনের বপু একটু বড় হতে পারে। তবে সাধারণত ক্যাপশন

সংবাদকাহিনীর শীর্ষ থেকেও ছোট হয়। অল্প কথায় ছবির বক্তব্য বুঝিয়ে দিতে পারার মধ্যেই ক্যাপশন লেখার সার্থকতা রয়েছে। তবে আগেই বলেছি, কোন কিছু সংক্ষিপ্ত করে লিখতে গিয়ে তা খুব একটা সহজ করে লেখা যায় না। সুললিত হয় না। তাই লক্ষ রাখতে হবে ছবি পরিচিতি সংক্ষিপ্তাকারে তৈরি করতে গিয়ে তার বক্তব্য যেন এলোমেলো, ঢিলেঢালা না হয়ে পড়ে। অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, ভালো কথা, ক্যাপশন লেখার সময় যেন নামধামের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে। না হলে মামলার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হতে পারে।

ক্যাপশন লিখবে কারা: ছবি তুলে থাকেন চিত্রগ্রাহকরা। ফলে ছবির নাম ধাম, সময়সহ সংশ্লিষ্ট সব বিষয় সম্পর্কেই তিনি অবহিত থাকেন। স্বভাবতই ছবির ক্যাপশন লেখার দায়িত্ব তাঁর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সত্যিকারের ক্যাপশন লিখেন না। ক্যাপশন লিখে থাকেন সহ-সম্পাদকেরা। তাহলে কি চিত্র তুলেই চিত্রগ্রাহকের দায়িত্ব খালাস? তা নয়। তিনি যে সংবাদ ঘটনা কিংবা অন্য কোন ঘটনা বা অনুষ্ঠানের ছবি তুললেন তার মোটামুটি একটি পরিচিতি তুলে ধরেই কেবল চিত্রসম্পাদকের টেবিলে জমা দেন। তিনি তা প্রধান সহ-সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদকের টেবিলে জমা দেন। তাঁদের নির্দেশে কোন সহ-সম্পাদকই সংবাদচিত্রের পরিচিতি লিখে থাকেন। আসলে ভালো ক্যাপশন লেখার জন্য বিশেষ গুণাবলীসম্পন্ন আলাদা সহ-সম্পাদকই থাকেন। তবে একথাও ঠিক চিত্রগ্রাহক যদি নিজেই একটা ভালো ক্যাপশন ছবির পিছনে লিখে দিয়ে যান এবং সেটা যদি যুতসই হয়, তাহলে সহ-সম্পাদক বার্তা বা প্রধান সহ-সম্পাদকের অনুমতিক্রমে সেই পরিচিতিটা একটি স্লিপে লিখে তা মুদ্রণের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু কোন আলোকচিত্রীর সঙ্গে যদি রিপোর্টার থাকেন তাহলে সেই রিপোর্টারই সংশ্লিষ্ট কোন ছবির পরিচিতি লিখে দেন। রিপোর্টার অবশ্য ছবির পরিচিতি লিখে দিলে তা তুলনামূলকভাবে ভালো হতে পারে। অনেক সময় অবশ্য মনে করা হয় যে ছবির পরিচিতিমূলক বৃত্তান্ত রিপোর্টার অথবা সহ-সম্পাদককেই সংগ্রহ করতে হবে। এটা ঠিক নয়। চিত্রগ্রাহকের সাথে কোন রিপোর্টার থাকলে তিনি ছবির পরিচিত লিখে দিতে পারেন। তা না হলে সহ-সম্পাদককে চিত্রগ্রাহকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে হবে। হাতের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকলে অবশ্য একটি উপযোগী, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ক্যাপশন লেখা সহ-সম্পাদকের জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

চিত্রসাংবাদিক যখন নিজেই রিপোর্টার: আমাদের দেশে অধিকাংশ চিত্র সাংবাদিকই তাঁর দায়িত্ব হিসেবে শুধুমাত্র চিত্রই গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য সেসব চিত্রের

অধিকাংশই হলো সংবাদ উপযোগী। এছাড়া কিছু আছে ফিচারধর্মী এবং বাকিগুলো হয়তো সৌন্দর্যমূল্য সম্বলিত। তবে দুয়েকজন চিত্র সাংবাদিক আছেন যাঁরা রিপোর্টিংয়ের কাজও করে থাকেন। তবে অনেক চিত্রসাংবাদিকই আছেন যাঁরা রিপোর্টিং না করলেও বার্তা বিভাগে এসে অনেক সংবাদ কাহিনীর সূত্র (jottings) সরবরাহ করে থাকেন। অবশ্য বিদেশে আজকাল রিপোর্টাররা নিজেরাই চিত্রগ্রাহকের কাজটিও প্রতিপালন করে থাকেন। তার মানে এই নয় যে সেখানে কোন নির্ভেজাল চিত্রসাংবাদিক নেই। তবে কারো যদি একই সঙ্গে রিপোর্টিং ও ছবি তোলার কৌশল জানা থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠান দুজনের বদলে ওই একজনকেই কাজে লাগাবেন। কোন ব্যক্তির যদি রিপোর্টিং ও চিত্রগ্রহণের একাডেমিক এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে কোন সংবাদ ঘটনা কভার করার জন্য কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ওই ব্যক্তিকেই পাঠাবে। আসলে এই উন্নত প্রযুক্তির যুগে প্রতিটি সাংবাদিকই ক্যামেরা চালানোর কলাকৌশল কিছু না কিছু জেনে থাকেন। এইজন্য একজন রিপোর্টার নিজে একজন চিত্রগ্রাহক হলে কোন সংবাদ ঘটনার অনুসরণে উপযোগী চিত্রগ্রহণও তাঁর পক্ষে সম্ভব। তবে এক ব্যক্তিকে দিয়ে দুটো কাজ একই সঙ্গে তাঁরাই করাতে চায় যাঁদের আর্থিক ও লোকবল কম রয়েছে। কারণ দুটো বিভাগই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। অতএব দুটো বিষয়ে একই সঙ্গে কাজ করতে গেলে তার মানের পতনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একথা ঠিক, একজন চিত্রগ্রাহক রিপোর্টিংয়ের কলাকৌশল জানলে অথবা একজন রিপোর্টার চিত্র গ্রহণের কালাকৌশল জানলে তাঁদের নিজেদের যেমন সহযোগিতা হয়, তেমনি তাঁদের নিজ সংগঠনেরও সহযোগিতা হয়। অবশ্য একটি কথা মনে রাখতেই হবে যে একজন চিত্রগ্রাহকের সাংবাদিকতাসুলভ চেতনাবোধ থাকা উচিত, যতক্ষণ তিনি কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।

সংবাদচিত্র ও চিত্র সাংবাদিক: সাংবাদিকতায় একটি কঠিন কাজ বা পেশাগত দায়িত্ব হচ্ছে এই চিত্রসাংবাদিতা। একজন রিপোর্টার একটি ঘটনাকে বা একটি পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণ করেন একটি সুনির্দিষ্ট সময় ধরে। তাঁর এই প্রত্যক্ষণ বা পর্যবেক্ষণটা কয়েক সেকেন্ডেও হতে পারে। বহু সময় ধরে বা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর এই প্রত্যক্ষণ একজন রিপোর্টার ভাষায় রূপ দেন এবং তা রিপোর্টাকারে প্রস্তুত করেন। একজন রিপোর্টার একটু আগে পিছে গেলেও কোন ঘটনার বিবরণী তৈরি করা খুব একটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটলো সে মুহূর্তেই যদি সংবাদ চিত্রগ্রাহক উপস্থিত না থাকেন তাহলে তিনি সেই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মুহূর্তটি ক্যামেরায় বন্দি করতে পারবেন না। এমনকি ঘটনার সম্মুখে উপস্থিত থেকেও যদি সেই সঠিক মুহূর্তে চিত্রগ্রাহক তার ক্যামেরা 'ক্লিক' করতে না পারেন তাহলেও সংবাদ

উপযোগী সেই মুহূর্তটি চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। যে মুহূর্তটা আপনার হারিয়ে গেলো তাকে আপনি শত চেষ্টাতেও ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

তবে একথা ঠিক যে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তই একজন চিত্রগ্রাহক তাঁর ক্যামেরায় বন্দি করতে পারবেন এমন নয়। সংবাদপত্রের ইতিহাসে অনেক ভালো ভালো ছবির ক্ষেত্রে ভাগ্যের ব্যাপারটিও জড়িয়ে আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক চিত্রসাংবাদিক এমন সব ছবি তুলেছেন যে ছবিটি গোলায় তাঁর বুক বিদীর্ণ হবার আগ মুহূর্তে তুলেছিলেন। তবে ভালো ছবি তোলার জন্য ভাগ্যের পাশাপাশি একজন চিত্রসাংবাদিকের জন্য ন্যায়নিষ্ঠা ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ থাকতে হবে। আর তাঁকে হতে হয় সর্বক্ষণের জন্য প্রস্তুত। ভালো ছবি তোলার জন্য বা ভালো মুহূর্ত পাবার জন্য চিত্রগ্রাহকের সার্বক্ষণিকভাবে ক্যামেরা তাক করে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। বরং তাঁর প্রস্তুতিটা এমন হবে যে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেই যেন তিনি ক্যামেরাটা 'ক্লিক' করতে পারেন। এজন্য তাঁকে যেমন কোন ঘটনার পূর্বাপর প্রবাহকে অনুসরণ করতে হবে ঠিক তেমনি ক্যামেরাটাকেও প্রস্তুত রাখতে হবে। দুর্ঘটনার মতো কোন ঘটনার পর যে মর্মন্তুদ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে একজন চিত্রগ্রাহকের আগে থেকেই ধারণা করে নিতে হবে। আবার কোন অনুষ্ঠানের কভার করতে গিয়ে একজন চিত্রসাংবাদিক অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ এবং সেখানে উপস্থিত লোকজনের পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে আগে থেকেই ধারণা করে নিতে পারেন কোন্ ধরনের ছবি আসতে পারে।

সংবাদ চিত্রগ্রাহকরা হচ্ছেন স্থিরচিত্রের গ্রাহক। ফলে আজকাল তাঁরা টিভির চিত্রগাহকদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। কারণ টিভি চিত্রগাহকরা কোন ঘটনা প্রবাহের পূর্বাপর দিকটিই দেখিয়ে দিচ্ছেন। তারপরেও পাঠক-দর্শক পত্রিকার পাতাতেই সুন্দর সুন্দর মানবিক আবেদননিষ্ঠ, জীবনমুখী ও নন্দনতাত্ত্বিক ছবি দেখতে চায়। স্থির চিত্রগাহক কতখানি কেরামতি খাটিয়ে তা তুলতে পেরেছেন তার ওপরই নির্ভর করে তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর।

সংবাদ চিত্রগ্রাহক কখনই স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ব্যবহার করেন না। পরিবেশ পরিস্থিতি, আবহাওয়া, দিনক্ষণ প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে তাঁকে ছবি তুলতে হয়। এখানে আলোর ভূমিকা থাকে। থাকে আরো কিছু যান্ত্রিক ব্যাপার স্যাপার। ফলে ক্যামেরাম্যানকে হতে হয় ফটোগ্রাফির একজন ওস্তাদ। নিজের কর্মশৈলী সম্পর্কে তাঁকে ভালো জানতে হয়। ক্যামেরা চালানোর আগে তাঁকে ক্যামেরার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন যান্ত্রিক শর্তকে পুরোপুরি মিটিয়েই ছবি তুলতে হয়। ভালো চিত্রগ্রাহক হবার একটি পূর্ব শর্তই হচ্ছে ভালোভাবে নিখুঁতভাবে ক্যামেরা সম্পর্কে জানা ও তা পরিচালনার সামর্থ।

আজকে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে সাংবাদিকতা যখন দৃশ্য সহযোগীগুলোর (Visual aid) ওপর আরো বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তখন চিত্র সাংবাদিকতা আরো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে এবং অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের একদা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় বলেছেন, 'আজকের গণমাধ্যমে চিত্রসাংবাদিকতার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোন কিছুর দৃশ্যরূপ (Visual form) হচ্ছে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে। আলোকচিত্র খবরকে আরো স্পষ্ট ও তথ্যপূর্ণ করে তোলে এবং খবরকে জনগণের খুব কাছাকাছি নিয়ে যায়'।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কী

সংবাদপত্রের সঙ্গে *স্বাধীনতা* শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই স্বাধীনতাটা কী? সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা। সংবাদপত্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক হলো যে আমি সংবাদপত্র বা মুদ্রিত বই-পুস্তকের মাধ্যমে ওইসব অধিকার প্রকাশ করছি। যদিও সাধারণ অর্থে বলা হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে হলো সংবাদপত্র বা প্রেসের (Press) স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সংবিধানেও প্রেস-এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে সংবাদক্ষেত্র। সেই হিসেবে এই সংবাদক্ষেত্রের আওতায় শুধু সংবাদপত্র ও মুদ্রিত সকল বই-পুস্তকই পড়ে না, তাতে রেডিও-টিভির মতো ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমও পড়ে। অর্থাৎ যে কোন মাধ্যমের (Medium) মধ্য দিয়ে আমার চিন্তাচেতনা ও মৌলিক অধিকার প্রকাশ বা প্রয়োগের ব্যাপারটিই হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল অর্থই হচ্ছে লেখার ও তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা।

মহামতি প্লেটোর মতো, মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া যায়। এর ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় যে যেখানে মুক্ত আলোচনার অবকাশ নেই সেখানে স্বাধীনতা নেই, আছে শুধু মিথ্যা।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে ১৭৬৯ সালে স্যার উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন বলেছেন, 'জনগণের সামনে প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব অনুভূতি উপস্থাপনের সন্দেহাতীত অধিকার রয়েছে, একে নিষিদ্ধ করা মানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা।' অবশ্য ব্ল্যাকস্টোন আরো লিখেছেন .... যদি তিনি বেঠিক, ক্ষতিকর ও বিধি-বহির্ভূত কোন কথাবার্তা প্রকাশ করেন তাহলে তাঁর সেই ঔদ্ধত্যের পরিণাম নিজেকেই বহন করতে হবে।

১৮৮৫ সালে এ. ভি. ডিসি (Dicey) বলেছেন, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তির বই অথবা সংবাদপত্রে নিজ ইচ্ছানুযায়ী কোন কিছু প্রকাশের অধিকার'।

বাংলাদেশের প্রেস কমিশনের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ধারণাটি বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যে নীতিমালার ওপর মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে তা সবই এক।

এদিকে ভারতের প্রথম প্রেস কমিশনের রিপোর্টে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে সরকারি কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে মুদ্রিত শব্দের মাধ্যমে মতামত জ্ঞাপন এবং তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের স্বাধীনতা।

মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে মূলত মানুষের মৌলিক অধিকার। একইভাবে নিজের চিন্তাচেতনাকে লেখার আকারে প্রকাশ তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও মানুষের মৌলিক অধিকারেরই আরেকটি রূপ। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ নম্বর ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 'প্রত্যেকেরই বাক স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা থাকতে হবে। প্রত্যেকের নিজস্ব মত পোষণে কোন বাধা থাকবে না এবং যে কোন সংবাদ গ্রহণ ও বিতরণ করার বিধিনিষেধহীন অধিকার থাকবে'।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, মানুষ নিঃশঙ্কচিত্তে একে অপরের ভাব বা মতামতের আদান প্রদান করতে না পারলে কোন রকম মুক্তিই নিরাপদ হতে পারে না। মুক্ত সংবাদক্ষেত্রের জন্য সরকারি বা সামাজিক কোন বাধ্যবাধকতা থাকলে চলবে না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে জন মিল্টন বলেছেন, কোন্‌টি ভালো এবং জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত তার বিচারের মানদণ্ড নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। কেবল জনসমর্থনকেই নিরাপদ মানদণ্ড হিসেবে নেয়া যায়। অর্থাৎ যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের মতকে প্রতিফলিত করে তাকে প্রকাশে কেউ বাধা দিতে পারে না।

মত প্রকাশের বা লেখার স্বাধীনতার মাধ্যমে কেউ লেখা প্রকাশ করলে তাকে উপেক্ষা বা গ্রহণের দায়দায়িত্ব নেয় পাঠক সাধারণই। লেখা উপযোগী ও ন্যায়নিষ্ঠ হলে পাঠক তাকে সহসাই গ্রহণ করে। আবার অনুপযোগী হলে পাঠক তা প্রত্যাখ্যান করে। তাই লেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বা তাকে আরো ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারের দায়িত্ব সরকারের নয়। জনগণই কারো চিন্তাচেতনাকে গ্রহণ বর্জনের মূল নিয়ামক। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা একজন পথ-নির্দেশকের মতো। কারণ সরকার জনগণের প্রতিনিধি। তার কাজ অবশ্যই জনস্বার্থ রক্ষা করা। আবার সেই জনস্বার্থ মানেই হলো কোন দেশের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ। সরকার দেশের জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতম ও স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী অংশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে যদি কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বা সংবাদভাষ্যকে স্বাধীনতার পরিপন্থি হিসাবে বিবেচনা করে তবে তা হবে প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের নামান্তর। অবশ্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে যদি জনগণের তথ্য বা সংবাদ পাবার অধিকারকে বোঝায় তবে সেই তথ্য ও সংবাদকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। কিংবা প্রকাশিত কোন সংবাদ ভাষ্যে মতামতও হতে হবে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে। এখানে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকা উচিত নয়।

যারা জনপ্রতিনিধিমূলক পদে বা সরকারি পদে আসীন তাঁদের ওপর যেসব ভাষ্য প্রকাশিত হয় সে ব্যাপারে তাঁরা নীরব থাকতে পারেন না, এটা সমীচীনও নয়। তবু প্রায়শই দেখা যায় এই সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রকাশিত সংবাদ বা ভাষ্যে উল্লিখিত বিষয়সমূহ অসঙ্গত ও অনভিপ্রেত সত্ত্বেও সহ্য করেন এবং মাথা পেতে নেন। এর কারণ, বিচারপতি ক্লদ ককবার্ণের মতে, সকলেই জানেন যে সংবাদপত্র বা সংবাদক্ষেত্র থেকে যেসব সমালোচনা করা হয় তা জনকল্যাণমূলক কর্তব্যের যথার্থ পরিচালনার শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

নিরপেক্ষ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার আইনের অলংকার খচিত মুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন। একদিকে মানহানির বিষয় ও অন্যদিকে জনসাধারণের অবাধ আলোচনার সুস্থ এবং বলিষ্ঠ অধিকারের মধ্যে একান্তভাবে কাম্য সুসামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যম হচ্ছে এই নিরপেক্ষ বা বস্তুনিষ্ঠ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশ। আবারো বলি, নিরপেক্ষ বা বস্তুনিষ্ঠ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশের সবচেয়ে জরুরি উপাদান হচ্ছে জনস্বার্থ। সংবাদভাষ্য হবে সত্যনিষ্ঠ মতামতের প্রকাশ এবং তা হবে পুরোপুরি বিদ্বেষমুক্ত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমালোচনাকে গালিগালাজের ছদ্মাবরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে নয় বরং ওই ব্যক্তির কাজ ও তৎপরতার সমালোচনা করাই শ্রেয়।

একটি গণতান্ত্রিক ও পুরোপুরি মুক্ত সমাজের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে অপরিহার্য। তবে সেই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রাজনীতিকদের জন্য এই স্বাধীন সংবাদক্ষেত্র হচ্ছে একটা সার্বক্ষণিক বিরক্তি ও গা জ্বালানোর চিরস্থায়ী উৎস। এর বিপরীত যে সংবাদপত্র সেটা স্বাধীন নয়। সেই সংবাদপত্র বা সংবাদক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে কমিউনিস্টদের মতো কট্টর আদর্শবাদী সরকার অথবা কোন একনায়কতন্ত্রবাদী সরকার। কিন্তু তারপরেও কথা থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যেখানে যথেচ্ছাচারের শুরু সংবাদপত্রের বা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার পরিসীমাও সেই পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। স্বাধীনতা অর্থ অনুমোদিত যথেচ্ছাচার নয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সংবিধানের গ্যারান্টি

মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বারবার হস্তক্ষেপ হয়েছে এবং তা যুগে যুগে। মানুষের মৌলিক অধিকারে কারোরই হস্তক্ষেপ করার কথা নয়। কিন্তু তারপরও মানুষ কথা বলতে পারেনি। মানুষের এই কথা বলার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পর বিভিন্ন দেশের সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে—

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো।

বৃটেনে অবশ্য কোন লিখিত সংবিধান নেই। ফলে সেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তাও দেয়া হয়নি। তবে সেদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন দ্বারা সংরক্ষিত। বলা হয়ে থাকে যে, English law relies on the principle that what is not prohibited is permitted.

তবে মার্কিন সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক গ্যারান্টি দেয়া আছে। সেদেশের চতুর্দশ সংশোধনীতে বলা হয়েছে। '..... In the United states the concept of the freedom of press is considered to be fundamental to the American way of life. Freedom means the capacity to use one's powers of action without restraint or control form outside and with whatever means or equipment the action requires. Freedom means absence of external influence whether to suppress or to constrain. To be free also means to be free to accomplish something and it means command over all the resources, equipment etc. to achieve that end. A free press means a press which is free from the compulsions from whatever sources governmental, social, external or internal. A free press is free for the expression of opinion in all its phases. Freedom of press includes the right to adopt and pursue a policy without governmental restriction.'

অবশ্য সংবিধানে মত প্রকাশ বা বাক প্রকাশের অধিকার তথা সংবাদপত্রের অধিকারের গ্যারান্টি দেয়া হলেও কোন সংবাদপত্রই স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে পারে না। যদিও প্রত্যেক দেশের সংবিধানেই বলা যায় সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়নি।

১৭৯৯ সালে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম প্রেস সেন্সরশিপ চালু করেছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। আর পরাধীন ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রথম লড়াই শুরু করেন রাজা রামমোহন রায়। বস্তুতপক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেমন মুক্ত সমাজের ভিত্তি এবং প্রগতির শর্ত, তেমনি গণতন্ত্রের সঙ্গে বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আর এক্ষেত্রে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও গ্যারান্টিই হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রথম শর্ত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়া হলেও সংবাদপত্রের সরাসরি স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি। তাতে যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে কথা বলা হয়েছে।

একমাত্র সুইডেনেই সর্বপ্রথম এবং সেটা ১৭৫৬ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়। অথচ সেদেশেও ১৯৪৯ সালে জারিকৃত এক নতুন আইনের প্রথম ধারায় আদালতের বিবেচ্য বিষয়, ব্যক্তি অধিকার রক্ষণ ও জননিরাপত্তা বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি।

ঠিক একই ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে বাক স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়া হলেও ১৯৭১ সালে Doctrine of police power-এর মাধ্যমে সেই স্বাধীনতাকে সীমিত রাখা হয়েছে।

আগেই বলেছি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানেই স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বাধীনতার নির্বিচার ব্যবহার কেউ আশা করে না। আবার সাংবাদিকতার ওপর এমন কিছু শর্ত আরোপ করা হবে না যে, একজন সাংবাদিক ন্যায়নিষ্ঠতার মধ্যে থেকেও স্বাধীনভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে বাধার সম্মুখীন হন।

১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে Asian Mass Communication Research and Information Centre (AMIC) এবং Nepal Press Institute-এর যৌথ উদ্যোগে Press Systems of SAARC বিষয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে চারদিনের এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালায় 'সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বাক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা' সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে দুটো শর্ত হলো:

এক. সুশাসনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার চর্চা করতে হবে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নয়।

দুই. সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হতে না দেয়া।

ভারতীয় সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ব্যক্তি বিশেষের যে স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রসমূহও একই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। তবে তাই বলে, সাংবিধানিক বিধিনিষেধ বা আইনের পরিপন্থি সংবাদ বা ভাষ্য প্রকাশের অবাধ অধিকার বা বিশেষ সুবিধা সংবাদপত্রসমূহকেও দেয়া হয় না। পরিপূরক দায়-দায়িত্ব ছাড়া সংবাদপত্রসমূহ একতরফাভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। ... সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত থাকলেও ওই অধিকার লাইসেন্স-এর মতো ঢালাও অনুমতি নয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতার প্রশ্নে বা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ কর্মে প্ররোচনার বিবেচনায় আইনসভা যেসব সঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকেন সংবাদপত্রেরও ওইসব অধিকার বিধিনিষেধ সাপেক্ষ।

সংবিধান সংবাদপত্রের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে কিংবা পার্লামেন্ট সংবাদক্ষেত্রের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এ সংক্রান্ত কোন উদ্ভূত পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করার অধিকারী হচ্ছে আদালত। প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগ সংবিধানে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালনে সদাজাগ্রত প্রহরী হিসেবে কাজ করে। এজন্য প্রতিটি সাংবাদিককে সংবাদপত্রের বা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত শর্তাবলী সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতে হয়। স্বাধীনতার নির্বিচার ব্যবহার বা প্রয়োগ না করে একজন সাংবাদিক তাঁর দূরদর্শিতা ও বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে লিখতে পারেন। কিন্তু তবু তাঁর কর্মক্ষেত্রের ওপর একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়া হয়েছে। তাঁকে ওই সীমারেখার মধ্যেই কাজ করতে হয়। যখন তিনি এই সীমারেখা লঙ্ঘন করেন ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে সংবাদক্ষেত্রের সেই ছত্রছায়াও প্রত্যাহৃত হয়। এই অর্থে বলা যায় সংবাদপত্র বা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা কার্যত সীমিত স্বাধীনতা এবং এটি শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বহুদিনের পুরোনো গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইনের শর্তসাপেক্ষ লাইসেন্সবিহীন মুদ্রণ বা প্রকাশনা বিশেষ।

যদিও একথা ঠিক, সীমিত না হয়ে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেয়া হলে সেই ব্যাপক স্বাধীনতার অপব্যবহারের সম্ভাবনাও আছে। তবে এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে নেতৃত্বদানকারী জেমস্ ম্যাডিসন-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, বক্তব্য প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার অপব্যবহারের যে সামান্য সুযোগ রয়েছে তা ছাঁটাই না করে দেয়াই ভালো। কারণ এ ধরনের কিছু 'মন্দ'

উচ্ছেদ করতে গেলে আমরা হয়তো স্বাধীনতার অধিকারের সত্যিকার সুফল থেকেই বঞ্চিত হতে পারি।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সরকার

সেই প্রাচীন আমলেও বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা জনগণ সম্পর্কে গোয়েন্দা মারফত খবরাখবর নিতেন। দেশের কথা বিশেষ করে শাসকের কথা এবং রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কে তাঁরা বিভিন্ন আঙ্গিকে তথ্যও পরিবেশন করতেন। যদিও সেই তথ্য পরিবেশনে দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, ছিল তা প্রায়শই একতরফা ও একপেশে বক্তব্য, তবু শাসককুল কিছু একটা জানাতে চাইতেন। আর আধুনিক বিশ্বেতো সংবাদপত্র ছাড়া সরকার অচল। বলাই হয়ে থাকে সংবাদপত্র হচ্ছে সরকার ও জনগণের মধ্যকার এক সেতুবন্ধন। সংবাদপত্র ছাড়া সরকার, দেশ, দেশের জনগণ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকে। সংবাদপত্র ছাড়া বর্তমান দুনিয়া অচল। বর্তমান যুগটা হচ্ছে জ্ঞাপনের যুগ। সেই জ্ঞাপন-প্রক্রিয়া যদি অচল থাকে তাহলে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা একটা স্থবির জড়বস্তুতে পরিণত হয়।

সংবাদপত্র ছাড়া যে সরকার অর্থহীন তা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের কথায়। তিনি একদা বলেছিলেন, 'Were it left me to decide whether we should have government without newspaper or newspaper without government, I should not hesitate a moment to perfer the later'। অর্থাৎ সংবাদপত্রবিহীন সরকার কিংবা সরকারবিহীন সংবাদপত্র এ দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে তিনি দ্বিতীয়টিকেই বেছে নিতে এক মুহূর্ত দেরি করবেন না।

সংবাদপত্র যদি স্বাধীন না হয় তাহলে সেই সংবাদপত্র থেকে দেশের জনগণ বা সরকার কোন পক্ষই ভালো কিছু আশা করতে পারে না। সংবাদপত্রের রিপোর্ট বা সমালোচনাকে ভয় করে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সরকার প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয় না। কারণ সরকার তখন নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। সংবাদপত্র জনমতের দর্পণ। সংবাদপত্রে যদি জনমতের যথাযথ প্রতিফলন না হয় তাহলে জনগণের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সরকার কিছুই জানতে পারে না। জনগণকে উপেক্ষা করলে সে সরকারের পতনের আশংকাকে বাড়িয়ে তোলে। আগেই বলেছি, সংবাদপত্র সরকার ও জনগণের সেতুবন্ধন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত না হলে এই সেতুবন্ধন তথা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এটা একটা প্রথাসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে যে, কোন সরকারই তার সমালোচনাকে

সহ্য করতে পারে না— সে সমালোচনা সৎ ও ইতিবাচক হলেও। জনমতকে উপেক্ষা করলে কোন সরকারই ক্ষমতায় টিকতে পারে না এই ঐতিহাসিক সত্যকে বারবার প্রতিভাত হতে দেখতে পেয়েও অধিকাংশ সরকার— সেটা সামরিক হোক আর গণতান্ত্রিক হোক— সংবাদপত্রের সমালোচনাকে সহ্য করতে পারে না। ক্ষমতায় থাকেন বলেই সেই সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সংবাদসেবীদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান। প্রকৃতপক্ষে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা পরিবেশনের এ আহ্বান হলো সরকারের স্তুতিমূলক সাংবাদিকতা। বর্তমান যুগে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার যুগ বলে কিছু নেই। এখন হলো ব্যাখ্যামূলক (Interpretative) ও মন্ময় (Subjective) সাংবাদিকতার যুগ। বস্তুনিষ্ঠতা হলো ঘটনার হুবহু বর্ণনা, সাদা চোখে দেখা বর্ণনা। আর ব্যাখ্যামূলক হলো ঘটনার তলিয়ে দেখা। মন্ময় সাংবাদিকতা হলো ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার একটি চূড়ান্তরূপ। কিছুটা মতাশ্রয়ী কিন্তু সত্যনির্ভর। যাই হোক এই ব্যাখ্যামূলক ও মন্ময় সাংবাদিকতায় সমাজগোষ্ঠীর বহু অবহেলা, বঞ্চনা, দুর্নীতি, শৈথিল্য ধরা পড়ে। এতে প্রকৃতপক্ষে সমাজের উপকার হয়। সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা ধরা পড়ে। এতে সরকারের এই ত্রুটি সংশোধনের অবকাশ মেলে। কিন্তু সরকার যদি মনে করে এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়লে জনমনে তার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়, জনপ্রিয়তায় চিড় ধরে তাহলে সেটা সরকারের জন্য সাময়িকভাবে ক্ষতি না হতে পারে। কিন্তু দেশের তাতে বিরাট ক্ষতি। অবশ্য সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি, মিথ্যা কোনটাই চাপা থাকে না, তা বেরিয়ে আসেই। সেটা সরকার পতনের শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাই যে সরকার নিজেকে প্রকৃতই জনকল্যাণমুখী সরকার মনে করে সে সংবাদক্ষেত্রের সৎ সমালোচনাকে ভয় পায় না। সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণ পালন করতে দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। সরকার সংবাদপত্রে উন্মোচিত বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে নিজের সংশোধনের সুযোগ পায়, যাঁরা প্রকৃতই সরকারের মঙ্গল চান তাঁরা তাদের অপ্রিয় সত্য কথা বলবেনই। কিন্তু যাঁরা সরকারের ক্রমাগত তোষামোদ করে যায়, তার গুণাবলীর মাহাত্ম্য প্রচারে সদা ব্যস্ত থাকে তাঁরা সরকারের সত্যিকারের মঙ্গল চান না।

অধ্যাপক লাস্কি তাই যথাযথই বলেছেন, A government can learn from criticism of the enemies than the flattery of its friends. অর্থাৎ 'সরকার তার মিত্রদের (অনুচিত) স্তুতির থেকে শত্রুর সমালোচনায় বেশি শিখতে পারে।'

সরকার বিরোধিতা হচ্ছে সংবাদপত্রের প্রধান উপজীব্য। তবে অবশ্যই তা গঠনমূলক বিরোধিতা। বিরোধিতার নামে বিরোধিতা নয়। যেসব সংবাদপত্র সরকারের বিরোধিতা করে, তার সমালোচনা করে, তার থেকে সরকার অনেক কিছু শেখে। কিন্তু কিছু কিছু

সংবাদপত্রের ক্রমাগত স্তুতিতে সরকারের কোন লাভই হয় না। তাই সরকার যদি সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে রাখে তাহলে সেটা তার জন্য ক্ষতিকার। রাজনৈতিক দলগুলোর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা। যে সুনাম ও আদর্শের ওপর গণরায় নিয়ে তারা ক্ষমতায় আসে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই পরবর্তীতে সেই সুনাম ও আদর্শ বজায় রাখার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে পড়ে।

অবশ্য একটা কথা বলা হয়ে থাকে সরকার সংবাদপত্রগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে দিলে তারা তার যথেচ্ছ ও অনাইনানুগ ব্যবহার করে। ফলে সে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের থেকে যতখানি কুফল পাওয়া যায় স্বাধীন সংবাদক্ষেত্রের কিছু বাড়তি ঝুটঝামেলা পোহালেও তার সুফলটাই বেশি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু একদা বলেছিলেন, ... I would rather have a completely free press with all the dangers involved in the wrong use of the freedom than a suppressed or a regulated press. অর্থাৎ 'একটি অবরুদ্ধ অথবা একটি নিয়ন্ত্রিত সংবাদক্ষেত্রের বদলে স্বাধীনতার ভুল ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিপদসহ পুরোপুরি স্বাধীন সংবাদক্ষেত্রকেই আমি বরং বেছে নেবো'।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

স্বাধীন সংবাদপত্র বা সংবাদক্ষেত্র হচ্ছে গণতন্ত্রের শীর্ষ স্বাক্ষর। জনমতের ধারক ও বাহক হিসেবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারকে সক্রিয় এবং সজীব করে তোলা ও রাখার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র। এর পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশের সাংবিধানিক গঠন কাঠামোতেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি সুন্দরভাবে সংস্থাপিত।

স্বাধীন সংবাদপত্র একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের দর্পণ। গণতন্ত্র যদি নির্ভেজাল ও নিষ্কণ্টক হয় তাহলে সংবিধানে গ্যারান্টিপ্রাপ্ত স্বাধীন সংবাদপত্রও তার ওপর অর্পিত নিরঙ্কুশ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারে। কিন্তু দেশে যদি কোন সামরিক স্বৈরশাসকের শাসন থাকে কিংবা ক্ষমতায় যদি অধিষ্ঠিত থাকে গণতন্ত্রের মুখোশ ও লেবাসধারী কোন স্বেচ্ছাচার তাহলে সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীনভাবে দায়িত্বপালন সম্ভব নয়, জনকল্যাণ সাধনও সম্ভব নয়। কারণ স্বৈরথাবার প্রথম শিকারই হয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা। কারণ সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিফলিত হয় সমাজের সঠিক চিত্র। আর তা নিঃসৃত হয় সাংবাদিকের কলমের ডগা থেকে। 'স্বৈরাচার সত্যকে ভয় পায় তাই সে সর্বাগ্রে টুটি চেপে ধরে সত্যের'- একথা বলেছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা আবুল কালাম আজাদ।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংবিধানে অবশ্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন সব দেশে নেই। পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ গণতন্ত্র বিপন্ন। আর বিপন্ন গণতন্ত্রের কারণে সেই সব দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও বিপন্ন। প্রবীণ সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক তাই যথার্থই বলেছেন, মেকি গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও খাঁটি সাংবাদিকতা বাঁচতেই পারে না। নকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একই কথা ভিন্ন ভিন্নভাবে ভিন্ন কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে, যাকে ভিন্নমত পোষণের অধিকার হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায় না। সেখানে নানা রংয়ের প্রচারপত্র চালু থাকতে পারে, সেসবকে প্রকৃত অর্থে সংবাদপত্র বলা যায় না। চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সেখানে অনুপস্থিত।

রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চরিত্র ও সমাজ কাঠামোর ওপরই অনেক সময় সংবাদপত্রের ভূমিকা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের চরিত্র উদার ও গণতান্ত্রিক হলে সংবাদপত্র সেখানে সমাজের সঠিক চিত্রটি তুলে ধরতে পারে। আবার সমাজ কাঠামোটাই যদি অবরুদ্ধ প্রকৃতির হয়, দেশের জনগণ হয় অশিক্ষিত ও অসচেতন তাহলে সংবাদপত্রগুলো কখনই স্বাধীনতাকে ভোগ করতে পারে না। উল্লেখ্য, আমাদের দেশ রাষ্ট্রীয় ও সমাজ চরিত্রের দিক দিয়ে এখনও পুরোপুরি উদার নয়, ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও এখানে তার যথাযথ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। যেমন গণমাধ্যমগুলো সম্পর্কে বিশেষ করে টিভি ও রেডিও'র প্রতি সাধারণ মানুষের একটি অতিরঞ্জিকা ধারণা (Exaggerated notion) আছে। অর্থাৎ গণমাধ্যমগুলো যা বলে, প্রচার করে তার সবকিছুই সত্য। কিন্তু কোন সামরিক সরকার কিংবা গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে কোন স্বৈরসরকার যখন তার নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের স্বার্থে নির্বিচার প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যায়, তখন অসচেতন জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা থেকে সত্যাসত্য বের করে নেয়ার ক্ষমতা থাকে না। যেহেতু তাঁরা যুক্তিমনস্ক নয়। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ কাঠামোর এই অবরুদ্ধ এবং অনুদার চরিত্রের কারণে অন্তত আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন শাসকের মধ্যে যতখানি গণতন্ত্রী হবার সম্ভাবনা ছিল ততটা তারা হননি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বৈরাচার আরো বেশি স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে কাজ করলে জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটে সেখানে কোন শাসক বা শাসক গোষ্ঠীর আরো বড় স্বৈরাচারে পরিণত হবার মন ও সাহস থাকে না।

বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেছেন, যে সমাজে পূর্ণ গণতন্ত্র নেই, বাক স্বাধীনতা পুরোপুরি নেই, আইনের শাসন অনুপস্থিত, যেখানে রয়েছে স্বৈরশাসন ও

সামরিক শাসন, সেখানে সাংবাদিকদের অসুবিধার অন্ত নেই। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতো আমরাও দীর্ঘদিন সামরিক শাসনে থাকায় আমাদের সংবাদপত্র জগতের বিকাশ বিঘ্নিত হয়েছে।

গণতন্ত্র যতক্ষণ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পাচ্ছে ততক্ষণ সাংবিধানিক বিধিনিষেধের যথাযথ প্রয়োগ ঘটে না। গণতান্ত্রিক ভিত্তি সুদৃঢ় হলে সরকারও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে আরো বেশি সম্মান ও মর্যাদা দেয়। যে দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিলাভ করেছে সেখানে সাংবাদিকতাও একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্ট ও সংবাদপত্র হচ্ছে গণতন্ত্রের দুটি স্তম্ভ স্বরূপ। তাই মহামতি এডমন্ড বার্ক যথার্থই বলেছিলেন, পার্লামেন্টের তিনটে বর্গ, শ্রেণী বা রাষ্ট্র (Estate) রয়েছে। কিন্তু ওই যে দূরে সাংবাদিকদের আসন সারি (Press gallary) রয়েছে সেটি হচ্ছে পার্লামেন্টের চতুর্থ রাষ্ট্র (Fourth estate) এবং তা আগের তিনটি রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, পার্লামেন্টে (বিশেষত বৃটেনে) তিন ধরনের শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এঁদের একটি শ্রেণী 'লর্ড' বা সামন্ত শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে জনপ্রতিনিধি। তৃতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে যাজক সম্প্রদায়। আর সংবাদসেবীরা হচ্ছেন চতুর্থ শ্রেণী বা সারির অন্তর্ভুক্ত। সাংবাদিকরা সংসদের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও সংসদে পরোক্ষভাবে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেন। সাংবাদিকদের যদি সংসদীয় কার্যক্রম থেকে বাইরে রাখা হয় তাহলে কিন্তু গণতন্ত্র ভেঙে পড়ে। কারণ সংবাদসেবীরাই পার্লামেন্টের কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু সংসদীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যদি সাংবাদিকদের অবহিত না করা হয় তাহলে পার্লামেন্ট একটি স্থবির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

গণতন্ত্র ও সাংবাদিকতা উভয়ই যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পায় তাহলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও রক্ষিত হয় না। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলেছি যে সংবাদপত্রের দায়িত্ব হচ্ছে সত্যকে তুলে ধরা। কিন্তু সেই সত্যকে প্রতিফলিত করে তুলতে কখনোই রাজি নয় স্বৈরাচারী সরকার। কারণ সত্যকে তাদের ভীষণ ভয়। স্বাধীন সংবাদপত্র তাই যুগ যুগ ধরেই স্বৈরশাসকদের জন্য এক মহাআতংকের বিষয়। এই আতংকের বিষয় থেকে নিজেদের নিষ্কণ্টক করার জন্যই তারা স্বাধীন সংবাদপত্রের টুটি চেপে ধরে। তাই সেই সংবাদপত্রকে রক্ষায় ও তার স্বাধীনতা রক্ষায় সদা সতর্কতার প্রয়োজন। ওরায়েদ-উল হক আরো বলেছেন, 'স্বাধীনতা রক্ষায় সদা সতর্কতার প্রয়োজন। এ এমন এক অমূল্য অধিকার, একটু অসতর্কতার ফলে যা হারিয়ে যেতে পারে, ছিনতাইও হয়ে যেতে পারে। সচেতনভাবে সর্বদা আগলে না রাখলে যে কোন অঘটন ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আরো বেশি নাজুক। আরো বেশি ভাল্‌ন্যারাবল।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও তা পুরোপুরি নিরাপদ নয়। নানারকম আইনের শাসনে তাকে সংযত রাখার জন্য কখনো বিশেষ আইনের আশ্রয় নিতে দেখা যায়।'

প্রায়শই দেখা যায়, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার আগে গণতন্ত্রের আদর্শ সমুন্নত রাখা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদাদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় গিয়েও তারা মূলত স্বৈরাচার হয়ে যায়। জনগণ তাদের ক্ষমতায় বসার অধিকার দিয়েছে অতএব প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার বা তাকে নিজের ইচ্ছামতো চালানোর অধিকারও কেবলমাত্র তাদেরই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্জন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদাদানের প্রশ্নটি শাশ্বত না হওয়ার কারণেই তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলোও ক্ষমতায় গিয়ে নিজ স্বার্থে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য তারা আইনের শাসনের কথা বলেন। ভালো ভালো কথার আড়ালে এমন সব আইন অধ্যাদেশ জারি করেন যা আপাতদৃষ্টে ভালোই মনে হয়। কিন্তু তার পরিণাম হয় ভয়াবহ।

তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে দমন করার জন্য কোন সরকারের, বিশেষত আমাদের দেশে, আইনগত ব্যবস্থা না থাকলেও তার জন্য ভালো হাতিয়ার হলো বিজ্ঞাপন। যেহেতু বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সংবাদপত্রগুলো সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল সেহেতু বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের একটি মোক্ষম হাতিয়ার। আমাদের দেশে যেহেতু শিল্পের ব্যাপক প্রসার নেই, ব্যক্তিখাতে বড় বড় কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নেই, ফলে সংবাদপত্রগুলো ব্যক্তিগত খাত থেকে তেমন বিজ্ঞাপন পায় না। আবার কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যারা সরকারি আনুকূল্য পায় তারা সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ার ভয়ে সংবাদপত্রগুলোকে বিজ্ঞাপন দেয় না। পত্রিকার প্রকাশনা চালু রাখতে তাই সরকারি বিজ্ঞাপনই একমাত্র সম্বল। সংবাদপত্র আইন অনুযায়ী প্রতিটি সংবাদপত্র আনুপাতিক ও সমহারে সরকারি বিজ্ঞাপন পাবার দাবি রাখে। অতএব কথামতো না চললে সেই বিজ্ঞাপন অস্ত্রের মাধ্যমেই সরকার সরকারবিরোধী পত্রিকাগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি রুহুল ইসলাম কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন '৯০-এ বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে সংবাদপত্রের এই স্বাধীনতা অনেকাংশে ব্যাহত হওয়ার কারণ ঘটছে। আমি মনে করি, এই অবস্থা থেকে সংবাদপত্রকে মুক্ত রাখতে হলে সরকার কর্তৃক একটি প্রেস ফাইন্যান্স কর্পোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।'

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি দলীয় প্রথম সরকারের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী সাবেক এরশাদ সরকারের বিজ্ঞাপন নীতিমালার অনিয়ম প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর ১৮০ দিন পার না হওয়া পর্যন্ত সে পত্রিকাকে মিডিয়া তালিকাভুক্ত করার নিয়ম নেই। অথচ দৈনিক জনতা (মূলত এরশাদের মালিকানাধীন) ১৯৮৪ সালের ১৫ জুন প্রকাশিত হবার মাত্র একমাস পরই ২৩ জুলাই মিডিয়া তালিকাভুক্ত হয় এবং সরকারি বিজ্ঞাপন পেতে থাকে। ... ১৯৮৭-৮৮ সালে এই পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল ৯২,৮৯৬ ইঞ্চি, অথচ ওই একই সময়ে সর্বাধিক প্রচারিত বলে পরিচিত দৈনিক ইত্তেফাককে দেয়া হয়েছিল ৭১,৭০০ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন।

এ হলো 'কথিত' স্বৈরাচারী সরকারের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি সরকারও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। সে সরকারের অপর একজন তথ্যমন্ত্রী বার বার বলেছেন পত্রিকার প্রচারসংখ্যা (সার্কুলেশন) এবং ওয়েজবোর্ড বিধি যথাযথ বাস্তবায়ন সাপেক্ষেই পত্রপত্রিকাগুলোকে বিজ্ঞাপন দেয়া হবে। অথচ ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে সংসদে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বিলিবণ্টনের যে হিসেব তিনি দিয়েছিলেন তাতে বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁর বক্তব্যে জানা যায় যে, সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচার বাবদ সেবারের অর্থ বছরে যে পরিমাণ টাকা ছিল প্রথম চার মাসেই তার শতকরা ৮০ ভাগ খরচ হয়ে যায় এবং এর সিংহভাগই গেছে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাস্ট পরিচালিত দুটি ও ক্ষমতাসীন দলের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত একটি দৈনিকে। মন্ত্রীর দেয়া হিসেব অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছিল অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা। অর্থাৎ ৬২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫শ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে ছিল অধুনালুপ্ত দ্য বাংলাদেশ টাইমস। তারা পেয়েছিল ৫১ লাখ ২০ হাজার ৩শ ৫২ টাকা। সরকারি ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালিত এই দুটি পত্রিকার পরেই স্থান মিলেছিল দৈনিক দিনকালের। সরকারের মুখপত্র বলে স্বীকৃত এই পত্রিকা পেয়েছিল ২৩ লাখ ৭০ হাজার ১শ ৯৯ টাকা।

কিন্তু সে সময়ে দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাক পেয়েছিল ২১ লাখ ১৮ হাজার ১শ ৪৪ টাকার বিজ্ঞাপন। অপরদিকে দৈনিক শক্তি ও নওরোজ পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেয়েছিল যথাক্রমে ৪ লাখ ৪৭ হাজার ৬শ ৪৬ টাকা ও ২ লাখ ৭৭ হাজার ২শ টাকা। অথচ ভোরের কাগজ এবং দৈনিক জনতা পেয়েছিল যথাক্রমে ৪ লাখ ৬২ হাজার ৫শ ৯১ টাকা ও ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৩শ ৬১ টাকা।

মো. খুরশীদ আলম তাঁর 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' গ্রন্থে লিখেছেন, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য গণবিচ্ছিন্ন সরকারগণ আরেকটি যে উপায় অবলম্বন করেন সেটি হলো সরকারি প্রেস ট্রাস্টের অধীনে পত্রিকা বের করা। এদেশে সর্বপ্রথম প্রেস ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন স্বৈরশাসক আইয়ুব খান। উদ্দেশ্য ছিল সরকার সমর্থক সাংবাদিক গোষ্ঠী গড়ে তোলা। সেই ধারা আইয়ুব খানের পতনের পরও অব্যাহত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সেটিকে আবার নতুন উদ্যোগ নিয়ে পুনর্গঠিত করা হয়, অথচ এই সরকারি ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত সংবাদপত্র যে স্বাধীন সংবাদপত্রের ধারণার পরিপন্থি এটাতো আজ সর্বজনবিদিত। সংবাদপত্র যখন সরকারের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে বা অর্থে পরিচালিত হয় তখন নিশ্চয়ই তাকে আর স্বাধীন সংবাদপত্র বলার উপায় থাকে না।"

এদিকে ২০০৩ সালের ১৭ জুন ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, চলতি অর্থ বছরের প্রথমার্ধে ইনকিলাব ও দিনকাল সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়েছে। ১৫ জুন ২০০৩ রোববার জাতীয় সংসদে তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের দেয়া এক বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকাটি জানায়, চলতি অর্থবছরের ৫ জুন পর্যন্ত এক হিসাব অনুযায়ী ইনকিলাব পেয়েছে ২ কোটি ৬৪ লাখ ১০ হাজার টাকার সরকারি বিজ্ঞাপন। অন্যদিকে দিনকাল পেয়েছে, ২ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন। ইত্তেফাক পেয়েছে ১ কোটি ৪১ লাখ ৮০ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন, যুগান্তর ১ কোটি ২১ লাখ ২০ হাজার এবং প্রথম আলো ৮৪ লাখ ৬৩ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন। উল্লেখিত সময়ে দৈনিক জনকণ্ঠ কোন সরকারি বিজ্ঞাপন পায়নি।

অথচ প্রেস কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, 'There should be no daily newspaper in the public sector ... The trust newspaper may be reorganised and made free from the influence of the government'. 'সরকারি খাতে কোন দৈনিক পত্রিকা থাকা উচিত নয় ... ট্রাস্টের পত্রিকা ঢেলে সাজানো যেতে পারে এবং সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে।'

প্রেস কমিশনের এই সুপারিশ মানা হয়নি। বরং এই ট্রাস্টকে সরকারের পুরো নিয়ন্ত্রণে রেখেই পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। বিএনপি সরকারের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি সরকারি মালিকানার সংবাদপত্রগুলো পুনর্গঠন করে গতিশীল করতে আগ্রহী'। কিন্তু সরকারি মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রপত্রিকাগুলো কি আদৌ গতিশীল হয়? দৈনিক বাংলা ও টাইমস আগে এরশাদের কথা বলেছে, পরে বিএনপি'র কথা। এটাই হয়তো গতিশীলের নমুনা। এরশাদের আমলে সরকারি ট্রাস্টের

পত্রিকা হিসেবে এই দুটি পত্রিকা বেশি বিজ্ঞাপন পেতো। অন্য সরকারের আমলেও সরকারের ট্রাস্ট পরিচালিত এ দুটি পত্রিকা বেশি হারে বিজ্ঞাপন পেয়েছে। আগে এরশাদ সরকারের মুখপত্র দৈনিক জনতা বেশি বিজ্ঞাপন পেতো। পরে বিএনপি সরকারের মুখপত্র দৈনিক দিনকাল বেশি বিজ্ঞাপন পেয়েছে। ফলে এটা স্পষ্ট হয় যে, ক্ষমতায় যে সরকারই আসুক বিজ্ঞাপন অস্ত্রের মারফত সেই সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করছেন। এখানে তথাকথিত স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রীর মধ্যে আদর্শগত কোন পার্থক্য নেই। পরবর্তীতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার ট্রাস্টের অধীন দুটো পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসীন খালেদা জিয়ার সরকার পত্রিকা দুটো পুনরায় চালু করার চিন্তাভাবনা করছে।

এরশাদ সরকারের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ যথেষ্ট নমনীয় করায় অসংখ্য পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে এবং নির্বিচারে বেরিয়েছে। অন্য কথায় বলা যায় পত্রপত্রিকার বিস্ফোরণ ঘটেছে, এর যেনো জোয়ার বইছে। পত্রপত্রিকার এই জোয়ারে আমাদের সাংবাদিকতার একটা নয়া মাত্রা ও দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, সাংবাদিকতায় নতুন ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে, পাঠক হঠাৎ করেই নতুন, বিচিত্রধর্মী ও সুখপাঠ্য জিনিস পেতে শুরু করেছে, তেমনি তাঁরা পাশাপাশি এমন কিছু পাচ্ছে যা অখাদ্য কুখাদ্য বলা চলে। তাকে চাঞ্চল্যবাদ বা হলুদ সাংবাদিকতার পর্যায়েও ফেলা যায়। এ নিয়ে অবশ্য অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, পত্রপত্রিকার এমন নির্বিচার প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আবার অনেকে বলছেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার রয়েছে। তবে যে যাই বের করুক পাঠক না পেলে অরুচিকর, অজনহিতকর পত্রিকাগুলো আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। পাঠকই এখন সংবাদপত্রের নিয়ন্তা। তাঁরাই ঠিক করে দেবেন কোন্ পত্রিকা থাকবে, কোন্‌টি থাকবে না। কিন্তু এরপরেও কথা থাকে। সরকার বিরোধী বিষয়গুলোই সাধারণত পাঠকের উপজীব্য বিষয়। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনী হাতিয়ার ব্যবহার হলে শুধু প্রচার সংখ্যা দিয়ে পত্রিকাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। অপরদিকে দেখা যায় অরুচিকর এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিরোধী বিষয় প্রকাশ করেও সরকারের তোয়াজ করে অনেক গুণগত মানহীন পত্রিকা বেঁচে আছে, দিব্যি ব্যবসা করে যাচ্ছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসলে কার স্বাধীনতা

সংবাদপত্রের মালিকানার ওপরও স্বাধীনতার মানদণ্ডটি অনেকখানি নির্ভর করে, বিশেষত আমাদের দেশে যাঁরা সংবাদপত্রের মালিক বা পৃষ্ঠপোষক কিংবা সম্পাদক

অর্থাৎ কোন পত্রিকার প্রধান নির্বাহী, তাঁরা প্রায়শই সংবাদসেবী ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করেন না, করেন নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য।

সংবাদপত্রের মালিকানা আমাদের দেশে প্রধানত তিন ধরনের ঃ

এক. ব্যক্তি মালিকানাধীন সংবাদপত্র।

দুই. রাজনৈতিক দল বা গ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাদের সমর্থনপুষ্ঠ সংবাদপত্র ও

তিন. সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের মালিকানার এই শ্রেণী বিভাগ থেকেই কিন্তু একটি দিক স্পষ্ট যে সংবাদসেবীদের মালিকানায় সাধারণত পত্রপত্রিকা নেই। ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদপত্রের মালিকও কিন্তু একজন সংবাদসেবী হতে পারেন। আমাদের দেশে এরকম দু'চারজন আছেনও। কিন্তু কোন সংবাদসেবী যখন সংবাদপত্রের মালিক হয়ে যান তখন তাঁর মধ্য থেকে সাংবাদিক মানসটি উঠে যায়। ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদপত্র দেখে শুনে মনে হয় যেন ওঁরাই বোধহয় পুরোপুরি স্বাধীন অবস্থান থেকে তাঁদের পত্রিকা চালাচ্ছেন। কারণ তাঁরা কোন দলের লোক নন, কোন গোষ্ঠীর লোক নন, কোন দলের আদর্শ প্রচারের ভারবাহী নন তাঁরা, নন তাঁরা সরকারের তোষামোদকারী। কিন্তু আমাদের দেশে আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক অবস্থাটা এমন যে কোন পত্রিকার মালিক ব্যক্তিটি কিন্তু তাঁর নিজ অবস্থানগত কারণে কিংবা তাঁর ব্যবসায়িক কারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারেন না। নির্ভেজাল সাংবাদিকতা করতে এসেও কেউই তাঁর অর্থনৈতিক পুঁজিকে নষ্ট করতে চান না। ফলে অনেক কথা, সত্যি কথা বা ন্যায্য কথা বলতে চেয়েও তিনি বলতে পারেন না। আগেই বলেছি, এদেশের পত্র-পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই বেঁচে থাকে সরকারি বিজ্ঞাপনগুলোর বদৌলতে। আর সেজন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন পত্রিকাগুলো সরকারকে চটাতে চায় না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের তোষামোদ করে সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকাগুলোর চাইতে বেশি হারে। এছাড়া সমাজের অনেক দোষত্রুটি অন্যায় নিয়েও অনেক সময় তারা কথা বলতে চায় না কিংবা ঘটনা চেপে যায় কারণ এতে করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞাপনও কমে যেতে পারে। সাংবাদিক একটি 'মিশন' নিয়ে কাজ করে কিন্তু মালিক তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থে সাংবাদিকদের যুক্তি ও ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে এমন কিছু প্রকাশ করার নির্দেশ দেয় যা সরকারের তোষামোদ এবং কোন রাজনৈতিক গ্রুপ বা দলের আদর্শ প্রচারের বা স্বার্থ রক্ষার নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রচুর পত্রপত্রিকা রয়েছে। এঁদের অনেকেই সংবাদপত্রকে মূলত অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার করেছে। কেউ কেউ সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিজেকে সমাজের একজন গণ্যমান্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে। আবার অনেক কালো টাকার মালিক তাদের কালো টাকাকে সাদা করার মানসে সংবাদপত্রের মতো মহান কর্মটিকে বেছে নিয়েছে। এই সব কিছুর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য— ব্যবসায়িক স্বার্থ তথা ব্যক্তিস্বার্থ। এই দুই স্বার্থের যাঁতাকলে পড়ে সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকের স্বধীনতা নিস্পেষিত হয়েছে। সাংবাদিকের মিশন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আর এভাবেই সংবাদপত্রের পায়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে রাখা হয়েছে।

অধিকাংশের কাছেই সংবাদপত্র কোন যোগাযোগ মাধ্যম নয়, প্রচার ও প্রচারণার হাতিয়ার মাত্র। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মানসে সেই সব রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী তাদের আদর্শ ও নীতির কথা ফুলিয়ে ফাপিয়ে প্রচার করে। বড় বড় বক্তৃতা বিবৃতি প্রচার করে। সমাজ কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে যা আদৌও সম্ভব নয়, তাই করার মিথ্যা অঙ্গীকার করে। অবশ্য সমাজ সংস্কারে বড় ভূমিকা রাখে সংবাদপত্রই। পুরো কাঠামোর বদল না করলেও অন্তত উপর কাঠামোর বদলের কথা বলতে পারে সংবাদপত্রগুলো। কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী তাও করে না। বরং তারা সংরক্ষণশীলতাকেই মর্যাদা দেয়। মুখে প্রগতির কথা বললেও সংরক্ষণশীলতাকেই আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়। কোন কোন সময় অবশ্য কোন কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সংবাদপত্র সমাজ প্রগতির নামে এমন সব আদর্শ, নীতি বা সংস্কারের কথা প্রচার করে যার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ। এইরকম সংবাদপত্রে নিয়োজিত সাংবাদিক একজন সাংবাদিক হিসেবে ততটা মতামত রাখতে পারে না। বরং সংশ্লিষ্ট ওই পত্রিকার কর্মচারী হিসেবে ওই পত্রিকার মালিক, কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা দলের মতাদর্শ নির্বিচারভাবে প্রচার করে।

ঠিক একইভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকাগুলোও শুধু সরকারের কথা বলে একথা আমরা আগেই বলেছি। আমাদের দেশে সরকারি ট্রাস্টের অধীন অধুনালুপ্ত দুটো পত্রিকা একসময় এরশাদ সরকারের নীতি ও আদর্শ প্রচার করতো। পরে বিএনপি সরকারের আদর্শ প্রচার করেছে। বিলুপ্তির আগে পত্রিকা দুটো আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের গুণগানও কমবেশি প্রচার করেছে। তাহলে ওই পত্রিকার সাংবাদিকদের স্বাধীনতা থাকলো কোথায়। সরকার নিয়ন্ত্রিত বা সরকার সমর্থিত পত্রপত্রিকাগুলোতে সরকারের কোন সমালোচনা নেই। সরকার যা করছে সবই ভালো করছে। সরকার ভুলও করতে পারে, সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু সরকারি পত্রিকায় তা তুলে ধরা হয় না।

সাংবাদিকরাও তা করতে চান না। কারণ তা করলে তিনি উপরস্থ কর্মকর্তার বিরাগভাজন হতে পারেন, চাকরি নিয়ে সমস্যা হতে পারে। একটি কথা অতীব সত্য, বিরোধী পত্রিকাগুলোর মূল উপজীব্য বিষয় সরকার বিরোধিতা। সরকার বিরোধিতার বহু উপাদান পাওয়া যায়। সাংবাদিক প্রায়শই এই ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে লেখালেখি করতে পারেন। কিন্তু সরকারি পত্রিকার সাংবাদিক পরাধীন। বিশেষ করে যে সমাজ রুদ্ধ, যেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই, সৎ সমালোচনার অধিকার সেখানে নেই।

সংবাদপত্রের উপরোল্লিখিত তিন ধরনের মালিকানা বিরাজমান থাকায় আমাদের দেশের সংবাদপত্রে স্বাধীনতা তাই মালিকের স্বাধীনতা, সাংবাদিকের স্বাধীনতা নয়। আবার সেই মালিক যদি হয় কোন ভোগ্যপণের ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রের বাইরের লোক, তাহলে সাংবাদিকদের স্বাধীনতাতো দূরে থাক, তাঁদের মর্যাদাই বা কতখানি রক্ষিত হয় তা নিয়ে সংশয় আছে। এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে, সংবাদপত্রের বাইরের যে সব লোক সংবাদপত্র বের করেই তার সম্পাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে সংবাদপত্রের এবং সাংবাদিকদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। একজন বিত্তশালী সংবাদপত্র বের করতে পারেন, তাঁর স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক হতে পারেন। কিন্তু তিনি সম্পাদক সেজে বসলে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ এবং মর্যাদাবোধ নিয়ে কাজ করার মানসিকতা থাকে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে এখন জোর দাবি উঠেছে, মালিক মালিক থাকবে, তাঁর সম্পাদক হবার কোন অধিকার নেই। এমনকি সাংবাদিকতায় যাঁর দশ বছরের অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরও সম্পাদক হবার যোগ্যতা নেই। এরকম একটা দাবির মুখেই তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ... 'আমরা ভাবছি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্টকে কিছুটা সংশোধন করবো। এতে পত্রিকার ডিক্লারেশনের জন্য আবেদনকারীর বা সম্পাদক হিসেবে মনোনীত ব্যক্তির সক্রিয় সাংবাদিকতায় ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।'

ওপরের আলোচনা থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমাদের দেশে অধিকাংশ সাংবাদিকই কর্মচারী মাত্র। সাংবাদিকের মালিকানায় সংবাদপত্র এদেশে খুব কম। কিন্তু অপেশাদার সাংবাদিক তথা মালিক কাম সম্পাদকের হাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নৈতিকতা কখনই নিরাপদ নয়। সংবাদপত্র এদেশ জনগণের কণ্ঠস্বর নয় কিংবা মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার নয়। এ শুধু কিছু ব্যবসায়ী মানুষের ব্যবসায়িক সাফল্যের চাবিকাঠি, চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার। সংবাদপত্রের এই মালিকানার পন্থাপদ্ধতির কারণে সাংবাদিকের হাতে পরাধীনতার শেকল বাঁধা। সে শেকল অনেক সময় সাংবাদিকরাই নিজের হাতে পরে নিচ্ছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 'ইউনেস্কোর' অধীনে ১৯৭৮ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক সাংবাদিক সংগঠনগুলোর পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৩ সালে প্রাগ ও প্যারিসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ পরামর্শ বৈঠকে সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক পেশাগত নীতিমালা প্রণীত হয়।

দশ দফা সেই নীতিমালার তৃতীয় নীতিতে সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে এবং চতুর্থ নীতিতে সাংবাদিকের পেশাগত ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে— সাংবাদিকতায় তথ্য পণ্য নয়, সামাজিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। যার অর্থ প্রচারিত তথ্যের ক্ষেত্রে সাংবাদিকেরও দায়দায়িত্ব আছে এবং তাই তিনি শুধু তথ্যমাধ্যম নিয়ন্ত্রণকারীদের কাছেই নন, সমাজের বিভিন্ন মহলসহ চূড়ান্তভাবে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব দাবি করে যে, তিনি সকল অবস্থায় তাঁর নৈতিক সচেতনতার সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করবেন।

সাংবাদিক এমন কিছু বলবেন না যাতে পাঠক না বলে— আপনি কেন মিথ্যা কথা লিখলেন ? আবার উল্টো করেও যদি না বলে— আপনি কেন সত্য কথাটি বললেন না? ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান-এর বিখ্যাত সম্পাদক সি.পি স্কট যে কথাটি বলেছিলেন— অর্থাৎ Comment is free; facts are sacred তা সাংবাদিকতার প্রধান নীতির একটি বহুল আলোচিত বিবৃতি বা উদ্ধৃতি। অবাধ মন্তব্য করুন কিন্তু মিথ্যার বেসাতি করবেন না।

১৮৪৭ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে 'দ্য টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন যিনি সেই জন ডিলানে সংবাদপত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে ১৮৫২ সালের ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাতে বলেছিলেন, ... সংবাদপত্রের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে চলমান ঘটনার আশু ও সবচেয়ে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলোকে জাতির সাধারণ সম্পদে পরিণত করার জন্য তা জনগণের কাছে দ্রুত প্রকাশ করা ...।

... সংবাদপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকে। সংবাদপত্রে যা কিছুই প্রকাশ হোক না কেন তা চলমান সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকে...।

... সাংবাদিকের যে দায়িত্ব রয়েছে তা সত্যিকারেই একজন অর্থনীতিবিদ বা একজন আইনজীবীর মতো। তাঁদের কার্যক্ষেত্র (Province) শুধুমাত্র দিনের জরুরি বিষয়গুলোর সহজ প্রয়োগকে একটা সিস্টেমের মধ্যে বেঁধে ফেলা নয় বরং সত্যানুসন্ধান এবং বিশ্বজনীন স্থায়ী নীতিমালার আওতায় তার প্রয়োগ সাধন। সাংবাদিকের দায়িত্ব

একজন ঐতিহাসিকের মতো ... যিনি সত্যানুসন্ধানী। সবকিছুর ওপর তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে পাঠককে যতখানি পারেন ততখানি সত্য তুলে ধরা...।

এই নীতি সমুন্নত রাখতে গিয়ে ডিলানে ও টাইমস ক্রিমিয়ায় ব্রিটিশ সেনাদের কেলেংকারীময় জীবনের ওপর এমন সব রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে বৃটেনের জনগণকে এমনভাবে নাড়া দিলেন যে অনেকেই টাইমসের 'দায়িত্বহীনতায়' থ' বনে গেলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রানী ভিক্টোরিয়া। তিনি বললেন, এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের 'উচ্চ সমাজ' থেকে বহিষ্কার করা হবে।

অর্থাৎ সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে নৈতিকতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নটি এসেছিল। কিন্তু তারপরেও 'টাইমস' জগজ্জোড়া খ্যাতি পেয়েছিল। মার্কিন গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে টাইমস-এর একজন রিপোর্টারকে স্বাগত জানিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, লন্ডন টাইমস হচ্ছে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর অন্যতম। অবশ্য লিংকন একথাও বলেছিলেন, সত্যিকার অর্থে আমি জানি না যে সম্ভবত মিসিসিপি ছাড়া কার বেশি শক্তি রয়েছে।

লিংকনের কথা অবশ্যই ঠিক, কারণ সংবাদপত্রের শক্তি অমিততেজ সূর্যের মতো। আর ওই সূর্যকে আড়াল করার চেষ্টা সবসময়ই থাকে। কিন্তু নৈতিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলে সাংবাদিকের সামাজিক দায়দায়িত্বের ওপর যদি সীমারেখা টেনে নেয়া হয় তাহলে সেটা হবে জনস্বার্থ বিরোধী। রামমোহন বিদ্যাসাগরদের সময়ে কিংবা তারো আগে যখন কলকাতাভিত্তিক ভারতীয় সাংবাদিকতার শুরু হলো তখন অনেক পত্রপত্রিকাতেই কদর্যতা ছিল, কুরুচি ছিল, ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিভেদ নিয়ে অশালীন কথাবার্তা ছিল। কিন্তু কূপমণ্ডুক বাঙালি জাতি ও বিরাজমান কুসংস্কারের গায়ে যখন আঘাত লাগতে লাগলো তখন অনেক সংরক্ষণবাদীই হায় হায় করেছেন, সামাজিক দায়িত্ব ও মর্যাদার প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু রামমোহন বিদ্যাসাগরদের এডভোকেসি সাংবাদিকতার স্ফুরণ যদি না ঘটতো তাহলে আমরা আজকে যতখানি আধুনিক হয়েছি, ততখানি হতে পারতাম না।

আমাদের এখানে যখন মন্ত্রী, আমলা, বড় বড় রথী-মহারথী সাধারণ সমাবেশে ধর্মের কথা বলেন, সামাজিক মূল্যবোধের কথা বলেন, তখন শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু যখন তাঁদেরই অনেকে বড় বড় হোটেলে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী, নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপে অংশ নেন, তখন সে বিষয়গুলোকে পত্রপত্রিকায় তুলে ধরলে যথাযথ সামাজিক দায়িত্ব ও সৎ সাংবাদিকতা পালনে অনবরত পরামর্শ পেতে থাকেন সাংবাদিকরা। আসলে আমাদের দেশের অনেক মানুষই মুখে আধুনিক হলেও

প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকতে চান। আবার জীবনাচরণে তাঁদের মধ্যে একটি বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ আধুনিক মানেই জ্ঞানবিজ্ঞানে, চিন্তা চেতনায় পরিপূর্ণতা, পোশাকে আশাকে কিংবা মদপান ও ডান্সে নয়— তা আমরা বুঝতে চাই না। আমরা মান্ধাতার আমল থেকে বেরিয়ে এসে যুগোপযোগী জীবন পদ্ধতি চাই, কিন্তু তাই বলে শাশ্বত ও মানবতাবাদী চিন্তাচেতনা এবং তার প্রয়োগের পরিপন্থি হতে চাই না। মানবতাবোধকে আমরা সবসময় উচ্চে তুলে ধরতে চাই। সমাজের যেখানে মঙ্গল, যেখানে উন্নতি সেকথা সাংবাদিককে লিখতে হবেই। ছদ্মবেশী সমাজ সংস্কারক হিসেবে সেজে থাকার অবকাশ তাই নেই।

স্যার উইলিয়াম স্লিম্যান ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত তার 'Rambles and Recollections' গ্রন্থে ওয়াকিয়া নবিশ বা সংবাদ লেখকদের দুর্নীতির কথা তুলে ধরে বলেছিলেন, 'অযোধ্যার (Oude) জনৈক গোলাম হোসেন যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাঁর রাজ্যের বিশ মাইল সীমানার মধ্যে সকল সাংবাদিককে ঘুস দিয়েছিলো যাতে তাঁরা যুদ্ধে পরাজয়ের কথা প্রচার না করে।'

কিন্তু সাংবাদিক সত্যের পূজারী। সে কখনো তাঁর নিজের স্বাধীনতা নিজে রুদ্ধ করে না। ঘুস বা কোনপ্রকার দুর্নীতি বা চাপের মুখে সে সামাজিক অঙ্গীকার পালন করা থেকে কখনোই বিরত থাকে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

সংবাদপত্রের ওপর চাপ

মানুষের জানার ও জানানোর সহজাত প্রবণতা

মার্কিন কলাশাস্ত্রবিদ মার্ক টোয়েনের কথায় আবার ফিরে আসি। তিনি একবার বলেছিলেন, প্রতিদিন আমরা দুটো সূর্যোদয় দেখি। একটি প্রভাতসূর্য এবং অপরটি এপি'র সূর্য (বা সংবাদসূর্য)। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে প্রতিটি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আগের দিনের সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীতে সাজানো সংবাদপত্র পেয়ে যাই। প্রতিটি সূর্যোদয় যেমন নতুন আরেকটি দিনের সূচনা করে, প্রতিদিনের সংবাদপত্রেও বিভিন্ন সব নিত্যনতুন ও তাজা খবরে ভরপুর থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সংবাদপত্র তাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই জন্ম হয়েছে সাংবাদিকতার। অবশ্য সাংবাদিকতা মানেই যোগাযোগের নামান্তর। যখন সংবাদপত্রের জন্ম হয়নি তখনও যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলতো সংকেতের ভাষায়, আকারে ইঙ্গিতে, ধোঁয়ার মাধ্যমে। সভ্যতা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। তাই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সাথে সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপনের সহজাত প্রয়োজনীয়তাও মানুষের কাছে অনুভূত হয়েছে। যোগাযোগ স্থাপনের সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেই সৃষ্টির লগ্নেই। তাই যোগাযোগ থেকেছে চিরন্তন রূপ নিয়ে নদীর স্রোতের মতো প্রতিনিয়ত প্রবাহমান। সমাজের বিকাশের একটা পর্যায় পেরিয়ে যখন প্রস্তর যুগের লোকেরা তাদের মনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, চাষের কথা, শিকারের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাইলো গুহাগাত্রে চিত্রলেখার মাধ্যমে, কিংবা সভ্যতার আরো বিকাশের সাথে সাথে ভাষা ও লেখার সৃষ্টি হলো এবং নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা মুদ্রিত অবস্থায় রেকর্ড করে রাখার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো মানুষের, আর তার সূত্র ধরেই সংবাদপত্রের সৃষ্টি।

গতিশীল সমাজের গতির খবর বুকে নিয়েই সংবাদপত্রের অবস্থান। আধুনিক সমাজের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষ ঘটনা ও সংবাদের জন্ম দিচ্ছে অহরহ এবং প্রতিনিয়ত ব্যক্তি, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে। এসব ঘটনার ইতিবৃত্ত সংবাদপত্রের উপাদান। সংবাদপত্র পাঠকের গণ্ডির মধ্যে সহজেই বিশ্বের ও সামাজের পরিবেশ পরিস্থিতির খবর নিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে তা পরিণত হয়েছে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সওদা হিসেবে। একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আর

দশটা প্রতিষ্ঠানের মতো সংবাদপত্রের এ অগ্রযাত্রার বিকাশ ঘটেছে এবং আজকের এ অবস্থানে এসে পৌঁছেছে।

সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশন করাই সাংবাদিকতার মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু সংবাদপত্র তার সৃষ্টির লগ্ন থেকেই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালীদের রোষের শিকার হয়েছে। তার অন্যতম কারণ, সাংবাদিকের রয়েছে জানার প্রবণতা ও অধিকার এবং প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশ করে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা।

ইউনেস্কোর উদ্যোগে গৃহীত সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক পেশাগত নীতিমালার প্রথম শর্তেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ জনগণ ও সকল ব্যক্তির অধিকার আছে বাস্তব অবস্থার সঠিক ও বিশদ তথ্যনির্ভর নিরপেক্ষ চিত্রলাভের এবং সংস্কৃতি ও যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে স্বাধীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশের।

আবার পাঁচ নম্বর নীতিতে উল্লেখ রয়েছে: পেশাগত প্রকৃতিই দাবি করে যে সাংবাদিক জনগণের তথ্য জানার অধিকার এবং তথ্য বা গণমাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকারকে, ভ্রম সংশোধন অথবা পরিমার্জনা এবং উত্তর প্রদানের অধিকারসহ এসব অধিকারকে অগ্রসর করে দেবেন।

সাংবাদিকের এই জানার ও জানানোর অধিকারকে কখনোই মসৃণ হতে দেয়নি মানবস্বার্থ বিরোধীরা। জনগণকে জানানোর মহৎ উদ্দেশ্য পালনে সাংবাদিক সক্ষম হলে যারা মানুষকে ঠকায়, বিভ্রান্ত করে, মিথ্যা বলে তাদের আসল চরিত্র ফুটে উঠে। তাই সাংবাদিকের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। একেবারে প্রথম থেকেই চেষ্টা চলছে সাংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করার। বিভিন্নভাবে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সাংবাদিকের সোচ্চার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে স্বার্থান্বেষী মহল চিরকালই তৎপর। সংবাদ আহরণে বাধা সৃষ্টি করা থেকে শুরু করে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন, ভয় দেখানো, অপহরণ চলছে এমনকি মেরেও ফেলা হচ্ছে। কণ্ঠরোধের এই প্রক্রিয়া সেই আদিকাল থেকে শুরু। একুশ শতকের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এবং সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেও সাংবাদিকতার ওপর চিরকালের সেই চাপের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি।

মানুষের প্রথম স্বাধীনতা যে বাক স্বাধীনতা সেটা আমরা এর আগেও বলেছি। একজন প্রেসিডেন্টের বলার ও লেখার যে স্বাধীনতা, তাঁর একজন চাপরাসিরও সেই অধিকার রয়েছে। তবে যুগ যুগ ধরেই এ বলা বা স্বাধীনতার ওপর হুমকি এসেছে। কিন্তু যিনি বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, মানুষের মৌলিক অধিকারে বিশ্বাসী, যিনি প্রকৃত গণতন্ত্রী ও

উদার মনের, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর কোনপ্রকার চাপ যাতে না থাকে সেটাতেই তিনি বিশ্বাসী।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কখনও লাইসেন্সে পরিণত হতে পারে না। যেমন করে বলা হয়, বৃটেনের রাজতন্ত্র কখনও কোন অন্যায় করতে পারে না, একথা বলার চেয়ে রাজতন্ত্র সম্পর্কে সুস্থ সমালোচনা করার অনুমতি দেয়া অবশ্যই উত্তম। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার আছে বলেই কোন গণতান্ত্রিক সরকারও বিরোধী দলের একজন মাত্র সদস্যেরও দ্বিমতকে অগ্রাহ্য করার ও আমলে না আনার অধিকার রাখে না।

রাজনীতির অধিকার মানুষের সহজাত অধিকার। একটি আদর্শ নিয়েই মানুষ রাজনীতি করে। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের অনুমতিসাপেক্ষে রাজনীতি করার অধিকার নিতে হয়েছিল। তাও আবার প্রথমদিকে প্রকাশ্য নয়, ঘরোয়া রাজনীতি। কিন্তু কোন রাজনৈতিক আদর্শ যদি দেশের প্রচলিত মূল্যবোধ ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার না করে তাহলে সেই রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারে কেন সরকারের অনুমোদন নিতে হবে?

অবশ্য একথা ঠিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানেই স্বেচ্ছাচারিতা নয়। কারণ সেই স্বাধীনতার অনেক সময় অপব্যবহার করা হয়। একটা বিপ্লব ঘটিয়ে হয়তো একটা সমাজের বিরাট গুণগত পরিবর্তন করা যেতে পারে। সেরকমটা হলে সেই নয়া আদর্শের কথাকে বিরাজমান সরকার দ্রোহিতার সঙ্গে তুলনা করতে পারে। কিন্তু সেরকমটি যদি না হয় এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্য থেকেই যদি সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে সেটা কী স্বাধীনতার লংঘন? অবশ্য প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাই যদি কথা বলার অধিকারকে স্বীকৃতি না দেয় সেখানে একটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

কিন্তু যতটুকু বলার সীমা, যে সীমাটা মার্জিত ও যৌক্তিক অথচ তার প্রয়োগ করার পথে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় বা বাধা আসে তাহলে তাকে চাপ বলবো। আর যেহেতু আমরা সমাজের ওই কথাগুলো সমাজের দর্পণ বলে কথিত সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে বলতে চাই, আর সেখানেই যদি আসে বাধা বিপত্তি, তাহলে তাকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে সংবাদপত্রের ওপর চাপ হিসেবে।

বৃটেনে যদিও কোন ব্যক্তিকেই কোন কিছু লেখা বা বলা থেকে বিরত করার কোন আইন নেই যতক্ষণ না সেগুলো মানহানি, আদালত অবমাননা, প্রশাসনিক গোপনীয়তা প্রকাশ করে এবং সেনাবাহিনীর কর্তব্যে বাধা দেয়। সাংবিধানিকভাবে হলেও রাষ্ট্রীয় বা

রাজনৈতিকভাবে অন্যান্য দেশ বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এ ব্যাপারে ততোটা ভাগ্যবান নয়। সংবাদপত্রের ওপর চাপ সেখানে পদে পদে। অবশ্য সংবাদপত্রের ওপর চাপ শুধু বিষয়বস্তু বা লেখালেখির ক্ষেত্রে তা নয়, যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত কারণেও তা হতে পারে।

সংবাদপত্রের ওপর চাপ কত প্রকার ও কী কী

সংবাদপত্রের ওপর চাপকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়। আবার এই চার ভাগকেও বেশ কতগুলো শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায়। আমরা নিম্নে প্রথমে সংবাদপত্রের ওপর চাপের মূল চারটি ভাগ ও তার শ্রেণীগুলো উল্লেখ করছি। পরে আমরা এ বিষয়ে আলাদা বিশ্লেষণ করবো।

এক. রাষ্ট্রের চাপ

(ক) লাইসেন্স আরোপ, (খ) সেন্সর প্রথা, (গ) পত্রিকার রাষ্ট্রীয়করণ, (ঘ) সংবাদ উৎসের নিয়ন্ত্রণ ও (ঙ) ভর্তুকি

দুই. ভৌত চাপ

(ক) সহিংসতা বা হাঙ্গামা, (খ) ঘুস ও (গ) বন্ধুত্ব

তিন. আইনগত চাপ

(ক) সংবাদপত্র আইন, (খ) প্রেস কাউন্সিল (গ) আদালত অবমাননা

ও (ঘ) অপলেখ আইন

চার. বাণিজ্যিক চাপ

(ক) প্রত্যক্ষ ভর্তুকি, (খ) সার্কুলেশনের চাপ, (গ) বিজ্ঞাপনের চাপ
(ঘ) প্রতিযোগীদের চাপ (ঙ) একচেটিয়া ব্যবসার চাপ ও
(ঙ) অভ্যন্তরীণ প্রলোভন

রাষ্ট্রের চাপ: সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রের চাপই হচ্ছে মুখ্য। রাষ্ট্র না চাইলে তো পত্রিকাই বের করা মুশকিল। রাষ্ট্রের চাপ হলো সর্বগ্রাসী। সংবাদপত্রের ওপর রাষ্ট্রীয়ভাবে চাপ এলে কোন পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় চাপকে অন্য অর্থে সরকারি চাপ বলা হয়। একে বলা যায় রাজনৈতিক চাপ বা সরকারি দলের চাপ। রাষ্ট্রীয় চাপের শ্রেণী বিভাগগুলো একে একে তলিয়ে দেখলে এটা বোঝা যাবে।

(ক) লাইসেন্সিং বা লাইসেন্স গ্রহণ: যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লাইসেন্সিংয়ে পরিণত হয় তখনই কেবলমাত্র সরকার ওইসব পত্রপত্রিকা থেকে তাদের মনোমতো খবর ও মন্তব্য পেয়ে থাকে। যখন কোন পত্রিকা বা ব্যক্তি (সাংবাদিক) সরকারকে অপদস্থ করে বা হেয় প্রতিপন্ন করে তখন সেই লাইসেন্স প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। সরাসরি সেন্সরশিপ আরোপের তুলনায় লাইসেন্সিং প্রথা আরো বেশি সূক্ষ্ম। লাইসেন্স প্রত্যাহারের ভয়ে সংবাদপত্রগুলো তটস্থ ও সাবধানী হয়ে লেখে। জীবন জীবিকা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় কিংবা কারাগারের চারদেয়ালে আটকা পড়তে না হয় তার জন্য সংবাদপত্র খুব সাবধানী হয়ে কথাবার্তা বলে।

এক অর্থে সব পত্রিকারই লাইসেন্স নিতে হয়। কারণ একটি পত্রিকা বের করতে হলে তাকে রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়। ডিক্লারেশন দিতে হয়। যিনি বা যাঁরা বা গোষ্ঠী পত্রিকা বের করতে যাচ্ছেন, সরকার যদি তাঁদের সরকারের জন্য বিপজ্জনক মনে করেন তাহলে তাঁদের প্রস্তাবিত পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন বা ডিক্লারেশন নাও অনুমোদন করতে পারেন।

(খ) সেন্সরশীপ: সেন্সরপ্রথার মাধ্যমে কোন দেশের সরকার কোন কিছু প্রকাশের আগেভাগেই তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার অধিকার রাখেন এবং প্রয়োজন মনে করলে 'আপত্তিকর' অংশ বাদ দিয়ে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে সরকারই যে কেবল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তা নয়। সেন্সরশিপের খাড়া মাথায় আছে বিধায় এবং রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাহারের ভয়ে অনেক সময় পত্রিকাগুলো নিজেরাই সেন্সরড হয়ে যায় এবং কোন সংবাদবিষয়ে সরকারের কাছে পরামর্শ চায়। অর্থাৎ কোন কিছু ছাপানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়টা সরকারের ওপরই ছেড়ে দেয়। অবশ্য সেন্সর আরোপের খাড়াটি সরকার সবসময়ই বেশি ব্যবহার করে এবং প্রায় একতরফাভাবেই প্রয়োগ করে।

আমাদের দেশে সেন্সরশিপ একসময় যে কোন বিষয়ে অহরহ হতো। কিন্তু বৃটেনে সেন্সরশিপ প্রয়োগ হয় কেবলমাত্র সরকারি গোপনীয়তা, প্রতিরক্ষা বিষয় বা নিরাপত্তা বিষয়ে। কিন্তু এসব ব্যাপারেও আরোপিত সেন্সর প্রথার বিরুদ্ধে সানডে টাইমস ও ডেইলি এক্সপ্রেসের মতো পত্রিকাগুলো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে।

সরকার 'ডি' নোটিশ পাঠিয়ে সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকদের পরামর্শ দেয়— কি ছাপানো যাবে না বা কোন্ ছবি ছাপানো যাবে না। কিছু কিছু দেশ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংবাদের ওপর তাদের একতরফা মতামত ছাপার পরামর্শ (এক অর্থে নির্দেশ) দেয়। একে নির্দেশই বলা যায়, কারণ কোন পত্রিকা সরকারের ওই পরামর্শ না শুনলে তার রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাহার করে নেয়া হতে পারে। কোন কোন সময় সরকার

কোন সংবাদ বিষয়কে কেন্দ্র করে বাইরের থেকে আসা অথবা দেশ থেকে বাইরে যাওয়া বার্তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ও একতরফা মন্তব্য জুড়ে দেয়।

সেন্সরশিপ হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার বড় হাতিয়ার। সেন্সরশিপের অর্থ হলো জনগণকে প্রকৃতখবর থেকে বঞ্চিত করা। এটা তার মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। সেন্সসরশিপ হচ্ছে মানবাধিকার হরণকারী ব্যবস্থা। সেন্সরশিপের প্রয়োগ আমাদের দেশে একসময় প্রায়শই হতো। লিখিতভাবে অথবা টেলিফোনে অনেক সময়ই বলা হতো, অমুক সংবাদ আইটেমটি প্রকাশ করা যাবে না। এমনকি উপসাগর যুদ্ধের সময় মার্কিন সরকার পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে সাংবাদিকদের যুদ্ধ সংক্রান্ত খবর সংগ্রহের ব্যাপারে ১২ দফা শর্ত আরোপ করেছিল।

(গ) পত্রিকার রাষ্ট্রীয়করণ: সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে সেগুলো সেইসব খবর ও মন্তব্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করবে যা সরকারকে বিব্রত বা বিপর্যস্ত করবে না। এমনকি উদার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণেও রাষ্ট্রের বা সরকারের তোষামোদীসুলভ খবরাখবর প্রকাশ ও সম্প্রচার করা হয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকেই লক্ষ করা গেছে যখনই যে দল ক্ষমতায় ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত পত্রিকাগুলো সে দলেরই তোষামোদ করেছে। রেডিও-টেলিভিশন বিশেষ করে টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের কথাতো দীর্ঘদিন ধরেই বলা হচ্ছে। একতরফা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কারণে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে একসময় বলা হতো সাহেব বিবি গোলামের বাক্স।

(ঘ) সংবাদসূত্রের নিয়ন্ত্রণ: জাতীয় সংবাদ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে থাকলে সে সংবাদসূত্রের চমৎকার ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংসদীয় রিপোর্টিং যদি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদ সংস্থার হাতে থাকে তাহলে অনেক সময় পরিকল্পিতভাবেই পক্ষপাতমূলক এবং অনেক সময় অসচেতনভাবেই পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। সরকার বিরোধী হরতাল বা ধর্মঘট হলেও আগের তোলা জনাকীর্ণ রাস্তার ছবি দেখিয়েই হয়তো টিভিতে বলা হয়েছে, দেশের পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত ছিল।

(ঙ) ভর্তুকি: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংবাদপত্রগুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রায়শই একটি অত্যাবশ্যক ব্যাপার। ব্যাপকভাবে বিকাশমান সংবাদপত্রকে চালাতে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রয়োজন। এসব সংবাদপত্রের সূত্রসমূহের ওপর হয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে অথবা তাদের ভবন, ছাপাখানা, আমদানি লাইসেন্স, কাগজের কোটা, বিজ্ঞাপন এমনকি সাংবাদিক ধার নিয়ে কিংবা প্রশিক্ষণের সুযোগ ও বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করে। এসব

সাহায্যের অধিকাংশই হয়তো সদ্দিচ্ছাপ্রণোদিত তবে সরকারের মন্ত্রীরা এর বিনিময়ে কিছু আশা করে থাকে।

ভৌত চাপ: অন্যান্য পন্থায় বিশেষ করে অযৌক্তিক কিন্তু অহিংস পথে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করতে না পারলে সংবাদপত্রের ওপর অনৈতিক ও সহিংস পথে চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্সটিউটতো অনেক আগেই বলেছিল, সাংবাদিকতা হচ্ছে এক বিপজ্জনক পেশা। ভয়ভীতি তো আছেই, খুন জখমেরও সম্ভাবনা এতে থাকে। ভৌত চাপগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) সহিংসতা বা হাঙ্গামা: রাজনৈতিক বিরোধী ও অপরাধীরা অনেক সময় সংবাদপত্রের ওপর হামলা চালায়। পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহে এই সমস্যাটা ততোটা প্রকট না হলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে এটা মাঝে মাঝেই হয়। বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, তাঁদের ওপর হামলা পেশাগত কাজে তাঁদের হতোদ্যম করে ফেলে। সাংবাদিকদের শরীরে ক্ষুর চালানো হয়, মারপিট করা হয়, চোখ তুলে ফেলা হয়, হাত কেটে নেয়া হয়- এমনকি মেরে ফেলা হয়। অনেক সংবাদপত্র অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়, ধ্বংস করা হয়, জানালা দরজা ভাঙচুর করা হয়। কাগজপত্রে আগুন দেয়া বা চুরি করা হয়। আমাদের দেশে এরকম ঘটনা অনেক রয়েছে।

(খ) ঘুস: ঘুস নেয়া বা নেয়ার প্রচেষ্টা সাংবাদিকতার স্বাধীনতার পরিপন্থি। তবে কোন সাংবাদিক ঘুস নিয়ে থাকলে তা প্রমাণ করা একটু কঠিন বৈকি। কোন সাংবাদিক বিশেষত কোর্ট রিপোর্টারের কোন মামলার বিষয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট না করার বদলে ঘুসের প্রস্তাব দেয়া হতে পারে। কিন্তু তাঁর উচিত কোন রিপোর্টযোগ্য ঘটনাকে তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করা। এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সাংবাদিকদের ঘুসের প্রস্তাব দেয়া হয় অর্থের বদলে কোন জিনিস বা দ্রব্যাদির মাধ্যমে। ফিল্মি জগতের সাংবাদিকদের বেলায় এটা বেশি করে খাটে। পণ্যাদি ছাড়াও কোন সুন্দরীর সান্নিধ্যের প্রস্তাব আসতে পারে। যে সকল সাংবাদিক নির্বিচারভাবে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন, উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন, থিয়েটার সিনেমায় অবাধে যাবার সুযোগ গ্রহণ করেন, হোটেল, জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী দূতাবাসে ঘন ঘন যাতায়াত করেন কিংবা যাঁরা অবাধে বিনোদন লাভে ইচ্ছুক তাঁদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তিনি যেন সেই সুযোগদানকারীদের সুতোয় বাঁধা পড়ে না যান।

(গ) বন্ধুত্ব: বন্ধুত্ব নির্দোষ হতে পারে। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের আড়ালে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি ঢাকা পড়ে যেতে পারে। কোন বন্ধুর অনুরোধে দুয়েকজন সাংবাদিকই হয়তো কোন খবর ছাপা থেকে বিরত থাকতে পারেন। তাঁরা হয়তো অনেকেই সেই সংবাদের ভার ও

মূল্যকে লঘু করে দিতে পারেন। বরং তারচেয়ে বন্ধুকে আগাম বলে রাখা ভালো, 'তুমি আমাকে আমার বিবেকের বাইরে কাজ করতে বলো না'। অভিন্ন হৃদয় বন্ধুকে হয়তো নামমাত্র সাংবাদিকই প্রত্যাখ্যান করতে পারে কিন্তু সাংবাদিকতার নীতিমালাকে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

আইনগত চাপ: নীতি ও নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে আইন সৃষ্টি করে যুগে যুগে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য আইন সৃষ্টি করে শুধুমাত্র মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে এমন নয়। সংবাদপত্রের নির্বিচার ও অনৈতিক আচরণে নিয়ন্ত্রণের জন্যও অনেক আইন তৈরি হয়েছে। তবে অনেক সময়ই এই আইন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর চাপ হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। নিচে ওই সকল আইনগত চাপের বর্ণনা করা হলো।

(ক) সংবাদপত্র আইন: বহু দেশেই অভিন্ন সংবাদপত্র আইন রয়েছে। রাষ্ট্রপতি বা সরকার প্রধান অথবা মন্ত্রীদের সম্পর্কে অমর্যাদাকর কোন কথাবার্তা প্রকাশ করা হচ্ছে আইন বহির্ভূত ব্যাপার। এমন কোন পরিকল্পিত কথাবার্তা প্রকাশ করা যাবে না যা অসন্তোষ ছড়ায়, ধর্মঘট, হরতাল বা গণ অসন্তোষে উৎসাহ যোগায়, সরকারের বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। এ সবই আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। নিজের সমালোচনা কোন সরকারই চায় না। কিন্তু তারপরেও সরকারের সৎ উদ্দেশ্য প্রণীত আইনেরও বিপদ আছে।

(খ) প্রেস কাউন্সিল: প্রেস কাউন্সিল হচ্ছে প্রায় ক্ষমতাহীন একটি সরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থা। এর একমাত্র অস্ত্র নৈতিকতা— সেন্সর ও সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ভর্ৎসনা। প্রেস কাউন্সিলের রায় প্রকাশ করার কোন বাধ্যবাধকতা সংবাদপত্রের নেই। কিন্তু প্রকাশ না করলে সংবাদপত্রগুলোকে সাধারণত নিন্দিত হতে হয়।

প্রেস কাউন্সিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিচার করা। যে কেউ কাউন্সিলের কাছে সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা বা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করতে পারে। কাউন্সিল যদি মনে করে কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাংবাদিকতার নীতি ভঙ্গ করেছে কিংবা কোন সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরণ অথবা সাংবাদিকতার আচরণ বহির্ভূত কাজ করেছে তবে কাউন্সিল এইসব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করতে পারে। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে কাউন্সিল তিরস্কার, নিন্দা বা হুঁশিয়ারির মতো নৈতিক শাস্তি দিতে পারে।

প্রেস কাউন্সিল হচ্ছে কল্যাণকামী 'বড় ভাইয়ের' মতো। ঝগড়া বিবাদ বা ঝামেলায় সে ছোট ভাইদের বড় ভাইয়ের মতো ধমক দিয়ে থাকে। সাবেক তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার মতে, 'প্রেস কাউন্সিলের অবস্থা অনেকটা সংবাদপত্রের মাথায় হাত বুলানোর মতো'।

মানুষের মৌলিক অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যেই প্রেস কাউন্সিলের গঠন। কিন্তু ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রেস কাউন্সিল অবাধ ও মুক্ত আলোচনা এবং মতামত বিনিময় কর্মকাণ্ডের ওপর খুব সহজেই বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। বিশেষ করে কাউন্সিল যদি গঠিত হয় সরকারের নিজস্ব লোকজনদের দ্বারা।

(গ) আদালত অবমাননা: আদালত ও সংসদ অবমাননা আইন অতি সংবেদনশীল সাংসদ ও অযোগ্য, অদক্ষ বিচারকদের রক্ষা করে থাকে। একজন ভালো ও সৎ সাংবাদিক সংসদের সদস্যদের কোন দুর্বল বিচার বা মূর্খতাপূর্ণ, অপরাধপূর্ণ ও অন্যায্য আচরণের তীব্র সমালোচনা করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন কিন্তু তাঁর এতে জেল খাটার বা জরিমানা দণ্ডের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে অনেক সময় আপিল করার সামান্য সুযোগই থাকে। অবশ্য রাজনীতিকরাই সাধারণত সাংসদ হয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে একটা উদারনৈতিক মনোবৃত্তি কাজ করে থাকে। ফলে তাঁরা সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রায়শই কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সুবিধাটি গ্রহণ করেন না। অপরদিকে একজন বিচারকের দুর্বল বিচারকাজের সমালোচনা হতে পারে কিংবা সংশ্লিষ্ট জন ন্যায়বিচার পাননি বলে জানাতে পারেন কিন্তু ওই বিচারকের কোন সমালোচনা করা চলে না।

(ঘ) অপলেখ আইন: অপলেখ আইন নির্দোষ ব্যক্তিকে মানহানি থেকে রক্ষা করে। অপলেখ আইন সংবাদপত্রগুলোকে শঠতা ও প্রতারণা করা থেকে বিরত রাখে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরিকল্পিত কোন কিছু কাউকে যদি ঘৃণিত, হাস্যাস্পদ ও অপমানিত করে তোলে তবে তিনি অপলেখ আইনের অধীনে মামলা করতে পারেন। ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারেন। সংবাদপত্রের জন্য এটা খুবই বিপজ্জনক। সংবাদপত্রের যদি মানহানিকর কথাবার্তা ভুলক্রমেও প্রকাশিত হয়ে যায় তবে সেটাও পার পেতে পারে না। এর শাস্তিও বড় ধরনের হতে পারে। বৃটেন, আমেরিকায় তো সাংবাদিকরা মানহানির মামলার ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ থাকেন। সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে তাঁরা তাই বেশি সতর্ক। পত্রিকায় প্রতাশিত মানহানিকর কথাবার্তায় যদি কারো ব্যক্তিসুনাম হানি হয়, কারো যদি ব্যবসায়িক সুনাম দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণের মামলায় সাংবাদিককে লক্ষ লক্ষ ডলার জরিমানা দিতে হতে পারে।

বাণিজ্যিক চাপ: বাণিজ্যিক চাপই হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় হুমকি। অন্যান্য চাপ যতই থাকুক, বাণিজ্যিক চাপ তীব্রতর হলে সংবাদপত্রের অস্তিত্বে টান পড়ে। একটি পত্রিকা যতই সৎ ও ভালো হোক না কেন, সে যদি অব্যাহতভাবে আর্থিক সংস্থান হারাতে থাকে তাহলে সে পত্রিকা কিছুতেই চলতে পারে না। সংবাদপত্র একটি শিল্প হলেও মূলত তা একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠান, তাই টাকা-পয়সায় টান পড়লে কোন পত্রিকা চলতে পারে না। বাণিজ্যিক চাপসমূহ হচ্ছে—

(ক) প্রত্যক্ষ ভর্তুকি: প্রত্যক্ষ ভর্তুকির সঙ্গে রীতিমতো বিপদ রয়েছে। এই ভর্তুকি রাষ্ট্রের থেকে আসে সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এই ভর্তুকি আসে রাজনৈতিক দল কিংবা বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান থেকেও। এই ভর্তুকির বদলে রাজনৈতিক দলগুলো পত্রিকার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে, সেটা সঠিক বেঠিক যেটাই হোক না কেন। বেসরকারি ব্যবসায়ীগণ ও কোম্পানিগুলো সংবাদপত্রগুলোকে ভর্তুকি দিলে তার বিনিময়ে অনেক কিছু আশা করে। কোন দৈবাৎ, দুর্ঘটনা বা কেলেংকারি যা ওইসব ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসায়ীদের বা তাঁদের বন্ধুদের বা কোম্পানিগুলোকে সংশ্লিষ্ট করে তোলে-ভর্তুকি নেয়ার জন্য পত্রিকাগুলো ওইসব খবর ছাপে না, চেপে যায়। ভর্তুকি নেয়ার কারণে সংবাদপত্রের সম্পাদক শুধুমাত্র তাঁর সেরা সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার জন্যই কেবল সমালোচিত হবার ভয়ের মুখোমুখি হন না, ছোটখাটো সংবাদ আইটেম ও সংবাদ বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও সমালোচনার সম্মুখীন হন।

এই প্রত্যক্ষ ভর্তুকি যেমন নিউজপ্রিন্টের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার তা কোন সংবাদপত্র প্রকাশনার পুরো মূলধন যোগানোর ক্ষেত্রেও হতে পারে। কোন কোন পত্রিকা তার 'সিস্টার' প্রকাশনার কাছ থেকেও ভর্তুকি পায়। যেমন সরকারি ট্রাস্টের অধীন বাংলাদেশের অধুনালুপ্ত পত্রিকা দৈনিক বাংলা সরকারি ভর্তুকি এবং তার 'সিস্টার' প্রকাশনা সাপ্তাহিক 'বিচিত্রার' কাছ থেকে ভর্তুকি পেতো।

(খ) সার্কুলেশনের চাপ: অন্য অনেক শিল্পের মতোই যতো বেশি সংখ্যক কাগজ ছাপা যাবে ততো বেশি মুনাফার সম্ভাবনা। ৫০ হাজার কপি পত্রিকা ছাপতে যে খরচ একলাখ ছাপতে গেলে তাতে খুব বেশি বাড়তি খরচ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শুধু ছাপলেই হবে না, সেই বাড়তি কপির পাঠক থাকতে হবে। বেশি সংখ্যায় পত্রিকা ছাপিয়ে অধিক সংখ্যক জনগণের কাছে পৌঁছার একটা লোভ থাকতে পারে। কিন্তু এতে সাফল্য নাও আসতে পারে। আবার প্রচার সংখ্যা বাড়াতে গিয়ে কিংবা পত্রিকার পাতার সংখ্যা বাড়াতে গিয়ে কাগজের বিষয়ভিত্তিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক মানের পতন ঘটতে পারে। সংখ্যালঘুদের কথা ও মতামত ভালোভাবে নাও আসতে পারে। যে

পত্রিকায় অবাধ অর্থনীতি, অবাধ যৌনতা, বিলাসবহুল জীবনের কথা বলা হয়, সেটা বামধারার পত্রিকা থেকে বেশি কাটতি হতে পারে। তবে একটা কথা ঠিক, একটি পত্রিকা বের হয় একটি 'মিশন' নিয়ে, সার্কুলেশন কত বাড়ানো যায় তা নিয়ে নয়। তবে মূলত যারা আলু পটলের মতো ব্যবসা করতেই পত্রিকা বের করে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু এটা স্মরণযোগ্য, সংবাদপত্রের ব্যবসা শুধু ব্যবসা নয়, এখানে কিছু সামাজিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকার থাকে।

(গ) বিজ্ঞাপনের চাপ: বিজ্ঞাপনদাতারা যথেষ্ট সংখ্যায় বিত্তশালী সব ভোক্তার কাছে পৌঁছুতে চায় যাঁদের পণ্যদ্রব্যাদি কেনার ভালো সামর্থ আছে। অতএব, ওই সকল বিজ্ঞাপনদাতা উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পত্রিকা মারফত তাঁদের বিজ্ঞপ্তি প্রচারে পছন্দ করে। অতএব পত্রিকাগুলোর চরিত্র কী হবে তা স্পষ্ট। পত্রিকা মালিকরা ওই সকল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবে, তাঁদের কথাবার্তাই বেশি করে বলবে। তাঁরা এমন কোন সংবাদ নিয়ে পাঠকদের শঙ্কিত করে তুলবে না যে 'ব্যবসায়িক আস্থা' ঝাঁকুনি খায়। বড় বড় বিজ্ঞাপকরা যদি পত্রিকার সম্পাদক বা মালিককে ফোন করে বলে, এটা ছেপো না, ওটা ছেপো না, কিংবা এটা ছাপো, ওটা ছাপো, তবে সেটা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য বিরাট হুমকি।

উন্নয়নশীল দেশে বিশেষত বাংলাদেশে সংবাদপত্রগুলো মূলত সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে বেসরকারি পর্যায়ে বড় বড় কলকারকানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই যাদের বিজ্ঞাপনে পত্রিকাগুলো বেঁচে থাকতে পারে। আমাদের দেশে বেসরকারি পুঁজি তেমন করে গড়ে ওঠেনি। ফলে সরকারি বিজ্ঞাপনই ভরসা। কিন্তু সরকার বিরোধী সংবাদ বা সংবাদভাষ্য প্রকাশ করলে সবসময়ই সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবার ভয় থাকে। একসময় 'দৈনিক সংবাদ' সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, পরে 'দৈনিক জনতা' সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়েছিল।

(ঘ) প্রতিযোগীদের চাপ: সংবাদপত্রগুলো মাঝে মাঝেই একে অপরের সঙ্গে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। নিজেদের পত্রিকা কত ভালো তা একে অপরকে দেখাতে চায়। এতে করে পত্রিকার বিষয়বস্তু ও মানের পতন ঘটে থাকে। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতে গিয়ে পত্রিকাগুলো সংবাদের সংবাদমূল্য ভুলে বসে কিংবা এমন সব খবরকে চাঞ্চল্যকর করে ছাপে যা ওই পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই চমৎকৃত করে, পাঠকদের নয়। সংবাদপত্রগুলো তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করতে সংবাদের বদলে এমন সব বিনোদনমূলক গালগপ্পো ছাপে যে পাঠক বিরক্ত হয়। পত্রিকার কাটতিও এতে কমে যায়। আবার এমন কিছু পত্রিকা আছে যারা বিনোদনমূলক বা উদ্দীপনা

সঞ্চারকারী নিত্যনতুন এমন কিছু দিচ্ছে যে প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা তা বিনষ্ট করার তালে থাকে। অনেক সময় ইউনিয়নের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ওপর হামলাও চালায়, গুণ্ডাবাজি করে।

এছাড়া হকার্স স্ট্যান্ড বা কর্নারে নিজেদের পত্রিকা আরেকজনের ওপর রাখার ব্যাপারে চাপ দেয়, কোন কোন সময় বিপক্ষের পত্রিকা স্ট্যান্ড বা কর্নার থেকে সরিয়ে ফেলতে বলে। এজন্য হকারদের মারধর থেকে ঘুসও দিয়ে থাকে।

(ঙ) একচেটিয়া ব্যবসায়ের চাপ: বাজারে যদি নিজের পত্রিকার চাহিদা একচেটিয়া হয় তাহলে আরো মুনাফার লোভে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটি অখ্যাদ্য কুখাদ্য অনেক কিছুই সরবরাহ শুরু করতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসা হলে অনেক সময়ই ভালো মানের পত্রিকা পাওয়া যায় না। এমনও দেখা যায় কোন কোন পত্রিকা হাজারো বিজ্ঞাপনে ঠাসা, সংবাদের পরিমাণ সেখানে নগণ্য, তখন সেই পত্রিকা সংবাদপত্র না থেকে বিজ্ঞাপনপত্র হয়ে যায়।

কোন পত্রিকা একচেটিয়া ব্যবসা করতে থাকলে তখন পত্রিকাটি সস্তা লেখা, নিবন্ধ, সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপে। নিজের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা ছাপে, অন্যের মতামতের তোয়াক্কা করে না। তখন শুধু টাকা বানানোর ধান্দা মাথায় কাজ করে। পত্রিকা হয়ে যায় একপেশে ও অসুখপাঠ্য। পাঠযোগ্য বিষয়ও কম থাকে। আস্তে আস্তে পত্রিকাটি নতুন আরেকটি পত্রিকায় রূপ নেয় এবং একসময় তা হয় ঐ পত্রিকাটির জন্য এক অর্থনৈতিক আত্মাহুতি।

চ) অভ্যন্তরীণ প্রলোভন ঃ অভ্যন্তরীণ প্রলোভন হচ্ছে কোন সংবাদকর্মীর যুক্তিবিবর্জিত বৈষয়িক চিন্তাচেতনার ফসল। এ নিয়ে সংবাদকর্মীর মধ্যে প্রতিনিয়ত এক সংঘাত বা দ্বন্দ্ব চলছে। যে বিষয়সমূহ অধিকাংশ পাঠককে ত্বরিত উৎসাহিত করে কিংবা বাণিজ্যিক লোকসানের বিনিময়ে হলেও মানুষের যা জানা উচিত তা বাছাই করার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বে ভোগেন সাংবাদিক। সাংবাদিক সবসময়ই সত্যের অন্বেষা করে। কিন্তু ক্ষমতাবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো করার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও সংঘাত দেখা দেয়। আবার এমন দেখা যায় যে, দেশ নিয়ে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে হয়তো মনের মাঝে উঁকি দেয়: এ আমার দেশ, দেশের কেউ সঠিক বা ভুল যে কাজটিই করুক, তবু সে আমার দেশ। একে প্রতিরোধ করার সংঘাত বা দ্বন্দ্বেও ভোগেন সাংবাদিক।

কিন্তু একজন সাংবাদিক যদি সত্যকে গৌণ বিষয় হিসেবে স্থান দেন তাহলে তিনি অসুন্দরের পূজারী। অথবা তিনি এমন একজন একরোখা মানুষ যিনি যুক্তিতর্কের ধার

ধারেন না। সমস্ত প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিকতার পথেই থাকা উচিত সাংবাদিকের।

সংবাদপত্রের চাপ প্রতিহত করার উপায়

সংবাদপত্রের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে নানামাত্রিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে। আগেকার দিনে চাপটা ছিল এক ধরনের, এখন তার গুণগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে চাপের মৌলিক দিকটি এখনও একই রকম রয়েছে।

সংবাদপত্রের চাপকে প্রতিহত করার চেষ্টা সেই প্রাথমিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। সংবাদপত্রের জন্য যে আদর্শ গড়ে ওঠা দরকার তা আমাদের সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণেই গড়ে ওঠেনি। ভালোমন্দের ভেদরেখাকে চিহ্নিত করতে পারার সামর্থ এবং নৈতিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতির প্রতি যদি সাংবাদিকসহ সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সরকার সবাই মর্যাদা দেয় তাহলে সংবাদপত্রের ওপর চাপকে প্রতিহত করা যাবে অনেকাংশেই।

প্রতিটি দেশেই সাংবাদিকদের ইউনিয়ন আছে। আমাদের দেশেও আছে। এই ইউনিয়ন যদি সংঘবদ্ধ হয় এবং তারা যদি বস্তুনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিকতার মহান ব্রত নিয়ে কাজ করেন তাহলে সংবাদপত্রের ওপর চাপের বিরুদ্ধে সাংবাদিক ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী ফোরাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশের সাংবাদিক ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সংবাদপত্রের ওপর চাপকে আরো তীব্রতর করে তুলছে। অবশ্য কোন একটি দেশের সরকার ইউনিয়ন করার অধিকার কতটুকু করতে দেবেন কিংবা দেশে শ্রম ও শিল্প আইনের সুষ্ঠু ব্যবহার কতখানি আছে তার ওপরই এটা অনেকখানি নির্ভর করে। বিদেশে অবশ্য এর ভিন্ন চিত্রও আছে। জার্মানির এক তৃতীয়াংশ সাংবাদিকই কোন ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। তবু সাংবাদিকদের সরকার ও সংশ্লিষ্ট অনেকেই সমীহ করে চলে।

আইনগতভাবেও চাপকে প্রতিহত করা যেতে পারে। সংবাদপত্রে কোন কথিত আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশ হলেই সংশ্লিষ্টজন প্রেস কাউন্সিলে মামলা করে সুবিচার আশা করেন বা পেয়ে থাকেন কিন্তু সংবাদপত্র নিজেও তার কোন অসুবিধা হলে প্রেস কাউন্সিলের পরামর্শ বা আইনগত সাহায্য নিয়ে নিতে পারে।

আমাদের দেশে Editorship এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্জন করেনি। এর বিপরীতে বলা যায় যতটুকু প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিল তাও আজ হারিয়ে গেছে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আব্দুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরীর মতো বরেণ্য সাংবাদিকগণ

Editorship-কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। অন্য ধারার ব্যবসায়ীগণ কেবল অর্থবলেই পত্রিকার সম্পাদক হন। সম্পাদকের আত্মীয় যোগ্যতা থাকা না সত্ত্বেও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পাদক হন। সংবাদপত্রের মৌলিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। এসব কারণে Editorship-এর মান মর্যাদা বিনষ্ট হয়। শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। স্বভাবতই তখন বিভিন্ন কোণ থেকে চাপ প্রয়োগের চেষ্টা চলে। সম্পাদক যদি হন মহীরুহের মতো, তাহলে চাপ প্রয়োগকারীরাও দু'দণ্ড চিন্তা করেন।

এডিটরশিপকে অর্জন করার জন্য কোন পেশাদার সাংবাদিককে সাংবাদিকতার একটি সুনির্দিষ্ট মান (a certain level of standard) অর্জন করতে হবে। এডিটরশিপের একটি পূর্ণাঙ্গ চেহারা অর্জিত হলে স্বভাবতই চাপের মাত্রাও কমে আসে।

সংবাদপত্র পাঠক ফোরামের ওপরও সংবাদপত্রের ওপর চাপের বিষয়টি নির্ভর করে। যে পত্রিকার ভালো পাঠক ফোরাম নেই, সেই সব পত্রিকা জোর চাপের সম্মুখীন থাকে। আবার যে পত্রিকার শক্তিশালী পাঠক ফোরাম রয়েছে তারাই সংশ্লিষ্ট ওই পত্রিকার ওপর বিভিন্ন চাপকে লঘু কিংবা দূরীভূত করে ফেলতে পারে। কিন্তু আমাদের ১২ কোটির মতো লোকের দেশে যেখানে সব মিলিয়ে দশ লাখও একনিষ্ঠ পাঠক নেই সেখানে পাঠক ফোরাম ততো জোরদার নয়। জনগণকে তাই সংবাদপত্র পাঠে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। অবশ্য দু'য়েকটি পত্রিকার পাঠকফোরাম খুবই শক্তিশালী। তাদের ভালো নেটওয়ার্কও রয়েছে।

সংবাদপত্রের ওপর চাপ প্রতিরোধে সংবাদপত্র মালিক সমিতিরও একটি দায়িত্ব আছে। যদিও আমাদের দেশে অধিকাংশ মালিক আধিপত্যবাদী শ্রেণীরই প্রতিভূ। কোন মালিক এখানে সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে বের করে না। বের করে টাকা বানানোর কল হিসেবে। অন্য অর্থে একে তাই পেষণশিল্প (Pressure Industry) বলা যায়। যার দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ দেয়ার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই জন্য সংবাদপত্র মালিকানায় একটা শ্রেণীগত ও গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন। যে সকল মালিক সংবাদপত্রকে সৃজন শিল্প হিসেবে গণ্য করে তাঁরাই এ পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে পারে।

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরও সংবাদপত্রের ওপর চাপের কমবেশি প্রভাব নির্ভর করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলে তার সবকিছুর নিয়ন্ত্রণই রাষ্ট্রের হাতে থাকে। কিন্তু যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেখানে তো চাপ কম থাকার কথা। পশ্চিমা দেশগুলোতে পুঁজির বিকাশ এতখানি হয়েছে যে, সংবাদপত্রগুলোর তাদের ওপর আসা আঘাত সহ্য করার শক্তিও রয়েছে। তাই সাংবাদপত্রের স্বাধীনতাও সেখানে রয়েছে।

কিন্তু আমাদের মতো দেশে যেখানে কোনদিনই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি কিন্তু পুঁজিবাদেরও সঠিক ও সফল বিকাশ ঘটেনি সেখানে সংবাদপত্রের সত্যিকারের স্বাধীনতা নেই, ফলে তার ওপর চেপে বসা চাপকেও সহ্য বা প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা তার নেই। এছাড়া সংবাদপত্র শিল্পের টিকে থাকার জন্য যে পরিমাণ বেসরকারি পুঁজির প্রয়োজন তাও এখানে তৈরি হয়নি।

বিভিন্ন কোণ থেকে আসা সংবাদপত্রের ওপর চাপকে প্রতিহত করার বিষয়টি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কোন সমাজের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যে দেশের জনগণ অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত সে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও থাকে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যথাযথভাবে পালিত হলেই কেবল মানুষের নাগরিক অধিকারও যথাযথ প্রতিপালিত হয়। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ কতখানি বিরাজ করছে, মানুষের নাগরিক অধিকার প্রতিপালনে বিচার বিভাগ কতখানি সমর্থন দিতে পারছে তার ওপরই চাপের বিষয়টিও নির্ভর করে। দীর্ঘস্থায়ী গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করলে মানুষ তাঁর নাগরিক অধিকার সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হয়। এটা সংবাদপত্রের ওপর চাপ প্রতিরোধে শক্তি যোগায়।

যাঁরা সাংবাদিকতাকে জীবনবৃত্তি হিসেবে নিতে চান তাঁদের যদি বেশি হারে এ পেশায় আনা যায় তাহলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জন ও চাপ দূরীভূত করতে সহায়ক হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল্য জনগণের কাছেও আছে এ ধরনের লেখালেখি প্রকাশিত হলেও চাপ কমতে পারে। অথবা 'আমরা চাপের মুখে আছি' এ ধরনের প্রচারমূলক কথাবার্তা দৃষ্টান্ত সহযোগে দীর্ঘদিন প্রকাশ করে চাপের প্রতিকূলে অনেককে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা এখন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেষ্টিত নয়। তার পরিমণ্ডল এখন ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের হাস্যোচ্ছলে বলা 'সাংবাদিক' নামের 'খবরদার'রা এখন শুধু খবরদারিই করেন না। সংবাদবৃত্তি একটি শ্রেষ্ঠ শ্রেণী চরিত্র অর্জন করেছে এবং তা শ্রেণী সংগ্রামের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ায় সাংবাদিক সংবাদপত্রকে হাতিয়ার করে খবর দেয়ার বাইরেও মানুষের কথা বলবে, শৃঙ্খলামুক্ত জীবনের কথা বলবে, সংগ্রামের কথা বলবে।

আমাদের মতো প্রায় অবরুদ্ধ সমাজে চাপ অবশ্যই থাকবে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো অবরুদ্ধ এই সমাজকে ভেঙে যদি মুক্ত সমাজে পরিবর্তন করা যায় তাহলে চাপটাও হয়তোবা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাবে।

সাংবাদিকতার ধরন

সাংবাদিকতা যখন ছিল প্রচারণা ও গোয়েন্দাবৃত্তি

সাংবাদিকতা হচ্ছে এক জ্ঞাপন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ নিজে কিছু জানা এবং অপরকে জানানোর প্রক্রিয়া। এই জানা ও জানানোর প্রক্রিয়া চলছে নিরন্তর।

সাংবাদিকতা একসময় শুধু জানানোর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। কি জানাতো, কেন জানাতো তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না— যখন মানুষ শিক্ষিত হয়নি, সচেতন হয়নি, সেই মধ্যযুগ বা তারো আগের কথা। এখন দিনকাল পাল্টে গেছে, জনগণ যেমন জানতে চায়, তেমন উল্টোপথে জানাতেও চায়। অর্থাৎ সাংবাদিকতায় শুধু সাংবাদিক নিয়োজিত নন, সাংবাদিকতায় এখন জনগণেরও ব্যাপক অংশগ্রহণ।

কিন্তু একসময় সাংবাদিকতা প্রচার ও প্রচারণা ছাড়া কিছুই ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছিল বিশুদ্ধ রকমের গোয়েন্দাবৃত্তি। সেই জুলিয়াস সিজারের আমলের বা সমসাময়িককালে যে সাংবাদিকতা - তা ছিল একতরফা প্রচার মাত্র। সম্রাটের যুদ্ধজয়ের খবর, সম্রাটের রাজ্য পরিচালনার খবর, সম্রাটের গুণাবলীর খবর (যেহেতু তিনি কোন ভুল করেন না) প্রচারই ছিল সেই সময়কার সাংবাদিকতার মুখ্য বিষয়। জনগণের তাতে কোন ভূমিকা ছিল না। বরং তাঁরা সম্রাটের নানা কথা শোনার জন্যই যেন উদগ্রীব হয়ে থাকতো। কেন সম্রাট একথা বললেন সে নিয়ে তাঁদের মধ্যে যৌক্তিক তর্কবিতর্কও হতো কম। যাও বা হতো তা নিয়ে তাঁরা কোন কথাবার্তা সম্রাটের কানে সেইভাবে পৌঁছে দিতে পারেননি। এছাড়া প্রচলিত আইন কানুন এমন কঠোর ছিল যে সম্রাট বা সাম্রাজ্যের সমালোচনা ছিল কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেই সময়ের সংবাদবৃত্তির কাছে নিয়োজিত লোকেরা খবর নিতেন যে রাজা বা সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে কিনা বা সম্রাটকে ক্ষমতাচ্যুত করার কোন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিনা। জনগণের যেহেতু অংশগ্রহণ ছিল না তাই সে আমলের সাংবাদিকতা সত্যিকারের সাংবাদিকতা ছিল না, ছিল গোয়েন্দাবৃত্তি। বড়জোর প্রচারণা। যেহেতু প্রচারণাসর্বস্ব ছিল সেই সাংবাদিকতা তাই তার ভাষারীতিও ছিল অপরিশীলিত, অশুদ্ধ। যদিও ভাষারও তখন সত্যিকারের বিকাশ ঘটেনি। এছাড়া সংবাদ বিষয়, সংবাদভাষ্য বা সংবাদ নির্মাণ কাঠামোও আজকের মতো আধুনিক রূপ, বিস্তৃতি ও ছোঁয়া পায়নি ফলে সে সময়ের সাংবাদিকতার ধরনকে আদর্শ সাংবাদিকতার মাপকাঠিতে ফেলা যায় না।

ছাপাখানা ও সাংবাদিকতা বৃত্তি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানবাসী গুটেনবার্গ যখন মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন, বাইবেল ছাপিয়ে ফেললেন, তখনই কিন্তু গণজ্ঞাপনের পক্রিয়া শুরু হলো। অর্থাৎ এক সঙ্গে অনেক লোককে জানানোর একটি প্রক্রিয়া শুরু হলো। ধীরে ধীরে সাংবাদিকতা বৃত্তির প্রসার লাভও ঘটলো। সাধারণ জনতাকে অনেক কথা, সত্য কথা জানানোর প্রয়োজন বোধ করলো এই বৃত্তির সঙ্গে নিয়োজিতরা। প্রাচীরপত্রের নিয়ন্ত্রক ছিল রাজা সম্রাটেরা। কিন্তু ছাপাখানার নিয়ন্ত্রক ছিল সাধারণ মানুষ। ফলে মুদ্রণ ব্যবস্থার ওপর সেই মধ্যযুগ থেকেই নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য ছাপাখানার মহাআবিষ্কারের মধ্য দিয়ে অনেকেই রাজা ও রাজকীয় কাজকর্মের সমালোচনা শুরু করে দেয়। ফলে সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়েও কথা উঠতে থাকে।

সাংবাদিকতার সঙ্গে সৎ সমালোচনার প্রসঙ্গটি এসেই যায়। কিন্তু ১৭৮০ সালের দিকে কলকাতায় যখন জেমস অগাস্টাস হিকি পত্রিকা বের করে ফেললেন তখন তাঁর উপজীব্য বিষয়ই ছিল কঠোর ব্যক্তি সমালোচনা, কদর্য ও অশালীন কথাবার্তা এবং কিছু ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন। সেগুলোকেই তৎকালীন সময়ের আঙ্গিকে সাংবাদিকতা বলা যেতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হিকির সমালোচনামুখর সেই কথাবার্তাকে আর যাই হোক নিখাদ গোয়েন্দাবৃত্তি বলা চলে না, সে ছিল অন্তত আমাদের দেশে সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ। তার মানদণ্ড যাই থাক না কেন। বিভিন্ন গালগল্প, কেলেংকারি, রটনা, গুজব প্রভৃতি বিষয়ে লিখতে শুরু করায় হিকি কোম্পানির কোপানলে পড়েন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ একদিন তাকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য করে। কিন্তু হিকিই প্রকৃতপক্ষে এ উপমহাদেশে চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা বলে গিয়েছিলেন যা সাংবাদিকতার অভীষ্ট লক্ষ্য।

হিকির পথ ধরেই কলকাতায় সে সময় অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৮১৮ সাল থেকে শুরু করে ১৮৩৫ সালের মধ্যে কলকাতায় অসংখ্য পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য এ সময়টাকে সাংবাদিকতায় ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা চলে।

অ্যাডভোকেসি জার্নালিজম

কলকাতাভিত্তিক ভারতবর্ষে যখন সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটছে তখন সমাজের পালে নতুন হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। হিকির সময় থেকে শুরু করে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কেবল ভারতবাসী ইংরেজদের কথাই বেশি লেখা হতো।

কিন্তু ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের মালিকানাধীন প্রথম ভারতীয় পত্রিকা 'বাঙ্গাল গেজেট' প্রকাশিত হবার পর থেকেই ভারতীয়রা নিবিরভাবে ও সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করতে থাকে। সংবাদপত্রে তখন ভারতীয় বিষয়সমূহ তার নিজস্ব আসন পাকাপোক্ত করে নেয়। সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ততদিনে শুরু হয়ে গেছে এবং ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলো তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে শুরু করেছে।

ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারও ঘটতে শুরু করেছে ততদিনে। ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার জন্য কলকাতাভিত্তিক মূল হিন্দু বাঙালি সমাজ ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করতে শুরু করেছে। সে সময়ই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের বীজ রোপিত হয়। সংবাদপত্রগুলো যেহেতু এই দুটো বিষয় নিয়ে ভূমিকা নিতে শুরু করেছে ফলে চারপাশে তখন তর্কবিতর্কও উত্তপ্ত ঝড় বইতে শুরু করে। এ রকমই একটি টালমাটাল ও ঝড়ো পরিবেশের মধ্যে রাজা রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন সংবাদপত্র জগতে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করলো। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে কাটিয়ে বুর্জোয়াবোধের সৃষ্টি করেন রাজা রামমোহন রায়। যদিও তিনি পুরো সমাজকে ভাঙতে চাননি বা পারেননি। তাঁর সংস্কার ছিল সত্যিকারে সমাজের উপর কাঠামোর সংস্কার। তবু তাঁর সেই সংস্কার আন্দোলনেই রক্ষণশীলদের ভিতে কাঁপন লাগে। ফলে সংরক্ষণশীলতার পক্ষে-বিপক্ষে সংবাদপত্রগুলো হয়ে ওঠে শক্তিশালী একেকটি হাতিয়ার। রাজা রামমোহন রায় তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার জন্য নিজেই একটি সংবাদপত্র বের করার চিন্তাভাবনা করেন। তাঁর সেই চিন্তাভাবনারই ফসল হলো ১৮২১ সালে তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকাখানি।

সংরক্ষণশীল ও সংস্কারবাদীদের মধ্যে বিতর্কের ফলেই কিন্তু সে আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজদের উদ্যোগে এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার। পাশাপাশি হিন্দু সংরক্ষণশীলতার জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও ইংরেজি শিক্ষাবিস্তার ও প্রগতিবাদী ধারার বিকাশে কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারেননি সংরক্ষণবাদীরা। বিশেষ করে নবীন প্রজন্ম নতুন উদার নৈতিক ব্যবস্থাকে দু'হাত দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল। যাকে বলা হয় বাংলার নব জাগরণের যুগ-সেই যুগে উদার ও সংস্কারপন্থীদের ঠেকাতে সংরক্ষণবাদীরা শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। সংবাদপত্র আধুনিকতার যে একটি বড় হাতিয়ার তা কিন্তু তাঁরা তাঁদের অগোচরেই লুফে নিয়েছিল। এরকম একটি পত্রিকা ছিল ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের

'সমাচার চন্দ্রিকা'। সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা ছিল সংস্কার ও সংরক্ষণশীলতার দুই শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত সংস্কারপন্থীদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয় সংরক্ষণবাদীরা। রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনের মুখে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথার মতো অনৈতিক প্রথা বন্ধ করে দেন। এই সমাজ সংস্কারকদের আন্দোলনের মুখেই তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ভেঙে যায় এবং তার জায়গায় বুর্জোয়া চিন্তাধারা শিকড় গাড়তে শুরু করে, আর এর সবটাই প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের দান। এই সংস্কার আন্দোলনকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার বিষয়টিই হচ্ছে অ্যাডভোকেসি বা ওকালতি সাংবাদিকতার স্বরূপ।

অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা হচ্ছে প্রচারধর্মী সাংবাদিকতা। তবে তা কোনমতেই প্রচারধর্মী নয়। প্রচারণায় যেমন সত্যমিথ্যা সবই থাকে। সূত্র সম্পর্কেও একটা সংশয় থাকে। কিন্তু প্রচারধর্মী সাংবাদিকরা সমাজের কোন সংস্কারযোগ্য মূল বিচার্য বিষয় বা ইস্যুকে খোলাখুলি সমর্থন করেন এবং তার সমর্থনে ব্যাপক ও জোরালো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। সমাজের স্বার্থ ও মঙ্গল যেখানে নিহিত সে বিষয়ে জনসমর্থন গড়ে তোলাই এ ধরনের সাংবাদিকতার মূল দায়িত্ব। এ ধরনের সাংবাদিকতায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা বস্তুনিষ্ঠতা মানেন না। কারণ তাঁদের নিরপেক্ষতার নীতি নিয়ে বসে থাকলে সমাজের কল্যাণ হয় না। অসচেতন জনসাধারণ সমাজের জন্য হিতকর বিষয় সম্পর্কেও সংশয় ও বিভ্রান্তির ঘেরাটোপে আটকা পড়ে থাকেন। তাঁদের পথ দেখাতে, তাঁদের হয়ে সাংবাদিককে কথা বলতেই হয়। অর্থাৎ একটা পক্ষ নিয়েই তাঁদের কথা বলতে হয়। তবে তথ্যের ক্ষেত্রে তাঁরা কখনই মিথ্যাচার করেন না। ভুল বা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেন না।

আমাদের এ আলোচনা থেকেই বুঝতে পেরেছি যে এই প্রচারধর্মী সাংবাদিকতা দিয়েই ভারতে সংবাদপত্রের শুরু। অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়াতে। অপরদিকে আমেরিকাতেও একই সময়ে প্রচারধর্মী সাংবাদিকতার শুরু হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের শক্তির সপক্ষে বেশ কিছু পত্রপত্রিকা রীতিমতো সংবাদবিবরণী ও সংবাদভাষ্য প্রকাশ করে যাচ্ছে। এ হচ্ছে অ্যাডভোকেসি জার্নালিজমের স্বরূপ।

নব্য সাংবাদিকতা

এই প্রচারধর্মী সাংবাদিকতার কাছাকাছি আরেকটি রূপ হচ্ছে নব্য সাংবাদিকতা বা নিউ জার্নালিজম (New journalism)। এই মতের প্রবক্তারা বস্তুনিষ্ঠতা বা বিষয়

নিরপেক্ষতাকে সংবাদ রচনার জন্য আবশ্যক শর্ত বলে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। ১৯৬০-এর দশকে মার্কিনী সমাজের অস্থিরতা ও সামাজিক আন্দোলন সনাতনী বৃত্তকে ভাঙার জন্য কিছু তরুণ সাংবাদিককে প্রভাবিত করেছিল। সে সময়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মতো পরিস্থিতি দেখা দেয় তার প্রভাব পরবর্তীকালে সমস্ত তরুণ মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মার্কিনী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা যে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তার যে আমূল পরিবর্তন দরকার এই চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত হন তৎকালীন যুবসমাজ। তাঁদের অনেকেই সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ও ব্রত নিয়ে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং তাতে এক নয়া মাত্রা যুক্ত করেন। এঁরা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাংবাদিকতার বিষয় ও ধরন উভয় ক্ষেত্রে একটা বিকল্প পদ্ধতি প্রত্যাশা করেছিল। দৃষ্টিভঙ্গির সাংবাদিকতা (Point of view) বলে অভিহিত এই মনোভঙ্গিটি মূলত 'বিকল্প ও আন্ডারগ্রাউন্ড' সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে উদ্ভব হয়েছিল। এটা ছিল সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ও সংস্কারমূলক।

এই নয়া ধারার সাংবাদিকতার প্রাণ ও চেতনা ছিলেন টম উলফ। অন্যদের মধ্যে ছিলেন গে টেলেসি, নরমান মেইলার, ট্রুম্যান ক্রফোর্ড, পিট হ্যাসলিন, জিমি ব্রেসলিন, নিকোলাস মিলস, রিচার্ড গোল্ডেনস্টাইল প্রমুখ। এই ধারার সাংবাদিকতার প্রতিভূ রিপোর্টার ও সম্পাদকরা সংবাদবিবরণীতে তাঁদের নিজেদের মতামত প্রবিষ্ট করতেন। বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং থেকে সম্পাদকীয় মন্তব্যকে আলাদা করার ক্ষেত্রে এঁরা কোন ভনিতা করেনি। এ ধরনের সাংবাদিকতায় সাংবাদিকরা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ভিত্তিক রিপোর্ট করে থাকেন এবং সংবাদ বিশেষজ্ঞরা তাঁদের বিশেষ জ্ঞান ও মর্যাদায় সেই রিপোর্টের মূল্যায়ন করে থাকেন।

এই ধরনের সাংবাদিকতার রিপোর্টাররা সংবাদপত্রের রিপোর্ট উপন্যাসের ঢঙে লিখে থাকেন। রিপোর্টে ঘটনার ঘনঘটা ও খুঁটিনাটি সব চিত্রই থাকে। এ ধরনের প্রতিবেদন হয় সাধারণ দীর্ঘ ও মন্ময়ধর্মী (subjective)। এ ধরনের রিপোর্টে সাংবাদিক কোন বিষয়কে দেখেন মন্ময়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে (Subjective way)।

নব্য সাংবাদিক ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তিনি শুধু দেখেন না, যা দেখেন তার ওপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন তবে সেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে উপন্যাসের মতো ভাষার মাধুরী মিশ্রিত।

যেসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার এই নয়া মতাদর্শ নিয়ে কাজ করেছে সেগুলোর মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিল নিউইয়র্কের 'ভিলেজ ভয়েস' এবং সানফ্রান্সিসকোর 'বে গার্ডিয়ান'।

অবশ্য নিউইয়র্ক টাইমস, সেন্ট লুই ডেসপ্যাচ, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর প্রভৃতি সংবাদপত্রও নব্য সাংবাদিকতার ধরন-ধারণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে।

ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বর্ণবৈষম্য, দুই কেনেডি হত্যা, মার্কিন লুথার কিং হত্যা, ছাত্রবিদ্রোহ, চন্দ্র বিজয়, দরিদ্র ও অবহেলিতদের হতাশা, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি সমসাময়িক অনেক বিষয় নিয়ে নব্য সাংবাদিকরা অসংখ্য রিপোর্ট করেছেন। এঁরা সমাজের সব শ্রেণীর মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। সমাজের অবিকল চেহারাটাকে তুলে ধরেছে। এঁরা সমাজ পরিবর্তনের কাজ করে, এঁরা পয়সার বিনিময়ে স্বার্থবাদী কাজ করে না। এঁদের কাজ জীবনের একেবারে গভীরে প্রোথিত।

তবে এই ধারার সাংবাদিকতার যাঁরা বিরোধী তাঁরা একে বিনোদনমূলক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, এ যেন সারকথার চেয়েও স্টাইলভিত্তিক এবং প্রায়শই বাস্তবের চেয়ে কল্পভিত্তিক। নব্য সাংবাদিকতার সমালোচকদের প্রবক্তা ডোয়াইট ম্যাকডোনাল্ড (Dwight Mcdonald) বলেছেন, নব্য সাংবাদিকতা হলো Para journalism অর্থাৎ সমান্তরাল সাংবাদিকতা। ম্যাকডোনাল্ডের মতে, এ হলো সাংবাদিকতার জারজ রূপ (Bastard form)। এঁরা বাস্তব জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রের কল্পিত রূপ প্রদর্শন করে। সাংবাদিকতার তথ্যের ওপর নির্ভর করে ওঁরা উপন্যাসের কল্পনার অবাধ সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন।

হলুদ সাংবাদিকতা

সংবাদপত্রে এক ধরনের সাংবাদিকতা নিয়ে প্রায়শই বলাবলি হয়ে থাকে, বিশেষ করে তা করে থাকে সরকার। সরকার বিরোধী অনেক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশিত হলেই তারা হায় হায় করে বলে থাকে, ওঁরা হলুদ সাংবাদিকতা বা ইয়েলো জার্নালিজম (Yellow journalism) করছে।

নিন্দার্থেই প্রধানত হলুদ সাংবাদিকতা কথাটি ব্যবহৃত হয়। সাংবাদিকতায় অকারণ চমক সৃষ্টি, মহা হই চই ফেলে দেয়া এবং অলীক ও ভিত্তিহীন খবর প্রকাশ করাকে লোকে ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা বলে। তবে যে ঘটনার সূত্র ধরে হলুদ সাংবাদিকতার শুরু তার সঙ্গে চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতার বেশ পার্থক্য রয়েছে। তবে যৌনতা, সহিংসতা, কেলেংকারি, অপরাধ প্রভৃতির মতো মহাচাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর পরিবেশনের সাংবাদিকতাই আজ হলুদ সাংবাদিকতা বলে পরিচিতি পেয়ে গেছে বা যাচ্ছে। তবে দুটো কোনমতেই সমার্থক নয়।

ইয়েলো সাংবাদিকতার জন্ম দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ও সংবাদপত্র জগতের দুই মহান পথিকৃৎ উইলিয়াম র‍্যাঁডলফ্ হার্স্ট ও জোসেফ পুলিৎজার। অপরদিকে বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি সংবাদপত্রের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফসল হলো এই ইয়েলো সাংবাদিকতা। পত্রিকা দুটির একটি হলো নিউইয়র্ক জার্নাল ও অপরটি নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড। হার্স্ট ও পুলিৎজার প্রথমে একে অপরের সাংবাদিক-কর্মচারীদের বেশি পয়সা দিয়ে কিনে নেয়ার এক বাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। তারপর তাঁরা চাঞ্চল্যকর খবরাখবরের প্রতিযোগিতা শুরু করেন। তাঁদের ওই চাঞ্চল্যকর খবরাখবর বা স্ক্যান্ডাল কাহিনী রুচির সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

তবে তাঁদের দুটি পত্রিকাতেই Yellow kid নামে একটি কার্টুন প্রকাশিত হতো এবং সেই থেকেই ইয়েলো জার্নালিজমের প্রচলন। এর একটা ইতিহাস আছে। পুলিৎজারের ওয়ার্ল্ড পত্রিকা সে সময় ৮ পৃষ্ঠার একটি কমিক সংখ্যা বের করতো। এর চার পৃষ্ঠা ছিল রঙিন। দেখাদেখি হার্স্ট তার জার্নালে একই পথ অবলম্বন করেন। একপর্যায়ে তিনি পুরো ৮ পৃষ্ঠাই রঙিন করে প্রকাশ করতে শুরু করেন।

যে কমিক নিয়ে এত হই চই তাঁর স্রষ্টা ছিলেন রিচার্ড এফ. আউটকল্ট। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের নাম হচ্ছে ইয়েলো কিড। কমিকে অনেক শিশুরই ছবি থাকতো। তবে মাঝের শিশুটির ছবি সম্পূর্ণ হলুদ রঙে ছাপা হতো বলে তাকে 'ইয়েলো কিড' নামে ডাকা হতো।

হার্স্ট যখন ওয়ার্ল্ড পত্রিকার লোকজন ভাগিয়ে 'জার্নালে' নিয়ে আসেন তখন সেই কমিক কার্টুন শিল্পী আউটকল্টও চলে আসেন এবং জার্নাল পত্রিকাতেও যথারীতি ইয়েলো কিডের ছবি আঁকতে থাকেন। অন্যদিকে ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় কিডের ছবি আঁকার দায়িত্ব পান জর্জ বি. লাক। এই কিডকে নিয়ে মহা হই চই পড়ে গেলো। দুটি পত্রিকারই প্রচার বেড়ে গেলো দারুণভাবে। আর 'সান' পত্রিকার সাংবাদিক ডানা'র কল্যাণে 'হলুদ সাংবাদিকতা' এই কথাটিরও প্রচলন হয়ে গেলো।

প্রকৃতপক্ষে হার্স্ট ও পুলিৎজার বিশেষত হার্স্ট চাঞ্চল্যকে প্রাধান্য দিয়ে পত্রিকার কাটতি বাড়াতে চেয়েছিলেন। চাঞ্চল্য ও রেষারেষি শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে হীন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও সহিংসতায় পর্যবসিত হয়েছিল। দুই পক্ষই একে অপরকে শায়েস্তা করবার জন্য ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়োগ করে খুনোখুনিতে পর্যন্ত লিপ্ত হন।

হার্স্টের চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতার প্ররোচনাতেই উনিশ শতকের শেষভাগে আমেরিকা স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। ১৮৯৬ সালে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ

মেইন (Maine) হাভানার কাছে ভেঙে পড়ে। কিন্তু হার্স্ট তাঁর কাগজে এ জন্য স্পেনকে দায়ী করে সংবাদ ছাপেন। এর ফলে আমেরিকা স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যে কোন যুদ্ধ হলেই যে কোন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বেড়ে যায় বিশেষ করে চাঞ্চল্যবাদী পত্রিকাগুলোর কাটতি। সেই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তখন হার্স্ট ও পুলিৎজারের কাগজের প্রচার সংখ্যা বেড়ে ১৭ লাখে দাঁড়িয়েছিল।

বিদেশে সাংবাদিকতার ন্যায়নিষ্ঠতা বেশি থাকলেও সেখানে চাঞ্চল্যবাদী সাংবাদিকতাও অনেক বেশি। তবে আমাদের দেশেও চাঞ্চল্যবাদী সাংবাদিকতাও চলে। তবে তা বিশেষ করে চলে সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকাগুলোতে এবং কিছু বেনামি অনামি সাময়িক পত্রপত্রিকায়। দৈনিক পত্রপত্রিকায় এটা খুব কম। অবশ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতনের পর এ দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী অনেক কল্পকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। যেমন করে হয়েছে শারমিন রীমা হত্যাকাণ্ড এবং রীমার ঘাতক মুনিরের প্রাণদণ্ড কার্যকর করার আগের শেষ দিনগুলো নিয়ে। তথ্যদান ও সত্য কথা বলার আড়ালে ধাপ্পাবাজি করে পত্রিকার বাজার দখল করাই ছিল ওইসব পত্রপত্রিকার আসল উদ্দেশ্য।

হলুদ সাংবাদিকতার কাছাকাছিই হলো পপুলার সাংবাদিকতা। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই অধিকাংশ মানুষই চটুল, হালকা, সুখপাঠ্য, বিনোদনমূলক ও হৃদয়গ্রাহী লেখালেখি পছন্দ করেন। যেমন একটি বিষয় উল্লেখ্য, তরুণেরা খেলাধুলার সংবাদ বেশি করে পড়ে। আবার তরুণীরা কিন্তু সিনেমা, নাটক, শোবিজ প্রোগ্রাম ইত্যাদি বেশি করে পড়ে থাকে। আবার খেলাধুলা বিশেষ করে ক্রিকেটের সঙ্গে প্রমোদশিল্পের মতো গ্লামার যুক্ত হওয়ায় সে সংক্রান্ত খবরেও তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ অনেক বেশি। এই সব বিষয় নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতো কাগজগুলোই বলা যায় পপুলার কাগজ আর এ ধরনের সাংবাদিকতার নাম পপুলার সাংবাদিকতা।

জাপান ও বৃটেনের পপুলার সংবাদপত্রগুলো পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। বৃটেনের 'সান' পত্রিকার নাম তো আমরা প্রায়শই শুনতে পেয়েছি সে দেশের দুই প্রিন্সেস প্রয়াত লেডি ডায়না ও লেডি সারা ফার্গুসনের বিবাহ, প্রেম, যৌনতা, পারিবারিক সংকটের ওপর হাজারো খবরের কল্যাণে। আমাদের দেশে 'চিত্রবাংলা' তো পপুলার সংবাদপত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইংল্যান্ডের সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত দুটি সংবাদপত্র পপুলার সংবাদপত্র। এর একটি 'ডেইলি মিরর'। পপুলার সাংবাদিকতার ধরন এমনকি তার কাগজের সাইজও আলাদা হয়। এতে ছবির পরিমাণ বেশি থাকে, টাইপগুলো বড় বড় হয়। চাঞ্চল্যকর খবর, রগরগে কাহিনী ও যৌনতার সুড়সুড়ি থাকে। এ ধরনের

পত্রিকার সাইজ সাধারণ পত্রিকার অর্ধেক অর্থাৎ ট্যাবলয়েড সাইজ হয়। আমাদের দেশেও ইতোমধ্যে ট্যাবলয়েড পত্রিকা এসে গেছে।

পপুলার সংবাদপত্র শুদ্ধার্থে রুচিসম্মত না হলেও তার চাহিদা সমাজে ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে পপুলার সংবাদপত্র সামাজিক বিবর্তনেরই ফসল। আধুনিক তথ্য বিজ্ঞাপনী সমাজে (Advertising society) বিজ্ঞাপন শিল্পের কল্যাণে পণ্যসামগ্রী নির্মাতাদের পণ্যের খবর অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই পপুলার সংবাদপত্রের সৃষ্টি। অর্থাৎ কতো বেশি সংখ্যায় জনগণের হাতে চটুল সুখপাঠ্য সংবাদপত্র পৌঁছে দেয়া যায়।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতা যতভাবে বা যত ধরনেরই হোক না কেন বস্তুনিষ্ঠতার কথা সবসময়েই উচ্চারিত হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে এর আগে অন্য অধ্যায়েই সামান্য আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আরো কিছু উল্লেখ করবো। সাংবাদিকতার ধরন নিয়ে যুগে যুগেই অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে, অনেক কথা উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন শাসকরা সাংবাদিকের সমালোচনাকে ন্যায়নিষ্ঠতার সীমারেখায় বেঁধে রাখার পরামর্শ দেন। বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার কথা বলেন। বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে অবশ্য অনেক পণ্ডিতই অনেক কথা বলেছেন। অনেকেই বলেছেন, সাংবাদিকের কাজ কোন ঘটনার রিপোর্ট করা, গোয়েন্দাবৃত্তি নয়। আপনি আপনার ঘটনার বিবরণ দিয়ে যান। সত্যমিথ্যা যাচাই করার ভার পাঠকের। যত খুশি মন্তব্য করা যায়। কিন্তু সাংবাদিক পত্রিকার পাতায় তাঁর প্রতিফলন ঘটান না। তিনি ঘটনার বিবরণী দিয়ে যাবেন মাত্র। সত্যানুসন্ধান তাঁর কাজ নয়, ঘটনার রিপোর্ট করাই তাঁর মূল কাজ। অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে তার হুবহু বিবরণ তুলে ধরার নামই বস্তুনিষ্ঠতা। কোন ঘটনায় হয়তো পক্ষ-বিপক্ষ থাকে। একাধিকজন সংশ্লিষ্ট থাকেন। তাঁদের সবাই সত্য বলেছেন তার ঠিক নেই কিংবা তাঁদের সবার অভিযোগই যে সত্য তাও নয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিকের উচিত পক্ষ-বিপক্ষ বা সংশ্লিষ্টজনের অভিমত অভিযোগ বা বক্তব্য তুলে ধরা। তিনি তাঁদের কথাবার্তার সূত্র ধরে নিজের হাতে তাঁদের ভালোমন্দের বিচার করতে যান না। সংশ্লিষ্টজনের কথাবার্তাতেই সত্যমিথ্যা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

সাংবাদিকতা বিষয়ক আচরণবিধিতে সাধারণত একটি সর্বজনস্বীকৃত নীতি হচ্ছে সংবাদ বিবরণী বা ভাষ্যে পক্ষপাতিত্বকে অবশ্যই এই পেশার মৌলিক নীতির জন্য ধ্বংসাত্মক বলে বিবেচনা করতে হবে। তবে বস্তুনিষ্ঠতার বিরোধী যাঁরা, তাঁরা মনে করেন যে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে গিয়ে কোন সংবাদ ঘটনার সঠিক ও সত্যকার চিত্র ফুটে ওঠে

না, তীব্র জটিলতাপূর্ণ এই জীবনে সাধারণত চোখে দেখা ঘটনাই হয়তো কোন ঘটনার সত্যিকার চিত্র নয়। সে ঘটনার পিছনে আরো ঘটনা রয়েছে। সে ঘটনাকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে গেলে রিপোর্টারকে অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে। সত্যানুসন্ধান করতে হবে। আর সেরকমটা হলে কোন ঘটনার সাদামাটা রিপোর্ট করলে চলে না।

যদিও ঘটনা যেভাবে ঘটেছে সেভাবে রিপোর্ট প্রস্তুত করাই হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট। তারপরেও একজন ভালো সংবাদসেবী তাঁর রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট পটভূমি (background) সন্নিবেশিত করেন। প্রয়োজনীয় ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য যদি দেয়া না হয় তাহলে তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠতা পাঠকের বিভ্রান্তি বাড়ানো ছাড়া আর কিছু করে না। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে। তবে তার তথ্যগত ও পরিবেশগত পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। কোন ঘটনা তলিয়ে দেখে যে অন্তর্নিহিত তথ্যটি পেলাম তার যদি সমর্থনযোগ্য ভিত্তি থাকে তবে তা তুলে ধরাও বস্তুনিষ্ঠতা।

ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতা

সমাজ এখন অনেকটাই এগিয়েছে। মানুষের জীবনধারা যতটা উন্নত হয়েছে, সমাজ জীবনে জটিলতাও ততো বেড়েছে। যুগযন্ত্রণাও বেড়েছে আধুনিকতার পাশাপাশি। মানুষ এখন আর কোন কিছু সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যে খুশি নয়, তাঁরা কোন ঘটনাকে তলিয়ে দেখতে চায়। তাঁর মনে সবসময়ই এটা প্রশ্ন জাগে কেন এটা হলো, কেমন করে হলো, না ঘটলে কী হতো, ঘটনার পরিণাম কী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁরা সংঘটিত কোন ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চান। আধুনিক সাংবাদিকতায় এই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ শুধু বর্তমানের নয়, এ ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতারও স্বরূপ।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় কখনই ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা থাকে না। ভেতরের অনেক কথা পাওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ কোন দিকনির্দেশনাও থাকে না। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং হলো সাদা চোখের রিপোর্টিং। কিন্তু ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতায় সমাজে কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি হলো কিংবা ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ওপর কি প্রতিক্রিয়া পড়লো তা নিয়ে রিপোর্টার ব্যাখ্যা করে থাকেন। কোন ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনার বিষয়ে তা নিয়ে রিপোর্টার ব্যাখ্যা করে থাকেন। কোন ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনার বিষয়ে পাঠকের মনে সম্ভাব্য যেসব প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে তার সবগুলোর উত্তর তিনি দিয়ে থাকেন। তিনি পাঠকের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকলেও তা দূরীভূত করেন। কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন ঘটনা একটি বিশাল

ঘটনাপ্রবাহের খণ্ডাংশ মাত্র। এর একটি সুদূরপ্রসারী পরিণাম থাকে। ফলে রিপোর্টারকে এ বিষয়ে একটি স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা দিতে হয়।

ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার জন্ম প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই। সেসময় যুদ্ধের পটভূমি বর্ণনাকালে যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা না দেয়ায় উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেনার্ড ব্রাউন এসোসিয়েটেড প্রেস বা এপিকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। ঘটনাটি নিয়ে সমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা গেলো বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থা বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে এমন সব বিশেষজ্ঞকে রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ করছেন যাঁরা ঘটনার একটি সাধারণ রিপোর্ট করার পাশাপাশি ঘটনার উপযুক্ত ভাষ্যও পাঠাচ্ছেন।

সেই থেকে শুরু ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার। তবে এতে করে যে বস্তুনিষ্ঠতার অবসান হয়েছে তা নয়। রিপোর্টার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রের মুখ দিয়েই এমন কথাবার্তা বের করে আনেন যাতে ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণটি বেরিয়ে পড়ে। রিপোর্টার সরল সাদা রিপোর্ট করেন না, আবার নিজে মন্তব্যের আশ্রয়ে না গিয়ে সূত্রসমূহের মুখ দিয়েই ঘটনার মেজাজ বা দৃষ্টিকোণটাকে তুলে ধরতে পারেন। এতে করে রিপোর্টার ঘটনাটি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ করতে পারেন কিংবা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোষী বা দায়ী ব্যক্তিদেরও চিহ্নিত করে ফেলতে পারেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যার জন্ম তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তখন দেখা গেলো ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের প্রাচুর্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গোটা দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সমগ্র বিশ্বসমাজের চেহারাটাই যায় পাল্টে। সেই পরিবর্তনের সময়টাতে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নয়া দিগন্তের উন্মোচন হয়। সাংবাদিকতায় বিষয় ও প্রকরণের ক্ষেত্রে সূচিত হয় পরিবর্তন। জীবনের জটিলতা বাড়ার ফলে মানুষের যেমন জীবনাচরণেও একটা ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হলো, তেমনি ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতার কল্যাণে মানুষ যখন দ্রুত কোন ঘটনার প্রাথমিক তথ্য পেয়ে যেতে থাকলো, তখন সামাজিক দায় ও অস্তিত্বের কারণেই সংবাদপত্রগুলোকে ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার আশ্রয় নিতেই হলো। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে গতি থাকার কারণে তাতে অনেক সময় অর্ধমনোসংযোগী শ্রোতা (Half-way listener) ভালোমত মনোসংযোগ করতে পারে না। স্বভাবতই পাঠকসমাজ সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করে। কোন নির্বাচনের ফলাফল ও ভাষ্য হয়তো কোন শ্রোতা রেডিও-টিভিতে পেয়ে যায় তারপরও সে পরেরদিন পত্রিকার পাতা খুঁটিয়ে পড়ে যদি ভিতরের কিছু খবর পাওয়া যায়। পাঠকের দিক থেকে এই আগ্রহ ও দাবির কারণেই ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতা

অপরিহার্য। বর্তমান যুগের সমালোচনামুখর পাঠককে আর অন্ধকারে রাখার উপায় নেই। আর তাই পাঠক সমাজে বিশ্বাসযোগ্যতা ও পত্রিকার পঠনযোগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থেই ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতায় ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতা এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন হলো প্রকৃতপক্ষে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং। যার ইংরেজি পরিভাষা ডেপথ্ রিপোর্টিং। ডেপথ্ রিপোর্টিংয়ের একটি হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং। আবার অনুসন্ধানী বা তদন্তমূলক রিপোর্টিংও হচ্ছে ডেপথ রিপোর্টিংয়ের আরেকটি শাখা।

প্রতিদিন অজস্র ঘটনা দুর্ঘটনার রুটিন মফিক কভারেজ করতে গিয়ে এমন সবকিছু নজরে আসে কিংবা প্রশ্নের উদ্রেক সৃষ্টি করে যে, মনে হয় যেন তার পিছনে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। সাধারণত অপরাধ, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, নৈতিক স্খলন, যৌনতা, কেলেংকারি প্রভৃতি নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হয়ে থাকে। এই সব ঘটনার ওপরের চেহারাটা তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় এর ভেতরের ব্যাপ্তি বিশাল। সেই বিশালত্বের দিকে যতই এগুনো যায় ততই অপরাধ, দুর্নীতি, অনিয়ম বা শৈথিল্যের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে তথ্যাবলী লুকানো ছিল, রহস্যাবৃত ছিল কিংবা যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে অনুসন্ধান করে বের করে আনার দায়িত্ব অনুসন্ধানী সাংবাদিকের। অপরাধ যারা করে তারা সমাজ বিরোধী, আর তাই তারা অপরাধকে গোপন করার চেষ্টা করে, বেআইনি কার্যকলাপকে বিভিন্নভাবে আড়াল করার চেষ্টা করে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে সেইসব গোপন তথ্য বের করে রহস্য উন্মোচনের একটি চমৎকার লক্ষ্যভেদী হাতিয়ার।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকে গবেষণাধর্মী রিপোর্টিংও বলে। কারণ এধরনের রিপোর্টিং হয় পদ্ধতিগত অনুসন্ধান মাফিক ও দীর্ঘ সময়প্রসারী। অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য বের করে আনার জন্য একজন সাংবাদিককে প্রায়শই দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্ন বই, নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, পত্রিকা ঘাঁটাঘাটি ও পড়াশুনা করতে হয়, পাশাপাশি তাকে ফিল্ডে গিয়ে বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, সাক্ষাৎকার নিতে হয়। দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়ার পরই রিপোর্টার তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফলটি পেয়ে যান। তাঁর প্রাপ্ত ফলাফলটিই (Last findings) হলো কোন একটা সংবাদবিবরণীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা সার।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা

বিশ্বজুড়ে এখন শুধু উন্নয়নের কথা। এ উন্নয়ন যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তেমনি তা মানবেরও উন্নয়ন। এই উন্নয়নের কথা জোরেশোরে শোনা যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। আর এই উন্নয়ন কোথায় ও কিভাবে হচ্ছে সেটাই হলো মূল প্রশ্ন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সাংবাদিকতা কী তা বোঝা দরকার।

উন্নয়নের মানেই হলো পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সমাজের প্রতিটি স্তরে। এই পরিবর্তন মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে। পুরো অর্থে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের ওপরই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। মানবের উন্নয়ন করতে গিয়ে কিছুটা প্রচারধর্মী এবং কিছুটা অনুসন্ধানধর্মী যে সাংবাদিকতার সূচনা তারই নাম উন্নয়ন সাংবাদিকতা। এটাকে উন্নয়ন যোগাযোগও বলা হয়। যার বড় তিনটি উপাদান হলো, উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি, যোগাযোগ ও রূপায়ণ। সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি যদি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য অনুকূল ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তাকে সমর্থন দেয়া এবং সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই এই ধরনের সাংবাদিকতার কাজ। আর একে আশ্রয় করেই যে সাংবাদিকতা তাকেই বলে উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

ফিলিপাইনভিত্তিক উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রধান ক্ষেত্র ছিল কৃষি ও ধান উৎপাদন। তবে এখন তা কৃষি ও ধান উৎপাদন ছাড়াও পরিবেশ, জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, সাক্ষরতা কর্মসূচি, শিক্ষা বিস্তার, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ও শিল্পের ক্ষেত্রেও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

মন্ময় সাংবাদিকতা

আমরা এতক্ষণ অনেক ধরনের সাংবাদিকতার কথা বললাম। এই সব ধরনের সাংবাদিকতা একটা চূড়ান্ত পরিণতি বর্তমান সাংবাদিকতায় পরিলক্ষিত হচ্ছে যাকে মন্ময় সাংবাদিকতা বলা যায়। এ সাংবাদিকতা বিষয়ভিত্তিক নয় বরং যে কোন বিষয়ের ওপর স্টাইলভিত্তিক। নব্য সাংবাদিকতার কথা আমরা আগে যা উল্লেখ করেছি, মন্ময় সাংবাদিকতাও হচ্ছে তারই একই ধরন। তবে এ ধরনের সাংবাদিকতা মূলত মন্তব্যাশ্রয়ী। আজকের অনেক পাঠক নৈর্ব্যক্তিক বিবরণী পড়তে চান না। তিনি সংবাদ লেখকের মুখ দিয়েই যেন সংবাদটি শুনতে চান। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ প্রচুর পত্রপত্রিকা। এদের অনেকেই মন্ময় (Subjective) স্টাইলের প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে। পাঠক এ ধরনের রিপোর্টিং উপভোগও করছে।

সাংবাদিকতার পরিভাষা

এড (Ad) — ইংরেজি Advertisement (বিজ্ঞাপন)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এড। সোজা কথায় বিজ্ঞাপন।

এড (Add) — কোন মূল সংবাদের সঙ্গে বাড়তি কোন অংশ সংযুক্ত করার জন্য কম্পোজিটর (Compositor) বা কম্পিউটার অপারেটরদের (Operator) প্রতি নির্দেশকে এড (Add) বলে।

এডভান্স (Advance) — ভবিষ্যতে কোন বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। সে সংক্রান্ত আগাম রিপোর্ট। কোন অবহেলার কারণে কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা নিয়ে আগাম রিপোর্ট তৈরি হতে পারে।

অ্যাঙ্গল (Angle) — কোন সংবাদ কাহিনীর দিকসমূহ। কোন সংবাদ ঘটনার অনেকগুলো দিক থাকে। রিপোর্টার তাঁর পত্রিকা সংগঠনের পলিসি অনুসারে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নিয়েই সাধারণত রিপোর্ট করে থাকে।

অ্যাসাইনমেন্ট (Assignment) — পত্রিকার রিপোর্টারদের জন্য প্রদত্ত নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বকে অ্যাসাইনমেন্ট বলে। যেমন, একজনকে নির্বাচনী খবর সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশনে যেতে বলা হলো।

ব্যাংক (Bank) — কোন শিরোনামের নিচের ভাগকে ব্যাংক বলে। অর্থাৎ শিরোনামের দুটো অংশ থাকলেই কেবল নিচের অংশটি ব্যাংক বলে অভিহিত হয়।

ব্যানার (Banner) — সারা পৃষ্ঠা জুড়ে অর্থাৎ প্রথম কলাম থেকে শুরু করে অষ্টম কলাম পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা হরফে সজ্জিত শিরোনামকে ব্যানার বলে। ব্যানার অবশ্য ছয় কলামেও হয়। ব্যানারকে বাংলায় ফলাও শিরোনাম বলে।

বিট (Beat) — একজন রিপোর্টার যখন কোন সুনির্দিষ্ট এলাকা বা বিষয়ের ওপর সংবাদ সংগ্রহ করেন তাকে বিট বলে। এটা রিপোর্টারদের অ্যাসাইনমেন্টের একটি অংশ।

এছাড়া প্রতিপক্ষ সংবাদপত্রের আগেই কোন সংবাদ ঘটনা সংগ্রহ করাকেও বিট বলে।

ব্ল্যাংকেট (Blanket) — মুদ্রণযন্ত্রের একটি অংশের নাম ব্ল্যাংকেট। এটি হচ্ছে কোন প্রাকৃতিক বা সিনথেটিক রাবারের তৈরি একটি শিট যা মুদ্রণযন্ত্রের একটি সিলিন্ডারের চারপাশে মোড়ানো থাকে। মুদ্রণযন্ত্র চালু করলেই তেল-পানি মাখানো লেখা ও ছবির প্লেট মোড়ানো সিলিন্ডারটি একটি ঘুরপাক খেলেই লেখা ও ছবিগুলোর ছাপ উল্টোভাবে গিয়ে পড়ে ওই রাবার ব্ল্যাংকেটে। আবার সেই ব্ল্যাংকেটটি একটি ঘুরপাক খেতেই স্বাভাবিকভাবে লেখা ও ছবির ছাপ পড়ে নিউজপ্রিন্ট বা কাগজের গায়ে, যা আমরা পরে পড়ে ও দেখে থাকি।

ব্লক (Block) — সাধারণত আগেকার দিনে কোন ধাতব প্লেটের ওপর খোদাই করে (etching or engraving) কোন মানুষ বা জীবজন্তুর ছবি বা অন্য কোন নকশা অংকনকে ব্লক বলতো। ছবির প্রতিরূপ উৎপাদনের ব্যবস্থায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি চলে আসায় ব্লকের মাধ্যমে ছবি তৈরি করার রীতি প্রায় চলে গেছে।

বডি টাইপ (Body type)— যে টাইপ বা হরফে সাধারণত সংবাদ কাহিনীর শরীর নির্মাণ করা হয় তাকে বডি টাইপ বলে।

ব্লোআপ (Blowup) — কোন ছবিকে বড় করাকে ব্লোআপ বলে।

বক্স (Box) — ছোট্ট অথচ কোন মজাদার বা শোকাবহ সংবাদ কাহিনীর চারপাশে রুল টেনে অর্থাৎ রেখাবেষ্টিত করে দেয়াকে বক্স বলে। আর রেখাবেষ্টিত সংবাদ কাহিনীকে বক্স স্টোরি (Box story) বলে।

বুলেটিন (Bulletin) — শেষ মুহূর্তের কোন তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদকে বুলেটিন বলে। সংক্ষিপ্ত সরকারি ঘোষণা বা ইশতেহারকেও বুলেটিন বলে।

বোল্ড ফেস বা বোল্ড (Bold face or Bold)— মোটা ধরনের টাইপ বা হরফকে বোল্ড ফেস বা বোল্ড বলে। আর্থাৎ পাতলা দরনের টাইপের থেকে মোটা ধরনের টাইপ। শিরোনাম বা উপ-শিরোনাম (Sub-head) প্রভৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য বোল্ড টাইপ ব্যবহার করা হয়।

বাইলাইন (Byline) — প্রকাশিত কোন সংবাদ কাহিনী বা বিবরণীর উপরিভাগে প্রকাশিত ওই সংবাদ লেখক বা রিপোর্টারের নাম। রিপোর্টারের নাম সম্বলিত কোন সংবাদ কাহিনীকে Bylined story বা সনাম রিপোর্ট বলে।

ক্যাপস (Caps) — ইংরেজি পত্রিকার ক্ষেত্রে Capitals (বা বড় অক্ষরে লিখতে হবে) এর সংক্ষিপ্তাকার।

ক্যাপশন (Caption) — সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন ছবি, নকশা কিংবা ছবির পরিচিত বা পরিচিতি ব্যাখ্যা।

ক্রেডিট লাইন (Credit line) — সংবাদ আসে বিভিন্ন উৎস থেকে। সংবাদ কাহিনীতে সেই উৎসের নাম উল্লেখ করাকে ক্রেডিট লাইন বলে। যেমন 'বাসস' কোন কাহিনী কভার করেছে।

কভার (Cover) — কোন সংবাদ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ কিংবা কোন সংবাদ ঘটনা বা কাহিনীর জন্য দায়িত্ব নেয়াকে কভার বলে।

ক্যাচলাইন (Catchline) — কোন সংবাদ কাহিনী বিশেষত সংবাদ সংস্থাগুলোর প্রেরিত সংবাদ বিবরণীর শীর্ষে একটা দুটো শব্দের মাধ্যমে ওই সংবাদ বিবরণীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

ক্রুসেড (Crusade) — কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় বা ইস্যুকে ভিত্তি করে কোন সংস্কার বা উন্নতিমূলক ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের আন্দোলন বা প্রচারাভিযানকে ক্রসেড বলে। যেমন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক সংবাদপত্রই প্রচারমূলক কাজ করছে।

কাব (Cub) — সাংবাদিকতা পেশায় একেবারে নবীন শিক্ষার্থীকে কাব বলে।

কাট (Cut) — পুরোনো পদ্ধতিতে তৈরি ছবিকে কাট বলে। অর্থাৎ ছবি, নকশা ইত্যাদি ব্লককে কাট বলে।

ক্লাসিফাইড (Classified) — ছোট ধরনের এমন বিজ্ঞাপন যা শুধুমাত্র ছোট ধরনের টাইপ ও শ্রেণীবদ্ধ বা বিধিবদ্ধ বিষয়ের সংমিশ্রণে গঠিত সেটাই ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন। যেমন - বাড়িভাড়া, ফ্ল্যাট বিক্রি প্রভৃতি। এ ধরনের বিজ্ঞাপনে বড় ধরনের হরফ বা অন্য কোন ধরনের বাহারি প্রদর্শন (Display) থাকে না।

ক্রপিং (Cropping) — সংবাদপত্রের ছবিকে কাটছাঁট করে প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট করাকে ক্রপিং বলে।

কাটিংস (Cuttings) — পত্রপত্রিকাগুলো থেকে কোন বিষয় বা ব্যক্তিত্বের ওপর কেটে তা সংবাদপত্র অফিসের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের কাজকে কাটিংস বলে। যুক্তরাষ্ট্রে এই কাজের নাম ক্লিপিংস।

ডাটা ব্যাংক (Data bank)— কম্পিউটার স্টোরে রক্ষিত তথ্য বা উপাত্তের (Data) সংগ্রহশালাকে ডাটা ব্যাংক বলে।

ডেটলাইন (Deadline) — যে স্থান থেকে কোন সংবাদ কাহিনী পাঠানো হচ্ছে সেই স্থানের নাম ও তারিখকে ডেটলাইন বলে। সাধারণত অস্থানীয় সংবাদের ক্ষেত্রেই স্থান ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

ডেডলাইন (Dateline) — যে চূড়ান্ত সময়ের মধ্যে (বিশেষত মধ্যরাতে) সংবাদ কাহিনী বা ভাষ্য লেখা শেষ করতে কিংবা কোন সংবাদ কাহিনী বা ভাষ্য কম্পোজিং বিভাগে কম্পোজ করার জন্য গৃহীত হবে।

ডেক (Deck) — এ হচ্ছে শিরোনামের অংশবিশেষ। বিশেষত কোন মূল শিরোনামের সহায়ক ও উপরের অংশ।

ডিসপ্লে এডস্ (Display ads) — এটা হচ্ছে সাধারণত বড় ধরনের বা আকারের বিজ্ঞাপন। যাতে বিভিন্ন নকশা, চিত্র বা ছবি থাকে। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন সাধারণত বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোই সরবরাহ করে থাকে। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন হচ্ছে ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপনের বিপরীতধর্মী।

ডিসপ্লে টাইপ (Display type) — সাধারণত বড় আকারের টাইপ বা হরফকে ডিসপ্লে টাইপ বলে। বড় টাইপগুলোর অবয়ব বিভিন্ন আকারে ও সুন্দর করে তৈরি করা থাকে।

ডামি (Dummy) — সংবাদপত্রের কোন পৃষ্ঠার জন্য লে-আউট বা পরিকল্পনার নকশাকে ডামি বলে।

ডট (Dot) — হাফটোন প্লেটে ছবি পুনরুৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যে ফোঁটা বা উপাদান।

ড্রপ লেটার (Drop letter)— এ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হরফ যা কোন সংবাদ কাহিনী বা ভাষ্যের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে ব্যবহার করা হয় এবং এই হরফ নিচের দিকে দুই থেকে তিন লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ড্রপ লেটার দিয়ে শুরু করলে দেখতে সুন্দর লাগে।

ইয়ার্স (Ears) — সাধারণত প্রথম পৃষ্ঠার দুই কোণায় অর্থাৎ পত্রিকার নামফলকের দু'পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের বিজ্ঞাপন প্রতিস্থাপনের জন্য রক্ষিত ছোট বক্স।

ইএম বা এম (Em) — একই পয়েন্টের এমন হরফ যা পাশে ও লম্বায় সমান জায়গা দখল করে। আগেকার দিনের হরফমালায় ইংরেজি বড় হাতের M অক্ষরটি এমনভাবে তৈরি হতো যা আড়েপাশে সমান ছিল।

এছাড়া ১২ পয়েন্টের সমান পরিমাপের একটি স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট হচ্ছে এম। একে পাইকা 'এম'ও বলে। আবার 'মাটন'ও বলে।

ইএন বা এন (En) — একটি এমের অর্ধেক জায়গা দখলকারী আড়েপাশে সমান হরফকে ইএন বা এন বলে। এটা 'নাট' হিসাবেও পরিচিত।

এমবার্গো (Embargo) — কোন সংবাদ কাহিনী বিশেষ করে সরকারের তথ্য বিবরণী যে নির্ধারিত সময়সীমার আগে প্রকাশিত হবে না বলে বিধিনিষেধকে এমবার্গো বলে।

এক্সক্লুসিভ (Exclusive) — কোন একদিন একটি মাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন সংবাদ কাহিনীর নাম এক্সক্লুসিভ স্টোরি। বাংলায় একে বলে একান্ত সংবাদকাহিনী। কোন রিপোর্টারের সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে এই ধরনের সংবাদ।

ফেস (Face) — এ হচ্ছে সংবাদপত্রের ব্যবহার্য মুদ্রাক্ষরের আকৃতি। এ হচ্ছে কোন টাইপ বা মুদ্রাক্ষর অথবা প্লেটের একটা অংশ যা কাগজে ছাপ সৃষ্টি করে।

ফিচার (Feature) — মানবিক আবেদন সৃষ্টিকারী বিবরণী। অবশ্য এটা কোন খবর নয়। কারণ এতে খবরের কোন অবদান নেই বরং কোন খবরকে কেন্দ্র করেই এই রচনা। এ হচ্ছে এমন এক নিবন্ধ যাতে পূর্বকথন থাকে। এ ধরনের লেখা ফিচার পাতায় লেখকের নামে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ফিচার হচ্ছে কোন খবরের সম্প্রসারিত রূপ।

ফ্ল্যাশ (Flash) — কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঘটনার সর্বপ্রথম প্রাপ্ত ত্বরিত সংক্ষিপ্তাকার বিবরণী। মাত্র সামান্য কয়েকটা শব্দে এ ধরনের জরুরি খবর দূর থেকে টেলিফোন অথবা টেলিপ্রিন্টারে চলে আসে। বাংলায় একে চকিত সংবাদ বলে।

ফ্ল্যাগ (Flag) — প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত সংবাদপত্রের নামকে ফ্ল্যাগ বলে যেমন 'দৈনিক বাংলাদেশ'। এটাকে 'নেমপ্লেট'ও (Nameplate) বলে।

ফ্রিল্যান্স (Freelance) — ফ্রিল্যান্স হচ্ছে এমন একজন সাংবাদিক যিনি কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন তবে তিনি বেশ কিছু সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রদায়ক হিসাবে কাজ করে থাকেন। অন্য অর্থে কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে যুক্ত না থেকেও সাংবাদিকতা করাকে ফ্রিল্যান্স বলে।

ফলোআপ বা অনুবর্তি সংবাদ (Follow up) — কোন প্রকাশিত সংবাদের পরবর্তী ঘটনাকে অনুসরণ করে তৈরি সংবাদকে ফলোআপ সংবাদ বলে। একে কোন বড় সংবাদ কাহিনীর পরিপূরক সংবাদও বলে। এটাকে সেকেন্ড ডে স্টোরি বা দ্বিতীয় দিনের গল্পও বলা যায়।

গসিপ কলাম (Gossip Column) — কোন নামী সাংবাদিক বা লেখক তথা ব্যক্তিত্ব যিনি প্রায়শই তাঁর নিজ নামে বা ছদ্মনামে যে কলাম লিখে থাকেন তাকে গসিপ কলাম বলে।

হাফটোন (Half tone) — স্ক্রিন ব্যবহারের মাধ্যমে হরফের মধ্যে সাদা কালোর একটা শেড বা আভা ফুটিয়ে তোলা যায়। এই শেড বা আভা বা বিন্দুর বৈপরীত্যই হচ্ছে হাফটোন। সংবাদপত্রে ছবি পুনরুৎপাদনের জন্যে এই হাফটোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

হ্যান্ড আউট বা তথ্য বিবরণী (Handout)— প্রকাশের স্বার্থে সরকারের তথ্য বিভাগ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত সংবাদ বিবৃতি বা বিবরণীকে হ্যান্ড আউট বা তথ্য বিবরণী বলে। এ ধরনের বিবরণীতে প্রেরকের পক্ষে প্রচারধর্মী কথা বলা হয়ে থাকে।

হ্যাংগিং ইনডেন্ট (Hanging indent) — এ হচ্ছে একাধিক লাইনের শিরোনাম অথবা প্যারাগ্রাফের লাইন বসানোর একটি কায়দা। অর্থাৎ

প্রথম লাইনটি যদি পুরো কলাম জুড়ে হয়, তবে তার পরের লাইনটা এক 'এম' করে কম রেখে বসানো হয় অর্থাৎ দু'পাশে জায়গা ছেড়ে দিয়ে প্রথমটার তুলনায় ক্ষুদ্রাকার লাইন বসানো হয়।

হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরি (Human interest story) — কোন সংবাদে মানুষের আবেগকে বিশেষ সংবেদনশীল করে তোলা হলে ওই সংবাদকে মানব আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ বা হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরি বলে। এ ধরনের সংবাদ পড়ে পাঠক মনে মনে ভাবে, এটাতো আমারও হতে পারতো।

হোল্ড (Hold) — প্রস্তুতকৃত কোন সংবাদ কপির ওপর 'হোল্ড' (Hold) এই কথাটি লিখে নির্দেশ দেয়া হয় যে লেখাটি প্রস্তুত হলেও আপাত পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না।

ইনসার্ট (Insert) — কোন প্রধান সংবাদ কাহিনীর অংশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় অথবা ঘটনাকে সেই সংবাদ কাহিনীর মাঝে সন্নিবেশন করাকে ইনসার্ট বলে।

ইনডেক্স (Index) — এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে হচ্ছে সূচিপত্র। পত্রিকার অন্যান্য পৃষ্ঠায় যে সব খবর বা অন্যান্য আইটেম ছাপা হয়েছে প্রথম পাতায় প্রকাশিত সেগুলোর সূচিপত্র।

ইটালিক (Italic) — এ হচ্ছে পত্রিকার পাতায় ব্যবহার্য বাহারি ধরনের হরফগুলোর একটি যা ডানদিকে একটু কাত হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত খবরকে তুলে ধরতে অথবা পত্রিকার পাতায় হরফগুলোর মাঝে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতেই ইটালিক হরফ ব্যবহার করা হয়।

জার্গন (Jargon) — অপরিচিত বা 'Technical শব্দ দিয়ে কথা বলার ধরনকে জার্গন বলে। একে অপভাষাও বলা যায়। অনেক সাংবাদিক এধরনের শব্দ ব্যবহার করতে চায়। অবশ্য সংবাদপত্রে দুর্বোধ্য অর্থহীন শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই।

কিল (Kill) — ইতিমধ্যেই কম্পোজকৃত অথবা সংবাদসংস্থার সরবরাহকৃত কোন সংবাদ কাহিনীকে পরিত্যাগ করার নির্দেশকে কিল বলে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন সংবাদ কাহিনীর পুরোটা বা আংশিক বাদ দেয়ার নামই হলো কিল।

লে আউট (Lay out) — লে আউট হচ্ছে সহ-সম্পাদকের পেন্সিল অংকিত সংবাদপত্রের একটি ছক বা নকশা যা অনুসারে মেকআপ ম্যান পত্রিকার পাতা সাজান।

লিড (Lead) — কোন পত্রিকায় প্রকাশিত কোন দিনের প্রধান সংবাদ কাহিনী। সেই সংবাদটি সেদিন অন্যান্য খবরের তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, কোন সংবাদকাহিনী তার নিজ গুণেই শীর্ষসংবাদে পরিণত হয়।

লিডার (Leader) — সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদকীয়কে লিডার বলে। লিডার হচ্ছে কোন সংবাদ ঘটনা সম্পর্কে কোন পত্রিকার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

লিডারেট (Leaderett) — সংবাদপত্রের দ্বিতীয় সম্পাদকীয়কে লিডারেট বলে।

লেগম্যান (Legman) — যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকেন মাত্র, লেখেন না, তিনি লেগম্যান হিসেবে পরিচিত। তিনি একজন রিপোর্টারকে রিপোর্ট তৈরিতে সাহায্য করেন।

লাইবেল বা অপলেখ (Libel)— সাংবিধানিক রক্ষাকবচের আওতায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলেও কোন সংবাদপত্রই উদ্দেশ্যমূলক বা ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবেও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে কোন বিদ্বেষ বা মানহানিকর কথা বলতে বা লিখতে পারে না। মানহানিকর বিবৃতি অপলেখর (Libel) সামিল। অপলেখর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টজন বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান

কোন সংবাদপত্র বা তার সম্পাদক অথবা রিপোর্টারের বিরুদ্ধে মানহানিকর মামলা দায়ের করতে পারে।

মাস্টহেড (Masthead) — অনেকেই প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদপত্রের নামকে মাস্টহেড বলে থাকেন। কিন্তু এই বলাটা একেবারেই ভুল। সম্পাদকীয় পাতার প্রধান সম্পাদকীয় বা লিডারের ওপরে প্রথম পাতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে মুদ্রিত সংবাদপত্রের নামকে মাস্টহেড বলে।

মাস্ট (Must) — এ হচ্ছে এমন একটি সম্পাদকীয় আইটেম বা লেখা যা পরেরদিন অবশ্য প্রকাশিত হবে। তবে অবশ্য প্রকাশযোগ্য যে কোন খবরের শিরোনামের পাশে 'Must' কথাটা লিখে দেয়া হয় যাতে সেটা পরেরদিনই প্রকাশিত হয়।

মোর (More) — কপি অসমাপ্ত রয়েছে এ রকম ইঙ্গিতকে মোর বলে। বিশেষত সংবাদ সংস্থায় অসমাপ্ত কপির নিচে মোর লেখা থাকে।

মর্গ (Morgue) — সংবাদপত্র অফিসের বিভিন্ন রেফারেন্স ফাইল ও অন্যান্য তথ্য রাখার স্থানকে মর্গ বলে।

নেমপ্লেট (Nameplate) — সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিতখবরের কাগজের ডিজাইনকৃত নামকে নেমপ্লেট বলে। বাংলায় একে নামফলক বলে।

অফ দ্য রেকর্ড (Off the record) — মুখে বলা হলেও যা ছাপা যাবে না তাকেই বলে অফ দ্য রেকর্ড। বিশেষত সংবাদ উৎস কোন রিপোর্টারকে কোন ঘটনা প্রসঙ্গে অনেক কথা বললেও কিছু কিছু অংশ তাঁর ব্যক্তিগত বা পেশাগত কারণে প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকেন। তাঁর না প্রকাশ করার অনুরোধকে সম্মান করতে হয়।

পাইকা (Pica) — ১২ পয়েন্টের মাপের মুদ্রাক্ষরকে পাইকা বলে।

পিক্স (Pix) — ছবি বা পিকচারের (Picture) সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে পিক্স বা pix । একে কাটও (cut) বলে।

পয়েন্ট (Point) — মুদ্রাক্ষর বা হরফ পরিমাপের একককে পয়েন্ট বলে। এক পয়েন্ট হচ্ছে এক ইঞ্চির ৭২ ভাগের এক ভাগ।

পেগ বা নিউজ পেগ (Peg or News peg) — পেগ বা নিউজ পেগের বাংলা পরিভাষা হচ্ছে বার্তা কীলক। অর্থাৎ যে বিষয় বা ভাবকে কেন্দ্র করে যে ওজর বা ছুতোর ছলে সম্পাদকীয় লেখা হয় তার নাম নিউজ পেগ।

প্রুফ (Proof) — কোন লেখার কম্পোজকৃত প্রাথমিক মুদ্রাছাপ, যা সংশোধন এবং ব্যাকরণ ও ভাষাগত খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করার জন্য মুদ্রিত হয়।

রিজিগ বা পুনর্বিন্যাস (Rejig) — কোন সংবাদ কাহিনী লেখার পরও নতুন তথ্য আসতে পারে যা ওই কাহিনীর মধ্যে সন্নিবেশন করা প্রয়োজন হয়। অথবা কাহিনী লেখার পরও তথ্যগত ও কাঠামোগত ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। এসবের সামঞ্জস্য বিধানের নামই হচ্ছে রিজিগ।

রিরাইটিং বা পুর্নলেখন (Rewriting) — একজন রিপোর্টার কোন কাহিনী লেখার পরও সম্পাদনা বিভাগে একজন সহ-সম্পাদকের কাছে তা এলোমেলো মনে হতে পারে। সেই সংবাদ কাহিনীর বিষয়বস্তুকে অক্ষুণ্ন রেখে তা নতুন করে সাজিয়ে লেখার নামই রিরাইটিং বা পুনর্লেখন। এতে কপি আরো পাঠযোগ্য ও আঁটোসাঁটো হয়।

রিটাচিং (Retouching) — কোন ফটোগ্রাফ কিংবা সেই ফটোগ্রাফের নিগেটিভ বা পজেটিভের মধ্যে তুলির সাহায্যে কিছু আঁচড় কেটে সুন্দর করে তোলার প্রয়াসকে রিটাচিং বলে।

স্ক্রিন (Screen) — সংবাদপত্রের জন্য ব্যবহার্য কোন ছবির পুনরুৎপাদনের () জন্য ডট বা (ফোটা) সম্বলিত কাচের ঝালর বা

ডালকে স্কিন বলে। সংবাদপত্রগুলোতে সাধারণত ৫৫ বা ৬৫ ডটের স্কিন ব্যবহার করা হয়।

স্কুপ বা একান্ত কাহিনী (Scoop) — এক্সক্লুসিভের (Exclusive) মতো স্কুপও হচ্ছে কোনদিন একটি মাত্র কাগজে প্রকাশিত কোন রিপোর্টারের একান্ত কাহিনী; একজন রিপোর্টারের অনুসন্ধানের সফল হচ্ছে স্কুপ।

সাইডবার বা সাইড স্টোরি (Sidebar or side story) — মূল কোন সংবাদ ঘটনার সঙ্গে কিছু কিছু ছোটখাট ঘটনা জড়িয়ে থাকে। এই সমস্ত ঘটনা প্রায় মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ হয়ে থাকে। এগুলোকেই সাইডবার বলে।

স্ল্যান্ট বা মেজাজ (Slant) — কোন সংবাদ কাহিনীতে কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব মেজাজ প্রচ্ছন্ন থাকলে তাকে স্ল্যান্ট বলে। এটা ফিচারের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য।

স্লাগ (Slug) — কোন সংবাদ কাহিনীকে প্রথম দর্শনেই চেনা বা বোঝার জন্য সংবাদবিবরণীর ওপর দু'একটি শব্দের দিকনির্দেশনার নামই স্লাগ। সংবাদ কাহিনীকে চেনার সংক্ষিপ্ত রূপ। একে এক অর্থে কোন সংবাদবিবরণীর ডাকনাম বলা যায়।

স্ন্যাপ (Snap) — খুব সংক্ষিপ্তাকার সংবাদবার্তাকে স্ন্যাপ বলে। এক প্যারা বা অনুচ্ছেদে এই সংবাদ আসে। সংবাদপত্রের ডেডলাইন পার হয়ে যাবার চরম মুহূর্তেই সাধারণত স্ন্যাপ আকারে কোন সংবাদ এসে থাকে।

স্পাইক (Spike) — যে সংবাদ কপির কোন দরকার নেই বা যে কপি থেকে অনুবাদ কর্ম সারা হয়ে গেছে সেগুলোকে যে ধাতব শলাকায় বিদ্ধ করা হয় তাকেই স্পাইক বলে।

স্প্যাশ (Splash) — কোন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় কোন সুনির্দিষ্ট দিনের প্রধান সংবাদগল্পকে স্প্যাশ বলে।

ট্যাবলয়েড (Tabloid) — সংবাদপত্র যে সাইজের কাগজে ছাপা হয় তার অর্ধেক সাইজকে ট্যাবলয়েড বলে। পপুলার সংবাদপত্রগুলো এই ট্যাবলয়েড সাইজের কাগজে ছাপা হয়। এর আনুমানিক সাইজ হচ্ছে ১৬ বাই ১২ ইঞ্চি।

টিপ (Tip) — কোন খবর সম্পর্কে প্রাপ্ত আভাস বা ইঙ্গিতকে টিপ বলে। একে এক টুকরো তথ্যকণাও বলা যায় যার সূত্র ধরে কোন বড় সংবাদ কাহিনী রচিত হতে পারে।

আপডেটিং (Updating) — কোন ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট কম্পোজে পাঠিয়ে দেবার পর সে ঘটনার ফলোআপ আসতে পারে। তখন প্রথমে প্রেরিত কপির সাথে নতুন তথ্য যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। একে বলে আপডেটিং।

গ্রন্থ অনুষঙ্গ

মানব সমাজ — সাংকৃত্যায়ন, রাহুল; চৌধুরী সুবোধ অনূদিত; ঢাকা, চলন্তিকা বইঘর, ১৪ বাংলা বাজার, বৈশাখ ১৩৯৫

ভারতের সংবাদপত্র — পাল, তারাপদ; কোলকাতা, সাহিত্য সদন, ১৯৭২

আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা — উলস্‌লে, রোল্যান্ড ই সম্পাদিত, আশফাক-উল আলম অনূদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৮৫

সাংবাদিকতা পরিচিতি — বল্ড, এফ ফ্রেসার; হোসেন, ফেরদৌস নিগার অনূদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৮৩

সংবাদ কৌশল — টমসন ফাউন্ডেশন সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা; মাহফুজউল্লাহ অনূদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি, ১৯৮৭

গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম — রীয়াজ, আলী; ঢাকা, মুক্তধারা, ৭৪, ফরাশগঞ্জ, ১৯৮৯

সংবাদ সম্পাদনা — আশরাফ, খোন্দকার আলী; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৯২

বিষয় সাংবাদিকতা — চট্টোপাধ্যায়, পার্থ; কোলকাতা, লিপিকা, ১৯৯০

গণজ্ঞাপন — চট্টোপাধ্যায়, পার্থ; কোলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা — আলম, মোহাম্মদ খুরশীদ, ঢাকা, সুবর্ণ, জুন, ১৯৯২

সাংবাদিকতা — জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ সম্পাদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, আগস্ট ১৯৯১

বাংলাদেশের সংবাদপত্র — ধর, সুব্রত শংকর; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৮৫

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার—গাইন, ফিলিপ সম্পাদিত; বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ও প্রাইভেট রুরাল ইনিসিয়েটিভস্ প্রোগ্রাম, নভেম্বর, ১৯৯০

মুদ্রণ শিল্প — আহমদ, মহিউদ্দিন; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, আগস্ট ১৯৯১

নিউ সার্ভে অব জার্নালিজম — মট, জর্জ ফক্স ও অন্যান্য; যুক্তরাষ্ট্র বার্নেস ও নোবল্, ১৯৬৮

নিউজ রাইটিং ফ্রম লিড টু ৩০ — মেটজ্, উইলিয়াম; নিউ জার্সি, প্রেন্টিস হল, ১৯৭৭

RUCL. Accession No... B8443

প্র্যাক্টিক্যাল জার্নালিজম- — কামাথ, এম ভি; আনডেটেড

দ্য কমপ্লিট জার্নালিস্ট — ম্যাঙ্গফিল্ড, এফ, ডি; লন্ডন, আইম্যাক পিটম্যান, ১৯৬২

মর্ডান নিউজ রিপোর্টিং — ওয়ারেন, কার্ল; নিউইয়র্ক, হার্পার এন্ড রো, ১৯৬৯

রিপোর্টিং — চার্নালি, মিচেল ভি; নিউইয়র্ক, হোল্ট রিনেহার্ট ও উইনস্টন, ১৯৬৬

দ্য কমপ্লিট রিপোর্টিং (২য় সংস্করণ)— হ্যারিস, জুলিয়ান ও জনসন, স্ট্যানলি; নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৬৫

জার্নালিজম মেড সিম্পল — ওয়েনরাইট, ডেভিড; কোলকাতা, রুপা এন্ড কোং, ১৯৯২

জার্নালিজম এন্ড দ্য মিডিয়া — জনস্টন ডোনাল্ড এইচ; আনডেটেড

ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম ইন দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড—জুমিয়াস, জুয়ান এফ; ম্যানিলায় দ্য এশিয়ান ইনস্টিটিউড অফ জার্নালিজম, আনডেটেড

এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান প্রেস — নটরাজন, এ; বোম্বাই এশিয়া পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬২

সাপ্তাহিক একতা — চতুর্দশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৮৪

দৈনিক বাংলা — ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৯৩

দৈনিক জনতা — ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সংখ্যা

ফটো সংবাদিকতা — রায়, নিরোদ; কোলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮৭

জ্যোতি — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্মরণিকা ১৯৮৪

শিল্প ও যোগাযোগ — রায়, সুধাংশু শেখর; ঢাকা, প্যারাগন পাবলিশার্স, ১৯৯৩

রিপোর্টিং — রায়, সুধাংশু শেখর; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

সংবাদের জগৎ — সালাম, ড. শেখ আবদুস ও রায় সুধাংশু শেখর; ঢাকা, পিআইবি, জুন, ১৯৯৮

ফটো-সাংবাদিকের প্রাথমিক পাঠ — সালাম, ড. শেখ আবদুস; রায়, সুধাংশু শেখর ও হামিদ, জেবিন; ঢাকা, পিআইবি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

নিজউজ এজেন্সি জার্নালিজম — কার্ডুনি, জন, আনডেটেড।